লুইস ক্যারল রচনাবলী

১

অনুবাদ

জয়ন্ত চৌধুরী

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলিকাতা ৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮২

প্রকাশিকা

গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রাকর

মৃণাল দত্ত
একলা প্রিণ্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ি সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

অলংকরণ

স্যার জন টেনিয়েল
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ লিপি

সুব্রত ত্রিপাঠী

বাঁধাই

সুবর্ণ বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
১০১ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অ্যালিস বললে, "উত্তর হয় না, এমন সব ধাঁধা বলে সময় নষ্ট না করে, কাজের কিছু করলে ভালো হত না?" লুইস ক্যারল সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া মানে, উত্তর-না-থাকা ধাঁধার জবাব দেবার চেষ্টা করারই সামিল। আজ একশো দশ বছর হতে চলল, পাঠকরা সবিস্ময়ে সেই একই প্রশ্ন জিগেস করে আসছেন; সেটা হল: অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের মুখ-চোরা, নিয়মনিষ্ঠ গণিতশাস্ত্রের অতি সাধারণ এক মাস্টারমশাই, চার্লস লাট্‌উইজ ডজ্‌সনের পক্ষে এমন একটা বিশ্ববিখ্যাত বই—ছোটোদের জন্যে লেখা উদ্ভুট্টে রূপকথা, 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'—রচনা করা সম্ভব হল কেমন করে। এবং তার পরেই আবার তেমনি আর-একখানা—হয়তো, আরো ভালো আর-একখানা বই—'থ্রু দি লুকিং গ্লাস অ্যাণ্ড হোয়াট অ্যালিস ফাউণ্ড দেয়ার'—লেখার মতো ক্ষমতা তিনি পেলেন কোথায়? তার সঙ্গে লেজুড় হিসেবে ধাঁধাও একটা আছে: এই দুটি-কাহিনী ছাড়া তাঁর আর-সব রচনাগুলো 'ভালো' হলেও 'অসাধারণ' হল না কেন? 'দি হাণ্টিং অব্ দি স্নার্ক'-এর কথা অবশ্য আলাদা; আজগুবি কবিতা হিসেবে তার স্থান অনন্য।

কয়েক পুরুষ ধরে সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা অ্যালিসের কাহিনী দুটি পড়ে আসছে, পড়ে মুগ্ধ হচ্ছে। স্নার্ক-এর কবিতাটি অতটা না-হলেও, প্রায় তাই! কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা অন্য-সব বইয়ের সঙ্গে এদের সবচেয়ে বড়ো তফাত হল এই যে, সেই ক'পুরুষ ধরে বড়োরাও এই লেখাগুলো পড়েছেন, মনে রেখেছেন, আবার পড়েছেন, এবং লুইস ক্যারলের রচনা থেকে বিশেষ বিশেষ লাগসই কথা উদ্ধৃত করে করে সেগুলোকে প্রায় প্রবচনে পরিণত করে তুলেছেন। (সেক্সপীয়রের মতো না হলেও, লুইস ক্যারলের রচনার উদ্ধৃতি কীপ্‌লিঙ-এর কাছাকাছি তো বটেই, ডিকেন্স-এর চেয়ে বেশি তো নিশ্চয়ই।)

কিন্তু মূল ধাঁধার কোনো জবাব নেই—প্রতিভার রহস্য কে ভেদ করবে? অ্যালিসকে নিয়ে, অ্যালিসের স্রষ্টাকে নিয়ে এক-এক সময়ে এক-একজন এক-একরকম ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন—তাঁর রচনার আসল বক্তব্যটা কী, লেখকের কোন মনোভাব থেকে এ-সব রচনার উদ্ভব, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। কিন্তু এই অযথা পাণ্ডিত্যের জালে ক্যারলের যে রূপটি

ফুটে ওঠে, 'আঙ্কল চার্লস' বা 'মিস্টার ডজ্‌সন'-এর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। অ্যালিসরা তিন বোন যে লোকটির অমূল্য স্নেহনিবিড় সাহচর্য পেয়েছিল, তিনি ছিলেন ছেলে মেয়েদের বন্ধু, তাদের খেলার সাথী, তাদের আমোদ-প্রমোদের সহচর, তাদের সরল মনের শরিক, তাদের মন-মাতানো গল্পের ভাণ্ডারি, তাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী একজন হৃদয়বান মানুষ।

খুব অল্প কথাতেই তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো বলে দেওয়া যায়। তাঁর বাবা, রেভারেণ্ড চার্লস ড জ্‌সন ছিলেন চেশায়ার-এর এক গীর্জার যাজক। তাঁর চার ছেলে আর সাত মেয়ের মধ্যে তিনি—চার্লস লাট্‌উইজ ডজ্‌সন—হলেন ছেলেদের মধ্যে বড়ো, সন্তান হিসেবে তৃতীয়। ১৮৩২ খৃস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। পরে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে তাঁরা ইয়র্কশায়ার আর ডারহাম-এর সীমানায় ক্রফ্‌ট-এ চলে আসেন।

ক্রফ্‌ট-এ থাকার সময়ে ছোটো-ছোটো ভাইবোনদের মনোরঞ্জনের জন্যে বালক বয়সেই ডজ্‌সন গল্প লিখতেন, ছড়া বাঁধতেন, নানারকম খেলা উদ্ভাবন করতেন। বাড়িতে হাতে-লেখা পত্রিকার চলন ছিল—সে-যুগে অনেক পরিবারেই ছিল। ডজ্‌সনের তখনকার যে-সব লেখার সন্ধান মেলে, তাতে লুইস ক্যারলের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এ হল ১৮৪৫ সালের কথা। ১৮৪৮ সালের 'দি রেকটরি ম্যাগাজিন'-এ তাঁর লেখা প্রথম গল্প, 'ক্রাণ্ডল ক্যাসল'-এর সন্ধান মেলে; এর আগে লেখা কোনো গল্প থাকলেও, তার সন্ধান নেই। 'ক্রাণ্ডল ক্যাসল' গল্পটির অনুবাদ আমাদের এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। এই গল্পটিতে, পাঠকরা লক্ষ্য করে দেখবেন, 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র কাহিনীর 'আগগাগ্‌' চরিত্রের পূর্বাভাস দিয়েছেন ডজ্‌সন। এর পরবর্তী 'রেক্‌টরি আমব্রেলা' হাতে-লেখা পত্রিকার কয়েকটি রচনায় লুইস ক্যারলের ছাপ কিছুটা তবু পাওয়া যায়—কয়েকটি কবিতা অ্যালিসের কাহিনীর প্লালিকার সমগোত্রীয়।

ইতিমধ্যে ডজ্‌সন রিচ্‌মণ্ড গ্রামার স্কুলে দু বছরের পাঠ সাঙ্গ করে রাগবিতে চার বছর পড়ার পর বাবার কাছে বছরখানেক তালিম নিয়ে অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ-এ যাবার তোড়জোড় করছেন। এই বছরেই (১৮৫০) মে মাসে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেন। সে বছর অক্সফোর্ডে ভর্তি হওয়া যায় নি; ছাত্রের সংখ্যা আগেই পূরণ হয়ে গিয়েছিল। পরের বছর জানুয়ারি মাসে ভর্তি হলেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রফ্‌ট-এ ফিরে আসতে হল মায়ের মৃত্যুতে। এর পর যখন আবার ক্রাইস্ট চার্চে ফিরে গেলেন, তখন স্থায়ীভাবেই থাকতে পারলেন সেখানে—সাতচল্লিশ বছর ধরে, মৃত্যু পর্যন্ত। ১৮৬৮ সালে বাবা মারা গেলেন। বোনেদের গিল্ডফোর্ড-এ বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছুটিছাটায় ক্রফ্‌ট বা গিল্ডফোর্ড-এ গিয়ে থেকেছেন, কিন্তু নিজের বাড়ি বলতে, তাঁর ঐ ক্রাইস্ট চার্চ।

১৮৫৪ সালে গণিতশাস্ত্রে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি পান। একটা বছর ছোটোখাটো শিক্ষকতার কাজ করেন; বছর দেড়েক ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের চাকরি করেন; তার

পর ১৮৫৫ সালে সিনিয়র স্টুডেণ্ট হিসেবে (পড়া এবং পড়ান, দুরকমের কাজ) যোগ দেবার সুযোগ পান। ১৮৫৫ সালেই ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের গণিতশাস্ত্রের লেকচারার হন। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজ করেন, তার পর ইস্তফা দেন। ১৮৬১ সালে তাঁকে ডীকন-গীর্জার যাজকশ্রেণীর কর্মীহিসাবে মনোনীত করা হয়, কিন্তু নিজেকে গীর্জা-সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের পক্ষে যোগ্য বলে তিনি মনে করতেন না, তাই সে-কাজে যোগ দেন নি।

গণিতের শিক্ষক হিসাবে ডজ্‌সনের দক্ষতার অভাব না-থাকলেও, ছাত্র সমাজের কাছে বিশেষ কোনো সমাদর তিনি দাবি করতে পারেন নি। গণিতের অনেক বই লিখেছিলেন; যখন লিখেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই কাজে লেগেছিল, তার পর বিশিষ্টতার অভাবে লোপ পেয়েছে, লোকে বিস্মৃত হয়েছে। তখনকার দিনে, অক্সফোর্ডে প্রফেসর বা বিভাগীয় প্রধানরা ছাড়া আর-সব শিক্ষকরা হতেন অকৃতদার, বাস করতেন কলেজেরই আবাসে' এঁরা সব একটু বিশেষ উঁচু শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য হতেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন-সব কবিতা বা গল্প সাধারণ হালকা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে গিয়ে বা বই হিসাবে ছাপাতে গিয়ে ছদ্মনাম নেওয়াটা বোধ হয় তাঁর পক্ষে তাই অস্বাভাবিক হয় নি। চার্লস লাট্‌উইজ কথাটার ল্যাটিন ভাষার চেহারা হল ক্যারোলাস লুডোভিকাস। এই কথাদুটোকে উল্টে দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করে লুইস ক্যারল নামটির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে 'দি ট্রেন' পত্রিকায় একটি কবিতার লেখক হিসাবে প্রথম এই ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয় (এর আগেও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখা বেরিয়েছিল; তাতে রচয়িতার নাম ছিল না।)

একজন তরুণ কলেজ-শিক্ষক হিসাবে ফোটোগ্রাফির নেশাটা তখনকার দিনে বোধ হয় ছেলেমানুষি বলেই গণ্য করা যেত। কিন্তু এই আশ্চর্য নতুন উদ্ভাবনের আকর্ষণ ডজ্‌সন এড়াতে পারেন নি। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, বর্তমানে ডজ্‌সনকে শিশুদের ফোটো তোলার ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে, আর মানুষের প্রতিকৃতি তোলার দিক থেকে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। ১৯৫১ সালে ফেস্টিভ্যাল অব বৃটেন-এর মেলায় তাঁর তোলা বহু ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ের (এরা সবাই ছিল তাঁর আদরের বন্ধু) ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল—তার মধ্যে একটি ফুটফুটে মেয়ের ছবি ছিল, যার নাম অ্যালিস।

ফোটোগ্রাফির ম্যাজিক নিয়ে মেতে থাকাটাই সব নয়, তাঁর ছেলেমানুষির সবচেয়ে পাকা নজির ছিল তাঁর বসবার ঘরে—সেখানে তিনি মেতে রয়েছেন পাঁচ থেকে বারো বছরের ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

এই-সব ছেলেমেয়েরা—বেশির ভাগই মেয়ে—তাঁর কাছে এসে জমা হত ফোটো তোলাতে, গল্প শুনতে, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে আর তাঁর অন্য দু-একজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নৌকোয় চড়ে চড়ুইভাতি যেতে, মজার মজার ধাঁধা আর খেলা শিখতে। এদের মধ্যে একেবারে গোড়ার দিকের ক্ষুদে-বন্ধু যারা, তারা হল তিন বোন, লরিনা,

অ্যালিস আর এডিথ—ডজ্‌সনের সবচেয়ে আদরের। ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের ডীন, হেনরি জর্জ লিডেল-এর মেয়ে এরা।

এদের বড়ো ভাই বোর্ডিংয়ে থাকত, তিন বোন থাকত ডীনের বাসায়, গভর্নেস মিস প্রিকেট-এর হেফাজতে। এই তিন বোনকে ডজ্‌সন যে-সব গল্প শুনিয়েছিলেন মুখে মুখে বানিয়ে, তাই দিয়েই গড়ে উঠেছে 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড', কাঠামো তৈরি হয়েছে 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'-এর।

অনেকবার চড়ুইভাতিতে বেরিয়েছেন ডজ্‌সন অ্যালিসদের নিয়ে, কিন্তু ১৮৬২ সালের ১৭ জুন আর ৪ জুলাই তারিখের চড়ুইভাতির দিনদুটি কী ভাগ্য নিয়ে এসেছিল কে জানে! এই দুদিনই নৌকো করে চড়ুইভাতি করতে যাওয়া হয়; নৌকোয় ছিলেন ডজ্‌সন, তাঁর বন্ধু রবিন্সন ডাক্‌ওয়ার্থ আর অ্যালিসরা তিন বোন। প্রথম দিনে মাঝপথে ঝড়বৃষ্টির জন্যে নৌকো ছেড়ে পাড়ে নেমে আসতে হয়, স্যানফোড-এর একটি কুটিরে আশ্রয় নেন তাঁরা।

৪ জুলাই-এর দিনটা একেবারে চমৎকার—গ্রীষ্মের সুন্দর বিকেল। ডজ্‌সনের ডায়েরিতে লেখা আছে :- 'ডাক্‌ওয়ার্থ আর আমি লিডেলদের তিন বোনকে নিয়ে নদীতে গড্‌স্টো পর্যন্ত নৌকা বাইলাম। সেখানে পাড়ে নেমে চা খেলাম। সওয়া আটটার আগে ক্রাইস্ট চার্চে ফেরা যায়নি।' পরে আবার লিখেছেন : 'তখনই আমি ওদের 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস আণ্ডারগ্রাউণ্ড' গল্পটি বলি; অ্যালিসের জন্যে গল্পটা লিখে দেবার ভার নিই।'

ডাক্‌ওয়ার্থের লেখা থেকে জানা যায় : 'আমার একেবারে ঘাড়ের পাশ থেকে ডজ্‌সন গল্পটা তৈরি করে বলে গেল। মনে পড়ে, মুখ ফিরিয়ে বললাম, "ডজ্‌সন, এটা কি বানিয়ে বানিয়ে বললে?" ডজ্‌সন বললে, "হ্যাঁ, একটু করে বলছি, আর পরেরটুকু বানাচ্ছি।" আমার বেশ মনে পড়ে, ওদের তিন বোনকে ডীনের বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময় অ্যালিস আমাদের শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়ে বলেছিল, "ওহ্, মিস্টার ডজ্‌সন, অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চারের গল্পটা যদি আমায় লিখে দেন, কী ভালোই না হয়"।'

ডজ্‌সন লিখছেন : 'আমার পরিষ্কার মনে আছে, রূপকথার মধ্যে নতুন ধরন আমদানি করতে গিয়ে মরিয়া হয়ে শুরুতেই আমার গল্পের নায়িকাকে সোজা খরগোসের গর্তের মধ্যে তো ঢুকিয়ে দিলুম, কিন্তু তার পরে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তখন ছিল না।'

অ্যালিসের কাহিনীর গোড়ার দিকের ঘটনার সূত্র ডজ্‌সন নিয়েছেন ১৭ জুনের চড়ুইভাতির দিন থেকে—বৃষ্টির জলধারা অ্যালিসের চোখের জলের পুকুর হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনীতে যারা যারা ভিজে জবজবে হয়ে গেল, শুকনো হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ডোডো হচ্ছেন স্বয়ং ডজ্‌সন (তোতলামি এলে ডজ্‌সন নিজের নাম বলতে গিয়ে ড-ড-ডজ্‌সন বলতেন); ডাক্‌ওয়ার্থ হয়েছেন ডাক (অনুবাদে হাঁস); লরিনা হয়েছে লরি পাখি; আর এডিথ হয়েছে ঈগলেট (অনুবাদে ঈগল-ছানা)।

'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস আণ্ডারগ্রাউণ্ড'—এই নামে কাহিনীটি নিজের হাতে লিখে ডজ্‌সন যখন অ্যালিস লিডেলকে উপহার দেন, তখন ছাপিয়ে বার করবার কথা চিন্তাও করেন নি। দুজন বিখ্যাত লেখক পাণ্ডুলিপিটি দেখে লেখাটি বৃহত্তর পাঠকসমাজে প্রচারের জন্যে ডজ্‌সনকে উপরোধ করেন। শেষপর্যন্ত তিনি তাই ঠিক করলেন; 'ক্ষ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর' আর 'শুয়োরছানা আর গোলমরিচ' এই দুটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করলেন, কিছু অংশ নতুন করে লিখলেন। (দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের বিরাট এক কারবারির কাছে ১৯২৮ সালে মূল পাণ্ডুলিপিটি ১৫,৪০০ পাউণ্ডে বিক্রি হয়।)

"অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বই হয়ে প্রকাশিত হতে কিছু সময় লাগল; যখন বেরল, লিডেলদের তিন বোন তখন বড়ো হয়ে উঠছে। 'দি গার্ডেন অ্যাণ্ড লাইভ ফ্লাওয়ার্স' নামে একটি গল্পে ('থ্রু দি লুকিং গ্লাস'-এ সন্নিবেশিত) ওদের পরের দুই বোন, রোডা আর ভায়োলেট-এর নামদুটি ডজ্‌সন ঢুকিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার পরের কোনো লেখায় আর সেরকম কিছু করেন নি, বা করার উৎসাহ পান নি। কারণ, তার আগেই লিডেল-পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ছেদ পড়ে গেছে। ক্রাইস্ট চার্চের কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনার জন্যে তিনি ডীন-মহাশয়ের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছেন, আর সেইসঙ্গে তাঁর স্ত্রী, মিসেস লিডেলকেও চটিয়ে ফেলেছেন তাঁর পেটোয়া একটি প্রাক-স্নাতক ছাত্রকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করে।

তবে 'ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর সেই শিশুসাহচর্যের জাদু ফুরিয়ে যাবার আগেই 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' লেখবার সময় তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে ওদের তিন বোনকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—সেটাই সম্ভবত শেষবার; আর একবার মিস প্রিকেটকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন; সেই-সব ঘটনার ছায়া পড়েছে 'লুকিং গ্লাসের' কোনো কোনো ঘটনায়, মিস প্রিকেটের ছায়া পড়েছে 'লাল রানী'-র চরিত্রে। অ্যালিসদের ঘিরে আরো অনেক ঘটনার স্মৃতি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, 'লুকিং গ্লাস'-এ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন সে-সব। বই বেরল ১৮৭১ সালে বড়োদিনে; কিন্তু তখন ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ।

এর পরেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসর সাজিয়েছেন, জমিয়ে গল্প বলেছেন, নতুন ধাঁধা আর মজার খেলা তৈরি করেছেন, তাদের মজার মজার চিঠি লিখেছেন; কিন্তু অ্যালিস আর তার বোনেরা তাঁর উৎসাহের, তাঁর স্নেহের, তাঁর প্রতিভার প্রথম বিকাশের যে টাটকা তাজা ছোঁয়াচটি পেয়েছিল, তা আর ফিরে পাওয়া গেল না, ডজ্‌সনের বাঁশিতে সেই অবাক-করা অচিন রাগিনীটি তেমন সুরে আর বাজল না!

শিশু বা কিশোর-কিশোরী বন্ধুর অভাব হয় নি তাঁর; জীবনের শেষপ্রান্তে এসে যখন স্মৃতিমন্থন করেছেন, তাদের সংখ্যা হয়তো হাজার পার হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে হয়তো কয়েকজনকে একটু বেশি করেই ভালোবেসেছেন কিন্তু অ্যালিসের জায়গাটা খালিই পড়ে রইল। সুন্দর সুন্দর ছোটো-ছোটো গল্প বেরিয়েছে তার পরেও, যেমন

'ব্রুনোর প্রতিশোধ।' কিন্তু সেই গল্পকে অবলম্বন করে যখন 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র চরিত্র নিয়ে বড়ো করে কাহিনী ফাঁদলেন, তখন সেই ভোরবেলাকার ঝক্‌ঝকে জৌলুস আর রইল না। 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো' হয়ে উঠল উপন্যাস, রূপকথা, আবোল-তাবোল আর নীতিকথার অদ্ভুত সমন্বয়। তবু, তার মধ্যেও লুইস ক্যারলকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না; খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না অমূল্য সব মিষ্টি বর্ণনা, চমক-লাগানো আজগুবি সব ঘটনা, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির বিস্ময়, আর, সবচেয়ে বড়ো কথা সিল্‌ভি আর ব্রুনোকে ঘিরে শিশু-অন্তপ্রাণ ক্যারলের দরদ-ভরা মধুর হৃদয়টি।

'অ্যালিস' লেখার কলমের কালি যে তখনো ফুরোয় নি, সেই সময়কার মতো, সরস করে লেখবার ক্ষমতা যে তাঁর তখনো আছে, তার বিশেষ প্রমাণ কবিতাগুলি। 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র অনেক কবিতাই বিশেষত মালির গানগুলো রসের বিচারে আগের রচনার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়!

ডজ্‌সনের সমস্ত প্রেরণার মূলে ছিল তাঁর ক্ষুদে বন্ধুরা—শিশুর দল। তাঁর কাহিনীর বিন্যাসের রসদ তিনি পেয়েছেন—সচেতন বা অবচেতনভাবে—ওদের কাছ থেকেই। গণিতবিদ্‌ হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত যুক্তিবাদী ছিলেন, নিয়ম এবং পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু সেইসঙ্গে ছোটোদের মনের গভীরে প্রবেশ করবার, কিম্বা সাময়িকভাবে নিজের ভেতরে একটি শিশুমন সৃষ্টি করে নেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল, ক্ষমতা ছিল ছোটোদের মতো করে দেখবার, ছোটোদের মতো করে ভাববার। অথচ, নিজের ছেলেপুলে ছিল না—বিয়েই করেন নি। যদি তাঁর মধ্যে দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব থেকে থাকে (মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাই বলতে পছন্দ করেন), তা হলে বলব, সেই দুটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একটি হল শিশু-ডজ্‌সন, আর-একটি হল বড়ো-ডজ্‌সন; লুইস ক্যারল বলে একটি লেখকের মনের মধ্যে একাসনে মুখোমুখি বসে তাদের লড়াই চলত।

জীবনের অধিকাংশ সময় ছোটোদের নিয়ে থেকে, আর তাদের আনন্দ দেবার জন্যে, ফুর্তিতে রাখবার জন্যে, সাহায্য করবার জন্যে ব্যয় করে ডজ্‌সনের মধ্যে বোধ হয় নিজের অজান্তেই দুটি বিভিন্ন সত্তার উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল। কেন তিনি ছোটোদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন, তার উত্তর পেতে গেলে আবার একটা ধাঁধা নিয়ে বসতে হয়। ক্রফ্‌টে থাকতে, বড়ো ভাই হিসেবে আপনা থেকেই তাঁকে সেই বৃহৎপরিবারের ছোটো-ছোটো ভাইবোনেদের ভুলিয়ে রাখার এবং দেখাশুনা করার ভার নিতে হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে এই অভ্যাসটা বজায় থেকে যায়, এবং কিছুটা বেড়েও যায়। তার কারণ হল, ডজ্‌সন জীবনভোর স্নায়ুঘটিত এমন একটা তোতলামিতে ভুগেছেন, যেটা সারান যায় নি। এটা তার মুখচোরা স্বভাবের কারণ তো বটেই, সেইসঙ্গে বড়োদের বদলে ছোটোদের সাহচর্যের প্রতি আসক্তির কারণও বটে।

জর্জ ম্যাকডোনাল্ড বলে পরিচিত এক ভদ্রলোকের এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে

তোতলামির চিকিৎসা করবার সময়ে ম্যাকডোনাল্ডের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। চিকিৎসায় ফল হয় নি, কিন্তু অন্য-একটা লাভ হল। ম্যাকডোনাল্ডের ছেলেমেয়েরাই হল তাঁর প্রথম ক্ষুদে বন্ধু, এবং তাদের সাহচর্যের দৌলতেই তিনি তাঁর এই অস্বস্তিকর অসুবিধার লজ্জা থেকে নিস্তার পাবার রাস্তা খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন—তিনি যে-ধরনের স্নায়ুঘটিত তোতলামিতে ভুগেছেন, সেই ধরনের তোতলামি থাকলে সকলেরই তাই হয়—ছোটোদের কাছে তাঁর তোতলামি আসে না। এ যে কত বড়ো স্বস্তি, আর এই অবস্থাটাকে যতক্ষণ পারা যায় স্থায়ী করে তোলবার জন্যে কী অসীম আগ্রহ যে হয়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

আর-সব প্রতিভার মতো লুইস ক্যারলের প্রতিভাও ধাঁধার মতন, যার উত্তর হয় না।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দের বড়োদিনের সময়ে (১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তিনি মারা যান) ডজ্‌সন 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর সঙ্গে একটি মুখবন্ধ সংযোজন করেন। তাতে তিনি লিখেছেন: 'চায়ের আসরে টুপিওলা যে ধাঁধা দিয়েছিল তার কোনো উত্তর আছে কি না জানতে চেয়ে আমার কাছে এত প্রশ্ন আসছে যে, এই সুযোগে উত্তরটা জানিয়ে রাখতে চাই; উত্তরটা মোটামুটি লাগসই...।' এর পর উত্তর একটা দিয়েছেন, কিন্তু তার পরেই আবার বলছেন, '...কিন্তু, এটা পরে ভেবে বার করেছি। ধাঁধাটা যখন তৈরি করেছিলাম, তার কোনো উত্তর ছিল না।'

জয়ন্ত চৌধুরী

[তথ্যগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে আহৃত হলেও রজার এল. গ্রীন-লিখিত ভূমিকার অনুসৃতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হল।]

অ্যালিস নামে মেয়েটি

তিনটি বোনের মধ্যে মেজোবোন হল অ্যালিস। নৌকো চড়ে বেড়াতে বেড়াতে সত্যিকারের এই অ্যালিসকে নিয়ে গল্প ফেঁদেছিলেন লুইস ক্যারল, আর তাই হয়ে দাঁড়াল বিশ্ববিখ্যাত বই 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'। তার পরে লিখেছিলেন, 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'। ওর পুরো নাম হল, অ্যালিস প্লেজেন্‌স লিডেল। ১৮৫২ সালের ৪ মে তার জন্ম। তার বাবা, ডক্টর হেনরি লিডেল তখন ছিলেন ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলের হেডমাস্টার; পরে অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চের ডীন হন।

অ্যালিসের কাহিনীতে বার দুয়েক তার আসল জন্মদিনের উল্লেখ আছে। 'শুয়োর-ছানা আর গোলমরিচ' পরিচ্ছেদের শেষে অ্যালিস বলছে:

"টুপিওলা তো অনেক দেখেছি, চৈত্রী খরগোসটাই বেশ মজার হবে মনে হচ্ছে। আর, এটা তো মে মাস, এখনও বোশেখ চলছে, কাজেই একেবারে ক্ষ্যাপা উন্মাদ হবে না নিশ্চয়ই—অন্তত চৈত্র মাসের চেয়ে কম তো হবেই।"

আবার 'ক্ষ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর'-এ রয়েছে:

"প্রথমে কথা বললে টুপিওলা, 'আজকে মাসের ক' তারিখ?' অ্যালিসের দিকে মুখ ফিরিয়েই বললে। ইতিমধ্যে সে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে বার বার ভুরু কুঁচকে দেখছে, মাঝে মাঝে ঝাঁকাচ্ছে আর কানের কাছে লাগিয়ে শুনছে। একটু ভেবে নিয়ে অ্যালিস বললে, 'চৌঠো'।"

অ্যালিসের অন্য দু বোনের নামও 'ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এ স্থান পেয়েছে। 'ক্ষ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর'-এ গেছো-ইঁদুর অ্যালিসকে যে গল্প বলেছিল, সেই গল্পের তিন বোনের নাম ছিল, এলসি, লেসি আর টিলি, তারা ঝোলাগুড়ের কুয়োর তলায় থাকত। 'এলসি' কথাটার উচ্চারণ, আর ইংরেজি 'এল' আর 'সি' অক্ষরদুটো পর পর উচ্চারণ করলে, একই শোনায়। এই, 'এল' আর 'সি' হল লরিনা শার্লট-এর (অ্যালিসের বড়ো বোন) নামের দুটি আদ্যক্ষর; 'লেসি' কথাটার বানান হয় 'অ্যালিস' কথাটার অক্ষরগুলোকেই উল্টেপাল্টে—এ এল আই সি ই—উল্টেপাল্টে হয়েছে এল এ সি আই ই; আর 'টিলি' হল ওদের ছোটো বোন, এডিথ-এর ডাক নাম।

'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'-এর কাহিনীতে অ্যালিসের পদবীর ইঙ্গিত আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অ্যালিস বলছে:

"সত্যিই তো, আমি কে? চেণ্টা করলেই মনে পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই মনে করব।" কিন্তু নিশ্চয়ই বললেই তো আর হয় না। অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা খুঁড়ে এইটুকুই শুধু বলতে পারলে, "'এল', ঠিক জানি আমার নামের আরম্ভটা 'এল' দিয়ে।"

১৮৮০ সালে রেজিনাল্ড হারগ্রীভস-এর সঙ্গে অ্যালিস লিডেল-এর বিবাহ হয়; মৃত্যু হয় ১৯৩৪ সালে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর সঙ্গে তাঁর একটা বংশগত সম্পর্ক ছিল।

অ্যালিস-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি

মুখে মুখে গল্প শোনাবার পর, লুইস ক্যারল সেটিকে গুছিয়ে-গাছিয়ে খুব সুন্দর একটি পাণ্ডুলিপির আকারে লিখে অ্যালিস লিডেলকে বড়োদিনের উপহার দেন। বিয়ের পরেও অ্যালিস (তখন মিসেস হারগ্রীভস) সেটিকে অমূল্য সম্পদের মতো আগলে রেখেছিলেন। পরে বিশেষ কারণে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের এক সংগ্রাহকের কাছে পাণ্ডুলিপিটি বিক্রি করে দেন, ১৫,৪০০ পাউণ্ড মূল্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে।

Chapter I.

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, "and where is the use of a book," thought Alice, "without pictures or conversations?" So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid,) whether the pleasure of making a daisy-chain was worth the trouble of getting up and picking the daisies, when a white rabbit with pink eyes ran close by her.

There was nothing very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself "dear, dear! I shall be too late!" (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for

'অ্যালিস'-এর কাহিনীদুটি সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দুটিরই ছবি এঁকেছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত কার্টুন-আঁকিয়ে, স্যার জন টেনিয়েল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিস-কাহিনীর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে টেনিয়েলের কৃতিত্ব কম নয়। সেই মূল ছবিগুলি বর্তমান সংকলনে ব্যবহার করতে পেরে আমরা গৌরব অনুভব করছি। প্রথম খণ্ডের বাকি ছবিগুলি এঁকেছেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

খরগোসের গর্তে

নদীর পাড়ে দিদির পাশে চুপচাপ বসে থাকা, কিছু করবার নেই—অ্যালিসের বিরক্তি ধরে গেছে। দিদি বই পড়ছে। দু-একবার উঁকি মেরে দেখেছে অ্যালিস, কিন্তু তাতে না আছে ছবি, না আছে গল্পের মতো কোনো কথাবার্তা। অ্যালিস ভাবে, 'ছবি নেই, কথাবার্তা নেই, এমন বইয়ের কি কোনো মানে হয়?'

অ্যালিস তখন ভাবতে বসল (অবশ্য, যতটা পরিষ্কার করে ভাবা যায়, কারণ যা গরম পড়েছে, কেমন যেন ঢুলুনী আসছে, বুদ্ধিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে) ডেজি ফুল দিয়ে একটা বিনিসুতোর মালা গাঁথলে কেমন হয়? ওঠো রে, ফুল তোলো রে, অত হাঙ্গামা কি পোষাবে? ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে গোলাপি চোখওলা একটা খরগোস তার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়; খরগোসটা যখন বিড় বিড় করে বললে, "হায় রে, হায়, বড্ড দেরি করে ফেললাম রে," তখনো অ্যালিসের এমন কিছু অদ্ভুত মনে হল না। (পরে যখন এই নিয়ে ভেবেছে, তখন মনে হয়েছে অবশ্য যে, অবাক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেই সময়ে সবই স্বাভাবিক লেগেছে তার কাছে।) কিন্তু খরগোসটা এবার যখন তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ঘড়ি

বার করে দেখতে লাগল, তার পর আবার হনহনিয়ে এগিয়ে গেল,. তখন অ্যালিস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। কারণ, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে যে, এর আগে তো সে এমন খরগোস জন্মে দেখে নি, যার ওয়েস্টকোট আছে, আবার ঘড়ি রাখবার পকেট আছে! ভীষণ আশ্চর্য হয়ে খরগোসটার দিকে ছুট্টে চলল অ্যালিস মাঠের ওপর দিয়ে, আর, কপাল-জোর বলতে হবে, কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখতে পেল, ঝোপের নীচে একটা বড়োসড়ো গর্তের মধ্যে সাঁৎ করে সেঁধিয়ে গেল সেই খরগোসটা।

আর, ঠিক তার পরেই তার পেছন পেছন অ্যালিসও নেমে পড়ল,

সেই গর্তের মধ্যে, একবার ভাবলেও না যে, গর্ত থেকে আবার ওপরে উঠবে ছাই কী করে।

খরগোসের বাসার গর্তটা সুড়ঙ্গের মতো খানিকটা সোজাসুজি যাবার পর একেবারে না বলে-কয়ে কুয়োর মতো খাড়া নেমে গেছে নীচের দিকে; এমনি আচম্‌কা নীচে নেমেছে যে, থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়বে কি-না, সেটা ভাববার সময়টুকুও পেল না অ্যালিস বেচারি, তার আগেই টের পেল একটা গভীর কুয়োর মধ্যে দিয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে সে।

কুয়োটা বোধ হয় ভয়ানক গভীর, কিম্বা হয়তো অ্যালিসই পড়ছে

খব আস্তে আস্তে, কারণ, পড়তে পড়তে অ্যালিস বেশ করে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার সময় পেল, এর পর কী-না-কী হবে, তাই নিয়ে ভাববারও সময় পেল। প্রথমে নীচে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে কোথায় যাচ্ছে ; কিন্তু বড্ডো অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। তার পর, কুয়োর দেওয়ালের দিকে তাকালে ; দেখলে, সেখানে সারি-সারি সব দেরাজ আর বইয়ের তাক। কোথাও কোথাও আবার ম্যাপ আর ছবি টাঙানো রয়েছে। পড়তে পড়তেই অ্যালিস হাতের নাগাল পেয়ে তাক থেকে একটা বয়াম তুলে নিলে ; তার গায়ে লেখা আছে 'কমলা লেবুর মোরব্বা'। কিন্তু, বরাত খারাপ, বয়ামটা খালি। পাছে কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, তাই বয়ামটা ফেলে না দিয়ে, হাতের কাছে একটা তাকের নাগাল পেয়ে তাতেই বসিয়ে দিলে।

অ্যালিসের মনে হল, 'যাক্ বাবা, যেরকম পড়া পড়ছি, সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার ভাবনা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কোনো মানেই হয় না। আঃ, বাড়ির সবাই ভাববে, আমার কতো সাহস! বাড়ির একদম সবচেয়ে উঁচু থেকে নীচে পড়ে গেলেও টুঁ শব্দটি বেরবে না মুখ থেকে, হ্যাঁ!' (কথাটা বোধ হয় ঠিকই।)

পড়ছে তো পড়ছেই। নামছে তো নামছেই। পড়ার কি শেষ নেই? অ্যালিস এবার জোরে জোরেই বলে ফেললে, "এতক্ষণে কত মাইল যে পড়লম, কে জানে বাবা। পৃথিবীর ভেতরকার মাঝ-মধ্যিখানের কাছাকাছি কোথাও এসে গেছি মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, একবার হিসেব করে নিই : পৃথিবীর মাঝ-মধ্যিখানটা হল, যদ্দূর মনে হচ্ছে, চার হাজার মাইল নীচে···" (ব্যাপার হল, ইস্কুলে এই ধরনের অনেক সব ব্যাপার শিখেছে সে ; যেখানে শোনবার কেউই নেই, সেখানে বিদ্যে জাহির করার কোনো মানেই অবশ্য হয় না, তবু জানা কথাগুলো বার বার আওড়ালে অভ্যেসটা তো অন্তত থাকে!) "···হ্যাঁ, মোটামুটি হাজার চারেক মাইলই বটে—তবে একটা কথা, কতো অক্ষাংশ আর কতো দ্রাঘিমাতে পৌঁছচ্ছি, সেটাই তো ঠিক মাথায় আসছে না।" (অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা ব্যাপারটা অ্যালিসের মোটেই কিস্যু জানা নেই, তবে, ওর মনে হয়েছে কথাগুলো বললে বেড়ে গালভরা শোনায়।)

অ্যালিস আবার কপ্‌চাতে শুরু করলে, "ভাবছি, পৃথিবী ফুঁড়ে

বেরিয়ে ওদিকে গিয়ে পড়ব না তো ? এমন এক জায়গায় গিয়ে হয়তো বার হলাম, যেখানে লোকেরা নীচের দিকে মাথা করে হাঁটে—কী মজার কাণ্ড ! কী যেন বলে—'প্রতিকূল' বোধ হয়…" (শোনবার কেউ নেই বলেই বাঁচোয়া, কারণ কথাটা মোটেই ঠিক শোনাল না।)

"…যাই হোক, জায়গার নামটা তো জিগেস করেই জেনে নিতে হবে, তাই না ? কিছু মনে করবেন না, ঠাকরুন, এটা কি নিউজীল্যাণ্ড না, অস্ট্রেলিয়া ?" (কথা বলবার সময়ে সহবৎ দেখাবার জন্যে অ্যালিস আবার মাথাটা ঝোঁকালে নীচের দিকে—হুস্ হুস্ করে নীচে পড়তে পড়তে আবার সহবৎ দেখান, কাণ্ডখানা ভাব একবার। তোমরা হলে পারতে ?) "তখন তিনি কী মুখ্যু মেয়েই না ভাববেন আমায় ! না বাবা, জিগেস-টিগেস করার ধার দিয়েও যাচ্ছি না ; কোথাও লেখা-টেখা থাকবে, দেখে নেব।"

পড়ছে তো পড়ছেই, নামছে তো নামছেই। কিছুই তো আর করবার নেই, তাই অ্যালিস আবার বকর বকর শুরু করলে, "মনে হচ্ছে, ডাইনা বেচারার মন কেমন করবে আমার জন্যে রাত্তির বেলা। (ডাইনা হল অ্যালিসের বেড়ালটা।) চা খাবার সময়ে ওরা ডাইনার দুধের বাটিটার কথা না ভুললে বাঁচি। ডাইনা রে, এখন তুই এখানে আমার কাছে থাকলে কী মজাই হত রে ! দুঃখের কথা, এখানে তো ইঁদুর-টিঁদুর মোটেই নেই, তবে বাদুড় ধরতে পারিস ; বাদুড়রা প্রায় ইঁদুরেরই মতো, জানিস তো। কিন্তু বেড়ালে কি বাদুড় খায়, কে জানে বাবা।" বলতে বলতে অ্যালিসের ঢুল এসে গেল, ঘুম-জড়ানো সুরে বিড় বিড় করে আপন মনে বলে চলল, "বেড়ালে কি বাদুড় খায় ? বেড়ালে কি বাদুড় খায় ?" মাঝে মাঝে আবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, "বাদুড়ে কি বেড়াল খায় ?" আসল কথা হল কোনোটারই উত্তর যখন জানা নেই, তখন যেভাবেই বলা হোক-না-কেন, কীই-বা আসে যায়।

অ্যালিস এবার টের পেয়েছে যে, বেশ একটু তন্দ্রা এসেছিল তার, স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল যে, ডাইনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেড়াতে বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকে জিগেস করছে, "ডাইনা, একটা সত্যি কথা বল্ তো, কখনো বাদুড় খেয়েছিস ?" আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ-ধুপুস্ ! এক গাদা শুকনো পাতার ওপর এসে পড়ল অ্যালিস, নীচে নামার শেষ হল।

লাগে নি মোটেই, টক্ করে সে উঠে দাঁড়াল। ওপর দিকে তাকালে, শুধু অন্ধকার। সামনের দিকে আবার একটা লম্বা পথ।

সেই খোরগোসভায়াকে দেখা গেল সেই পথ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছে। তখন আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নেই, ঝড়ের মতো অ্যালিস এগিয়ে গেল, আর শুনতে পেলে, একটা বাঁকের মুখে ঢুকতে ঢুকতে খোরগোসটা বলছে, "হায় রে কান, হায় রে গোঁফ, কী দেরিই না হয়ে গেল!" মোড়টা যখন ঘুরছে, অ্যালিস তখন খোরগোসটার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, কিন্তু মোড় ফেরার পরই তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। একা অ্যালিস দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, নিচু একটা হল্‌ঘরের মধ্যে, ছাদ থেকে ঝোলান সারি সারি আলোয় ঘরটা ঝক্‌মক করছে।

ঘরটার চারিদিকেই দরজা, কিন্তু সব কটাই চাবি দেওয়া। ঘরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত ঘুরে যখন দেখা গেল একটা দরজাও খোলা গেল না, তখন মনের দুঃখে ঘরের মাঝ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে অ্যালিস ভাবতে লাগল, কোনোদিন কি আবার বেরোতে পারবে সে এখান থেকে, কী করেই-বা বেরোবে?

হঠাৎ সে এসে পড়ল একটা ছোট্টো তে-পায়া টেবিলের কাছে, তার সবটা কাঁচের তৈরি। টেবিলে কিচ্ছু নেই, শুধু একরত্তি একটি সোনালি চাবি। দেখে প্রথমেই অ্যালিসের মনে হল, নিশ্চয়ই একটা-না-একটা দরজার চাবি হবে। কিন্তু, হায় রে হায়! দেখা গেল, তালাগুলো বড়ো বলেই হোক, বা চাবিটা ছোটো বলেই হোক, কোনো দরজাই তাতে খুলল না। যাই হোক, আবার একবার ঘুরতে ঘুরতে একটা বেঁটে পর্দা দেখতে পেলে, আগে সেটা চোখে পড়ে নি। আর, দেখতে পেলে সেই পর্দার পেছনে ছোট্টো একটা দরজা—পনেরো ইঞ্চিটাক উঁচু। সোনালি সেই চাবিটা তাতে লাগাতে গিয়ে দেখলে—কী মজা রে, কী মজা—ঠিক লেগে গেল!

দরজা খুলে অ্যালিস দেখলে, তার ওপারেই ছোটো একটা সুড়ঙ্গ, ইঁদুরের গর্তের চেয়ে বিশেষ বড়ো নয়। গুঁড়ি মেরে বসে সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে তাকিয়ে সে কী দেখতে পেলে? এমন সুন্দর বাগান কেউ কখনো দেখে নি। ঐ হল্‌ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ঐ-সব রঙবেরঙের ফুল আর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ফোয়ারার মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে কী

ভয়ানক ইচ্ছেই না হচ্ছে অ্যালিসের, কিন্তু ঐ দরজাটার মধ্যে দিয়ে তার মাথাটাই গলছে না, তা হবে কী! বেচারা অ্যালিস তখন ভাবছে, 'আর, মাথাটা যদিই-বা গলল, কাঁধ ছাড়া মাথাটা নিয়ে কীই-বা হবে! আহা রে, যদি টেলিস্কোপের মতো টুক টুক করে নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে সেঁধিয়ে ছোট্টো হয়ে যেতে পারতাম। হয়তো পারা যায়, কিন্তু কীভাবে আরম্ভ করতে হয় সেটাই যে জানা নেই ছাই!' ব্যাপার হল, এর মধ্যে এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে, যে এখন প্রায় কিছুই আর অ্যালিসের কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে না।

দরজার কাছে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই, তাই সে আবার ফিরে চলল সেই টেবিলের কাছে, মনে মনে আশা, যদি আরো একটা চাবি পাওয়া যায়, কিম্বা এমন একটা বই, যাতে লেখা আছে কেমন করে নিজেকে টেলিস্কোপের মতো গুটিয়ে ছোটো করে নেওয়া যায়। এবার টেবিলের ওপর একটা ছোট্টো বোতল দেখা গেল (অ্যালিস বিড় বিড় করে বললে, "আগে এটা মোটেই এখানে ছিল না।") তার গলায় কাগজের লেবেল ঝোলান, তাতে বড়ো-বড়ো হরফে সুন্দর করে ছাপা 'আমায় খাও'।

বলা তো খুব সোজা 'আমায় খাও,' কিন্তু অ্যালিস অতো বোকা নয় যে, চট্ করে অম্‌নি খেয়ে বসবে। বললে, "না বাবা," আগে

দেখি 'বিষ' বলে লেখা-টেখা আছে কি-না," কারণ, অ্যালিস অনেক সব গল্প শুনেছে, কেমন করে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা পুড়ে গেছে, বুনো জানোয়ারদের পেটে চলে গেছে, আরো কতোরকমের বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব ব্যাপার ঘটে গেছে তাদের কপালে, কেবল একটি মাত্র কারণে বন্ধু-বান্ধবরা যে-সব নিয়মকানুন শিখিয়েছে সে-সব গেরাহ্যি না-করা; যেমন, উনুন-খোঁচানো গনগনে লোহার শিক অনেকক্ষণ ধরে থাকলে হাত পুড়ে যায়; ছুরিতে আঙুল খুব বেশি কেটে গেলে সাধারণত

রক্ত পড়ে; আর, এটা সে কিছুতেই ভোলে নি, 'বিষ' লেখা বোতলের জিনিস বেশি-বেশি খেয়ে ফেললে, আগেই হোক আর পরেই হোক, সেটা যে সইবে না, এটা নিশ্চয়ই।

অবশ্য এ-বোতলটায় 'বিষ' লেখা নেই, কাজেই অ্যালিস সাহস করে একটু চেখে দেখলে, আর খেতে খুব সুন্দর লাগল দেখে (গন্ধটা আসলে ছিল চেরির চাটনি, কাস্টার্ড, আনারস, ঝল্‌সান টার্কি, টফি আর গরম মাখন-লাগান টোস্টের গন্ধ মেশালে যা হয়, তাই) খানিকক্ষণের মধ্যেই বোতলটা খালিই করে ফেললে।

"কী অদ্ভুত লাগছে আমার। নিশ্চয়ই টেলিস্কোপের মতো ছোটো হয়ে যাচ্ছি।"

ঠিক তাই ; এখন সে মাথায় মাত্র দশ ইঞ্চি লম্বা। এবার যে সে ঐ ছোট্টো দরজা দিয়ে গলে সেই বাগানে যেতে পারবে, এই কথা মনে হতেই তার মুখটা খুশিতে ঝল্‌মল করে উঠল। অবশ্য, প্রথম কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখে নিলে যে, এখনো সে আরো ছোটো হচ্ছে কি-না ; কথাটা ভেবে একটু ভড়কে যাচ্ছিল সে। অ্যালিস তখন বলছে, "কারণ, বুঝতেই পারছ, এমনি চলতে থাকলে একেবারে তো ভোঁ-ভাঁ হয়ে যেতে পারি, পুড়ে পুড়ে মোমবাতির মতো দশা। তখন আমায় কেমন দেখতে হবে, কে জানে?" নিবে যাবার পর মোমবাতির আলো কেমন দেখতে হয়, তাই ভাবতে চেষ্টা করতে লাগল অ্যালিস, কারণ সত্যি সত্যি সে-জিনিস কখনো দেখেছে বলে তার মনে তো পড়ে না।

কিছুক্ষণ বাদে যখন দেখলে নতুন করে আর কিছু হচ্ছে না, তখন ঠিক করলে এক্ষুনি সেই বাগানে যেতে হবে। কিন্তু, হায় রে, অ্যালিস বেচারির কপালটাই খারাপ! দরজার কাছে গিয়ে দেখলে চাবিটা ফেলে এসেছে ; আবার টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলে, টেবিলের ওপর পর্যন্ত তার নাগালই পৌঁছায় না ; নীচ থেকে কাঁচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল চাবিটা, টেবিলের একটা পায়া বেয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টাও করল, কিন্তু বড্ডো পিছলে যায়। বার বার চেষ্টা করে যখন আর পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন ছোট্টো ফুটফুটে অ্যালিস বেচারি মাটিতে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তার পর অ্যালিস যেন ধমকের সুরে নিজেকেই বলে ওঠে, "চুপ করো, এভাবে কেঁদে কিছু লাভ আছে?" অ্যালিস বরাবরই নিজেকে ভালো-ভালো সব পরামর্শ দিয়ে থাকে (যদিও সে-সব বেশির ভাগই সে মানে না), আর মাঝে মাঝে এমন কড়া ধমক দেয়, যে চোখে জল এসে যায় ; তার মনে আছে, নিজের সঙ্গে নিজে ক্রোকে খেলবার সময়ে একবার নিজের সঙ্গে নিজে জোচ্চুরী করবার জন্যে নিজেই নিজের কান মলতে গিয়েছিল ; ব্যাপার হল, অ্যালিস মেয়েটা অদ্ভুত, নিজেকে দুজন মনে করতে তার ভারি আনন্দ। এবার কিন্তু অ্যালিস ভাবছে, 'নিজেকে দুজন মনে করে এখন আর কোনো

লাভ হবে না! 'আমি' বলতে এখন যেটুকু বজায় আছে, তাতে ভদ্রগোছের একটা মানুষই হয় কি-না সন্দেহ!'

ভাবতে-না-ভাবতেই তার চোখ পড়ল টেবিলের নীচে একটা কাঁচের বাক্সের দিকে। বাক্সটা খুলে দেখে, তার মধ্যে খুব ছোট্টো একটা কেক, তার ওপর খুদে খুদে কিশমিশ সাজিয়ে লেখা রয়েছে, 'আমায় খাও'। দেখে অ্যালিস বললে, "ঠিক আছে, খেয়েই ফেলি; তাতে যদি বড়ো হয়ে যাই, চাবিটা নিতে পারব, আর, যদি আরো ছোটো হয়ে যাই, তা হলে দরজা গলে বেরিয়ে পড়তে পারব; কাজেই যেভাবেই হোক বাগানে পৌঁছতে তো পারব, যাই-ই ঘটুক, তাতে বয়েই গেল আমার!"

ছোট্টো একটা কামড় দিল কেকে, দিয়েই মনে মনে বলতে লাগল, 'কোন্ দিকে—ছোটোর দিকে, না বড়োর দিকে?' মাথার ওপর হাত রেখে বুঝতে চেষ্টা করল, বাড়ছে না কমছে, আর আশ্চর্য হয়ে দেখল, যেমনকার তেমনিই রয়েছে। আসলে কেক খেলে সাধারণত তাই-ই হয়, মানুষ বাড়েও না কমেও না, কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ঘটবে না বলে অ্যালিস এতো বেশি আশা করে ফেলেছে যে, এখন সহজ স্বাভাবিক কিছু ঘটলে মনে হচ্ছে, নেহাৎ-ই পান্‌সে, নেহাৎ বোদা।

কাজেই সে মুখ চালাতে লাগল, কেকটাও খতম হতে সময় লাগল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখের জলের পুকুর

"আশ্চব্ভুত, আশ্চব্ভুত!" (এতো অবাক হয়ে গেছে অ্যালিস যে, ভাষা-টাষা ভুলে মেরে দিয়েছে।) "ইকী! প্রকাণ্ড একটা টেলিস্কোপের মতো ক্রমে ক্রমে লম্বা হয়ে উঠছি যে! চললুম ভাই, পা!" (নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পা-জোড়া এতো দূরে যে, প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।) "আহা রে, আমার পা; কেই-বা তোদের আর এখন জুতো-মোজা পরিয়ে দেবে—বাছা রে! আমার দ্বারা যে হবে না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে! এতো দূরে থেকে কি আর তোদের কথা নিয়ে মাথা ঘামান যায়: যতোটা পারিস নিজেরাই সামলে-সুমলে নিস!" তার পর ভাবলে, 'কিন্তু ওদের ওপর একটু মায়া-টায়া দেখান দরকার, নাহলে হয়তো আমার ইচ্ছেমতো চলতেই চাইবে না! ঠিক আছে, প্রত্যেক বড়োদিনে ওদের একজোড়া করে নতুন জুতো উপহার দেওয়া যাবে।'

তার পর অ্যালিস ভাবতে বসল, কী ভাবে কী করা যায়। 'কারো হাত দিয়ে তো পাঠাতে হবেই। নিজের পা-কে নিজেই উপহার দেওয়া—ব্যাপারটা কী অদ্ভুত না? আর, পাঠাবার ঠিকানাটাই-বা কেমন দাঁড়াবে!

অ্যালিসের দক্ষিণ-শ্রীচরণেষু,
আগুন পোয়াবার চুল্লীর সামনেকার পা মেলবার কম্বল,
চুল্লীর রেলিঙের কাছাকাছি,
(অ্যালিসের ভালোবাসা রইল)।

দুত্তেরিকা, কী-সব আবোল-তাবোল বকছি !'

ঠিক এই সময়ে ঠক্ করে তার মাথাটা ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকল : আসলে সে এখন ন' ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা হয়ে গেছে, চট করে

টেবিলের ওপর থেকে সোনালি চাবিটা তুলে নিয়ে দৌড় দিয়েছে সেই বাগানে যাবার দরজাটার দিকে।

বেচারা অ্যালিস! পাশ ফিরে শুয়ে কোনোরকমে একটা চোখ দরজার ফাঁকে লাগিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই এখন সম্ভব নয় তার পক্ষে; দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া এখন তো আরো বেশি অসম্ভব: আবার বেচারা কাঁদতে বসল।

"ছি, ছি, বুড়োধাড়ি মেয়ে হয়ে (তা বলতে পারে বটে) কাঁদতে লজ্জা করে না তোমার! এক্ষুনি চুপ করো, বলছি!" বললে আর কী হবে, কেঁদেই চলল, কেঁদেই চলল, জালা জালা জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে। তার চারি দিকে ইঞ্চি-চারেক গভীর প্রকাণ্ড একটা পুকুরের মতো তৈরি হয়ে গেল, ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে জল জমে উঠল; তখন অ্যালিসের কান্না থামল।

খানিক বাদে শুনতে পেলে পুটুর পুটুর করে কার পায়ের আওয়াজ, তাড়াতাড়ি চোখ পুঁছে অ্যালিস দেখতে লাগল, কে আসে। কে আসছে? সেই সাদা খরগোসটা ফিরে আসছে। কী জমকালো সাজ! এক হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা, আর-এক হাতে বিরাট একটা জাপানী পাখা। হন্ হন্ করে এগিয়ে আসতে আসতে বিড়-বিড় করে খরগোসভায়া বলে চলেছে, "ওরে ব্বাবা, জমিদারগিন্নী! যদি সত্যিই আমার জন্যে তাঁকে বসে থাকতে হয়, তাহলে কী বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ডই না করবেন!" অ্যালিস তখন এমন মরিয়া হয়ে গেছে যে, যার কাছেই হোক একটু সাহায্য পেলে বাঁচে; তাই, খরগোসটা তার কাছাকাছি এসে পড়তেই ভয়ে ভয়ে মিনমিন করে সে যেই বলতে শুরু করেছে, "দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না—," খরগোসটা বেজায় চমকে উঠে দস্তানা আর পাখাটাখা ফেলে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়ে অন্ধকারে ভোঁ হয়ে গেল।

অ্যালিস আর কী করে, দস্তানা আর পাখাটা কুড়িয়ে নিলে, তার পর, ঘরটা গরম বলে সেই পাখাটা নাড়িয়ে হাওয়া খেতে খেতে বক্ বক্ করতে লাগল: "বাবা রে বাবা! কী অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটছে আজ! অথচ কালকে তো সবই ঠিকঠাক চলেছে। কী জানি বাবা, রাতারাতি বদলে যাই নি তো? দেখি তো ভেবে: আজ সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সেই আগের মতোই ছিলুম তো?

না, মনে পড়ছে, একটু যেন অন্যরকম লাগছিল লাগছিল বটে। বেশ, আমি যদি আগের মতো সেই অ্যালিসই না হই, তা হলে এবার প্রশ্ন উঠছে—আমি তা হলে কোন্ চুলোর কে? হুঁ হুঁ ব্বাবা, এটাই হল সমস্যা!" তার পর, চেনাজানা সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কথা মনে করে করে দেখতে লাগল যে, সে বদলে গিয়ে তাদের কেউ হয়ে গেছে কি-না।

বললে, "আমি এডা নই নির্ঘাৎ, কারণ তার চুল কেমন কোঁকড়ানো, আমার চুল তো একদম সোজা। আর, আমি মেবেল-ই বা হব কী করে, কারণ আমার কত জ্ঞানগম্যি, আর মেবেল? ওঃ, কীই-বা জানে বেচারা! আর, তাছাড়া, মেবেল হল মেবেল, আর আমি হচ্ছি আমি, আর দূর—ছাই, যাচ্ছেতাই গোলমেলে ব্যাপার সব! আচ্ছা, এবার দেখা যাক, যা যা জানতুম, সব এখনো মনে

আছে কি-না। দেখি তো : চার-পাঁচে বারো, আর, চার-ছয়ে তেরো, আর, চার-সাতে হল—হায় কপাল! এরকম করলে তো কুড়ি পর্যন্ত পৌঁছনোই যাবে না! যাক গে, নামতা দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। ভূগোল নিয়ে বেয়েচেয়ে দেখা যাক : প্যারিসের রাজধানী হল গিয়ে লণ্ডন, আর রোমের রাজধানী হল প্যারিস, আর রোম হচ্ছে—নাঃ, সব ভুল, সমস্ত ভুল, বেশ বুঝতে পারছি একটাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি মেবেল হয়ে গেছি! দেখি তো চেষ্টা করে, সেই কবিতাটা বলতে পারি কি-না, 'ছোট্টো...শুয়ে শুয়ে'; তার পর সে পড়া-বলার মতো করে কোলের ওপর হাত জড়ো করে ছড়া আওড়াতে লাগল। কিন্তু, গলার আওয়াজটা যেন কেমন ভাঙা ভাঙা আর অদ্ভুত-শোনাচ্ছে; তা ছাড়া কবিতাটাও ঠিক আসলের মতো হচ্ছে না—

"(আহা) ছোট্টো কুমির কেমন শুয়ে শুয়ে
শান দিয়ে নেয় ঝক্‌ঝকে তার ল্যাজে,
নীল নদেরই জলের ধারায় ধুয়ে
সোনার বরন আঁশগুলি তার মাজে!

(আহা) ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে,
থাবাখানি আগায় সে নিঃসাড়ে
হাসিমুখের ভেতর চুনো মাছে
আদর করে ডাকছে বারে বারে!"

"নাঃ, কথাগুলো বিলকুল ভুল হচ্ছে," বলতে বলতে বেচারা অ্যালিসের দু চোখে আবার জল এসে গেল, "শেষ অবধি মেবেলই হয়ে গেছি দেখছি। তার মানে আমায় এখন গিয়ে থাকতে হবে সেই ঘুপসি বাড়িটাতে, খেলা করতে পুতুলও জুটবে না কপালে, আর, ওফ্! কত পড়াই না মুখস্থ করতে হবে আমায়। নাঃ, একেবারে পাকাপাকি মন ঠিক করে ফেলা যাক; যদি মেবেল-ই হই, তাহলে এখানে এই পাতালপুরীতেই থাকব! ওরা যদি গর্তের ওপর থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ডাক পাড়ে 'ওপরে এস গো সোনামণি', তা হলে ওপরবাগে চেয়ে চেঁচিয়ে বলব, 'আমি তা হলে কে? সেটা আগে বলে দাও, যদি সেই মেয়ে হতে আমার আপত্তি না-থাকে, তবেই ওপরে যাব,

অ নইলে রইলুম এইখানে বসে, যতক্ষণ না অন্য কেউ হয়ে যাই'—কিন্তু, মাগো মা।" অ্যালিস হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "ভগবান, সত্যিই যেন ওরা কেউ গর্তের ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমায় ডাকে! একা একা থাকতে যে আর পারি না গো!"

এই বলতে বলতে নিজের হাতের দিকে চোখ পড়তেই দ্যাখে যে বকর বকর করতে করতে কখন খরগোসভায়ার একটা দস্তানা সে পরে ফেলেছে, কী আশ্চর্য! অ্যালিস ভাবছে, 'কী করে পরতে পারলুম? নিশ্চয়ই তা হলে আবার ছোটো হয়ে যাচ্ছি!' অ্যালিস উঠে পড়ল, টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে মেপে দেখলে; হ্যাঁ, যদ্দূর মনে হচ্ছে, লম্বায় এখন সে ফুট দুয়েক হবে; শুধু তাই নয়, হু হু করে ক্রমশ আরো ছোটো হয়ে যাচ্ছে। চট্ করে সে বুঝে নিলে যে, তার হাতের ঐ পাখাটাই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া, ঝট করে পাখাটা ফেলে দিলে। ভাগ্যিস ফেলে দিলে, নইলে আর একটু হলেই ছোটো হতে হতে একেবারে ভোঁ হয়ে যেত সে।

"খুব বাঁচা বেঁচে গেছি রে বাবা!" হঠাৎ বদলে গিয়ে ভয় পেয়েছে বটে, তবে একেবারে ফুরিয়ে যে যায় নি, তাতেই খুশি। "ব্যাস, এবার সোজা বাগানে যাওয়া যাক," বলেই সাঁ করে ফিরে এল সে দরজার কাছে। কিন্তু, ও হরি! দরজাটা কখন যেন বন্ধ হয়ে গেছে, আর চাবিটাও আগের মতো ফিরে গেছে টেবিলের ওপর! বেচারা অ্যালিস ভাবলে, 'নাঃ, ব্যাপার-স্যাপার দেখছি ক্রমশই আরো বিদি-কিচ্ছিরি হয়ে যাচ্ছে, কারণ, আমি তো এত ক্ষুদে কখখনো ছিলাম না, না, কখখনো না, কিছুতেই না! খুব বিচ্ছিরি, একদম বিচ্ছিরি!'

এই-সব ভাবছে, আর অমনি পা পিছলে ঝপাং! গলা অবধি নোনা জলের মধ্যে পড়ে গেছে অ্যালিস। প্রথমে ভাবলে কেমন করে সুমুদ্দুরে পড়ে গেছে বোধ হয়। মনে মনে বললে, 'তা যদি হয়, তা হলে রেলে করে ফিরে যেতে পারব।' (জীবনে একবারই সে সুমুদ্দুর দেখেছে; সেখানে যা দেখেছে, তাই থেকে তার ধারণা হয়েছে যে, ইংলণ্ডের যে-কোনো জায়গায় সুমুদ্দুরের ধার হলেই সেখানে ছেলে-মেয়েরা বালি নিয়ে খেলা করে, তার পরেই থাকে একসার বাসাবাড়ি, আর তার পেছনে রেলের ইস্টিশান।) যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে যে, সুমুদ্দুর নয়, ন'ফুট লম্বা অবস্থায় সেই

যে সে অঝোরে কেঁদে ভাসিয়েছিল, এ জল তারই—পুকুর হয়ে গেছে।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে অ্যালিস ভাবলে, 'নাঃ, অতোটা কাঁদা ঠিক হয় নি! নিজের চোখের জলে নিজেই ডুবে যাওয়া—কী শাস্তি তোলা আছে তার জন্যে কে জানে! কী অদ্ভুত কাণ্ড হবে তা হলে! অবশ্য আজকের তো সবই অদ্ভুত!'

ঠিক এমনি সময়ে সে শুনতে পেলে খানিকটা তফাতে জলের মধ্যে ছপ্ ছপ্ শব্দ। সাঁতরে এগিয়ে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী।
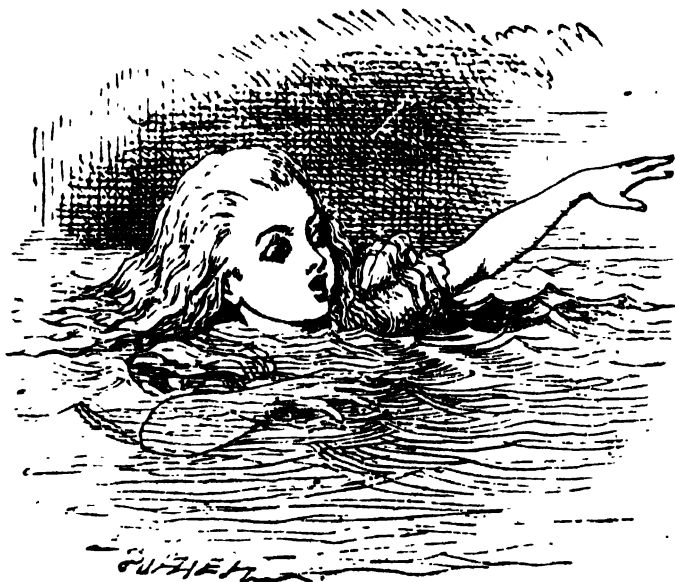
চোখে যা পড়ল, তাতে প্রথমে মনে হল সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তী কিছু একটা হবে; কিন্তু চট্ করে মনে পড়ে গেল, সে নিজে তো এখন পুঁচকে হয়ে গেছে। কাজেই বুঝতে দেরি হল না যে, জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা নেংটি ইঁদুর, তারই মতো হড়কে জলে পড়ে গেছে।

অ্যালিস ভাবলে, 'নেংটির সঙ্গে আলাপ করে কিছু লাভ হবে কি? এখানকার ব্যাপার-স্যাপার যেরকম কিম্ভূত দেখছি, বলা যায় না, নেংটি ইঁদুরও হয়তো কথা বলতে পারে। যাই হোক, একবার পরখ করে

দেখলে তো ক্ষতি নেই।' এই-না ভেবে অ্যালিস বলতে শুরু করলে, "হে নেংটি, এই পুকুর থেকে বেরব কিভাবে বলতে পার কি? সাঁতার কাটতে কাটতে হাত-পা এলিয়ে পড়ছে আমার, নেংটি হে!" (অ্যালিস ভেবেছে, নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে আলাপ করার এটাই নিশ্চয়ই ঠিক নিয়ম; আগে অবশ্য কখনো ইঁদুরের সঙ্গে তার আলাপ করার দরকার পড়ে নি, তবে তার দাদার ব্যাকরণের বইতে দেখেছে, 'একটি নেংটি ইঁদুর—একটি নেংটি ইঁদুরের—একটি নেংটি ইঁদুরকে—হে নেংটি ইঁদুর!') নেংটি সেই শুনে বেশ একটু ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল একবার, মনে হল একবার যেন চোখ মটকালে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

অ্যালিস ভাবলে, 'ইংরেজি বোঝে না বোধ হয়। হুঁ, ঠিক ধরেছি, ফরাসী নেংটি হবে নিশ্চয়ই, উইলিয়াম দি কঙ্কারার-এর সঙ্গে এদেশে এসেছে।' (ইতিহাসে অ্যালিসের যা জ্ঞান, তাতে কোন্ ঘটনা কবে ঘটেছে, বিলকুল কিচ্ছু তার জানা নেই।) সে আবার নতুন করে শুরু করলে, "উ এ মা শ্যাট?" অ্যালিসের ফরাসী ভাষা শেখবার বইয়ের প্রথম পাঠেই ঐ কথাগুলো আছে। শুনেই নেংটিটা তিড়িং করে জলের ওপর লাফিয়ে উঠল একবার, তার পর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অ্যালিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আহা আহা, মাফ কর ভাই, মাফ কর!" বেচারা নেংটির মনে কষ্ট দেবার তার একদম ইচ্ছে ছিল না! "একদম মনেই ছিল না ভাই, যে, বেড়াল-টেড়াল মোটেই পছন্দ কর না তুমি।"

সরু কাঁপা-কাঁপা গলায় নেংটি ফেটে পড়ল, "বেড়ালদের পছন্দ করি কি-না! পছন্দ করি কি-না! পছন্দ! তুমি যদি আমি হতে, করতে পছন্দ?"

খুব শান্ত গলায় অ্যালিস জবাব দিলে, "না, করতাম না বোধ হয়। যাই হোক, এ নিয়ে আর রাগারাগি করো না, ভাই। তবে, একটা কথা তবু আমি বলবই, আমাদের মিনি বেড়াল ডাইনাকে যদি একবার দেখাতে পারতুম তোমায়; একবার দেখলে বেড়ালের ওপর তোমার টান ধরে যেত। আহা, ডাইনা আমার কী মিষ্টি, আর কী শান্ত,"—সেই পুকুরে গা ভাসিয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে কাটতে অ্যালিস খানিকটা যেন আপন মনেই বলে চলল,

—"আগুনের ধারে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করে কী সুন্দর করে বসে থাকে, থাবা চাটে, মুখ পরিষ্কার করে—আর কী নরম, আদর করতে কী ভালোই যে লাগে—আর ইঁদুর ধরতে যে কী ওস্তাদ—ওঃ হো, না না, মাফ কর, ভাই, মাফ কর, ঘাট হয়েছে!" ভুল বুঝতে পেরে অ্যালিস আবার খুব ঘটা করে ক্ষমা-টমা চাইলে, কেননা নেংটির এবার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে; অ্যালিস বেশ টের পেলে, বড়ো বেশি লেগেছে বেচারির মনে। "ঠিক আছে, যখন পছন্দই কর না, তখন ডাইনার কথা আর না-ই বললাম আমরা।"

"একশো বার পছন্দ করি না, হাজার বার পছন্দ করি না!" নেংটির এখন ল্যাজের ডগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছে। "হুঁঃ, ইয়ের কথা বলতে আমার বয়েই গেছে! আমার বংশের সব্বাই বরাবর বেড়ালকে ঘেন্না করে এসেছে; বদখৎ ছোটোলোক, বিদিকিচ্ছিরি জিনিস একটা! আর যেন কখনো তোমার মুখে ও নাম না-শুনি!"
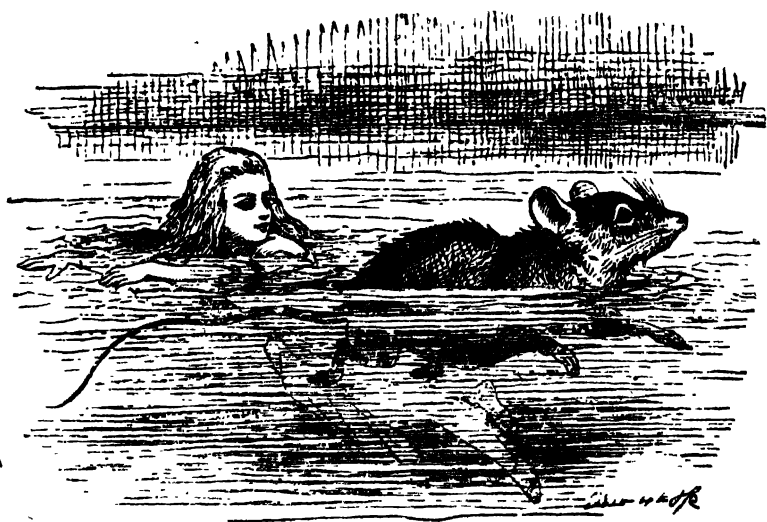
"নিশ্চয়ই না, কখখনো বলব না!" কথা ঘোরাবার জন্যে তাড়াতাড়ি এই বলে অ্যালিস অন্য কথা পাড়লে, "তুমি কি—তুমি কি—মানে—কুকুর ভালো লাগে তোমার?" নেংটি কোনো জবাব দিল না দেখে অ্যালিস বেশ জমিয়ে বলতে লাগল, "আমাদের বাড়ির কাছে

কী সুন্দর ছোট্টো একটা কুকুর আছে, একবার যদি দেখতে তাকে! চোখ দুটো কেমন চকচকে, ছোট্টো একটা টেরিয়ার কুকুর, আর, আহা, এত্তো বড়ো-বড়ো কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো বাদামী লোম তার গায়ে! কোনো জিনিস ছু ড়ে দাও, ঠিক নিয়ে আসবে, দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে কেমন খাবার চাইবে, আরো কতো কী যে সব করবে, কতোই-বা বলব, আদ্দেক তো মনেই পড়ছে না। কুকুরটা একজন চাষীর, বুঝলে? চাষী বলে, 'কুকুরটা এতো কাজের, তার দাম হবে একশো পাউণ্ড! বলে, কুকুরটা মেরে মেরে ইঁদুরের উলকুল উজাড় করে'—ঐ যাঃ, পোড়া কপাল আমার! আবার চটালাম না-কি!" নেংটি ততক্ষণে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে কাটতে জল তোলপাড় করে অ্যালিসের কাছ থেকে সরে পড়ছে।

অ্যালিস খুব মিষ্টি করে পেছন থেকে ডেকে বললে, "নেংটি-সোনা! ফিরে এস না ভাই, তোমার যখন ভালোই লাগে না, বেশ, বেড়াল বা কুকুর, কারো কথাই তুলব না আর!" কথাটা কানে গেল; নেংটি মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে সাঁতরে ফিরে এল অ্যালিসের কাছে। মুখটা তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, (বোধ হয় রাগের চোটে) খুব কাঁপা-কাঁপা নিচু গলায় বল্‌লে, "চল, পাড়ে গিয়ে উঠি! তার পর তোমায় বলব আমার ইতিহাস, তখন বুঝবে, কেন বেড়াল আর ককর আমার দু চক্ষের বিষ।"

এবার পাড়ে ওঠা নেহাৎ-ই দরকার, কেননা ততক্ষণে আরো সব নানারকম পাখি-টাখি জন্তু-জানোয়ার সেই পুকুরে থিক্ থিক্ করছে। পাতিহাঁস আছে, ডোডো পাখি আছে, তোতা পাখি আছে, বাচ্চা ঈগল আছে, আরো সব অদ্ভুত অদ্ভুত জানোয়ার। অ্যালিস চলল আগে আগে, পেছনে পেছনে চলল আর সবাই—পাড়ের দিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দঙ্গল-দৌড় আর লম্বা ল্যাজ

পাড়ে এসে যখন সবাই জড়ো হল, তখন দেখা গেল, কী ছিরিই খুলেছে সব। পাখি-টাখিদের পালকগুলো নোংরা-ঝোংরা, জানোয়ার-গুলোর লোম-টোম সব ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, সবাই ভিজে চুপচুপে, সবারই মেজাজ তিরিক্ষি, বদখৎ লাগছে।

প্রথম কথা হল শুকনো হওয়া যায় কী করে ; এ নিয়ে খানিকটা কথাবার্তা হল, আর, খানিক বাদেই অ্যালিস দেখলে, ওদের সঙ্গে দিব্যি আপনজনের মতোই আলাপ করছে সে, যেন কতো কালের চেনা। তোতা পাখিটার সঙ্গে তার তো বেশ কথা-কাটাকাটিই হয়ে গেল এক চোট। শেষ পর্যন্ত একগুঁয়ে কচি খোকার মতো হাঁড়িমুখ করে তোতা বললে, "আমি বয়েসে তোমার চেয়ে বড়ো, কাজেই, তোমার চেয়ে বেশি জানি।" কিন্তু বল্‌লেই তো হল না, তোতার বয়েসটা তো জানা চাই ; কিন্তু তোতা যখন সাফ জবাব দিলে যে, সে বয়েস-ফয়েস বলবে না, তখন আর কী, চুপ করেই থাকতে হয়।

নেংটিকেই ওর মধ্যে একটু মুরুব্বি মুরুব্বি মনে হয়। শেষমেস সে-ই হাঁকলে, "বসো সবাই, বসে পড়, আমি যা বলি, শোন! এক্ষুনি আমি তোমাদের শুকিয়ে দিচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল সবাই গোল হয়ে, মাঝখানে রইল নেংটি। অ্যালিস তার দিকে চেয়ে আছে বড়ো আগ্রহ নিয়ে, কারণ বুঝতে পারছে, আর বেশিক্ষণ এমনি ভিজে অবস্থায় থাকলে, নির্ঘাৎ সর্দি লেগে যাবে।

"হুম্ !" বলে বেশ ভারিক্কি চালে শুরু করলে নেংটি, "তৈরি আছ তো সবাই। সবচেয়ে রস-কষহীন শুকনো জিনিস যা জানি, তাই-ই তোমাদের বলব, চুপ করে ঠাণ্ডা হয়ে বস সবাই! উইলিয়াম দি কঙ্কারার, যাঁর পক্ষে ছিলেন পোপ, স্বল্পকালমধ্যেই আনুগত্য লাভ করিলেন ইংলণ্ডবাসীর, যাহারা ইদানীং অন্যায় দখল আর রাজ্যজয়ের ঘটনায় অত্যন্ত অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। মার্সিয়া এবং নর্দাম্বার-ল্যাণ্ডের আর্ল, এডুইন এবং মর্কার—"

এই জায়গায় হঠাৎ শিউরে উঠে তোতা বলে ফেললে, "ওফ !"

ভুরু কুঁচকে নেংটি বললে—নরম হয়েই বললে অবশ্য, "কী বললে ! তুমি বললে না-কি !"

লরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "না, না, আমি নই !"

নেংটি বললে, "আমার মনে হল, তুমিই যেন কিছু বললে। যাই-হোক আমি তা হলে ফের শুরু করি। মার্সিয়া এবং নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল, এডুইন এবং মর্কার উইলিয়ামের প্রতি তাহাদের সমর্থন ঘোষণা করিল, এবং ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ইহা দেখিলেন যে—"

হাঁস বল্‌লে, "কী দেখিলেন ?"

নেংটি একটু কড়া সুরে বললে, "কী আবার দেখিলেন, 'ইহা' দেখিলেন। 'ইহা' মানে জানা আছে নিশ্চয়ই।"

হাঁস বললে, "আমি নিজে যখন কিছু দেখি, তখন বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না, 'ইহা' মানে কী। তখন 'ইহা' মানে হয় ব্যাঙ, নাহয় কেঁচো। কিন্তু কথা হল, আর্চবিশপ দেখিলেনটা কী!"

নেংটি কথাটা গায়েই মাখলে না, বলে চলল, "—দেখিলেন যে, এড্‌গার অ্যাথেলিঙ্‌-এর সমভিব্যাহারে উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পণ করাই সঙ্গত হইবে। উইলিয়ামের আচরণ আদিতে ছিল মিতাচারীর ন্যায়। কিন্তু নরম্যানদের ঔদ্ধত্যের ফলে—' এখন কেমন লাগছে গো সব!" বলতে বলতে অ্যালিসের দিকে তাকালে।

অ্যালিস দুঃখুদুঃখু গলায় বললে, "যেমনকার তেমনি ভিজে হয়ে রয়েছি, মোটেই শুকোই নি।"

তখন ডোডো উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চালে বললে, "সে ক্ষেত্রে, আরো কড়া ধাঁচের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্যে সভা মুলতুবি রাখা হোক—"

ঈগল-ছানা বললে, "সাদা-মাঠা ভাষায় কথা বল-না দাদা, ঐ সব লম্বা লম্বা কথার আদ্দেকের মানেই বুঝি না, আর, শুধু তাই নয়, তুমি নিজেও যে বোঝ, তাও বিশ্বাস করি না!" বলতে বলতে ঈগল-ছানা ঘাড় নিচু করে হাসিটা আড়াল করলে; অন্য অনেক পাখি শব্দ করেই খিক খিক করে হেসে উঠল।

দমে গিয়ে ডোডো তখন বেচারি-পানা গলায় বললে, "আসলে আমি বলতে চাইছিলাম কি যে, শুকনো হবার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে দঙ্গল-দৌড়।"

"দঙ্গল-দৌড় আবার কী জিনিস?" আসলে অ্যালিসের যে সত্যিই জানবার ইচ্ছে হয়েছে তা নয়, তবে, ডোডো কথা বলতে বলতে এমনভাবে থেমে গেল যে, মনে হল, কারুর-না-কারুর কিছু একটা কথা বলা দরকার, নইলে ভালো দেখায় না; অথচ অ্যালিস ছাড়া আর কেউ যে মুখ খুলবে, তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

ডোডো বললে, "কথায় কাজ কী, করে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

(শীতকাল পড়লে কোনোদিন হয়তো তোমাদেরও করে দেখতে ইচ্ছে হতে পারে, তাই ডোডো কী ব্যবস্থা করলে জানিয়ে রাখছি।)

প্রথমেই ডোডো দৌড়ের পাল্লা ছকে দিলে গোল মতন একটা দাগ দিয়ে (বললে, "গোল হবে কি চৌকো হবে তাতে কিস্যু আসে-যায় না।") তার পর দলের সবাইকে সেই দাগের এখানে-ওখানে দাঁড় করান হল। 'রেডি, সেডি, গো—' এ-সবের বালাই নেই, যার যখন খুশি দৌড়চ্ছে, আবার যখন খুশি থেমে পড়ছে, কাজেই, দৌড় যে কখন শেষ হচ্ছে, বোঝাই গেল না। তবে, আধ ঘণ্টাটাক দৌড়বার পর যখন দেখা গেল সবাই বেশ শুকিয়ে গেছে, তখন ডোডো হেঁকে উঠল, "দৌড় খতম!" তখন সব্বাই তাকে ঘিরে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "জিতল কে ?"

উত্তর দিতে গিয়ে ডোডোকে বেশ চিন্তায় পড়তে হল, কপালে একটা আঙুল রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল (বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের ছবিতে যেমন দেখা যায়), আর বাকি সবাই চুপটি করে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে ডোডো শেষকালে ফতোয়া দিলে, "সব্বাই জিতেছে, সব্বাই পুরস্কার পাবে।"

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা শোনা গেল এবার, "কিন্তু পুরস্কার দেবে কে ?"

আঙুল দিয়ে অ্যালিসকে দেখিয়ে ডোডো বললে, "কে আবার, ঐ মেয়েটা !" আর, সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই মিলে অ্যালিসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হট্টগোল করে চেঁচাতে লাগল, "প্রাইজ দাও, প্রাইজ !"

অ্যালিস তো ভেবেই পাচ্ছে না, কী করা যায় ; ভেবে কূল না-পেয়ে ঘাগরার পকেটে হাত ঢোকালে। সেখান থেকে বেরল শুকনো মোরব্বার বাক্স (ভাগ্যিস তার মধ্যে নোনা জল ঢোকে নি), সেই থেকে সবাইকে একটা-একটা দিলে। একেবারে টায়ে টায়ে কুলিয়ে গেল।

নেংটি তখন বললে, "কিন্তু, ও নিজেও তো একটা প্রাইজ পাবে, না-কী ?"

ডোডো খুব গ্রাম্ভারি চালে বললে, "একশো বার, একশো বার।" তার পর অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমার পকেটে আর কী আছে ?"

অ্যালিস করুণ গলায় বললে, "শুধু ছোট্টো একটা আঙুল-ঢাকা টোপর, সেলাই করবার সময়ে পরে, যাতে ছুঁচ ফুটে না-যায়।"

ডোডো বললে, "দাও তো আমাকে।"

আবার সবাই অ্যালিসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর ডোডো মন্তর পড়ার মতো গম্ভীরভাবে বললে, "এই অতি সুন্দর বস্তুটি গ্রহণ করে আমাদের সবাইকে কৃতার্থ কর।" ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাহবা দিতে শুরু করলে।

পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট লাগছে অ্যালিসের, কিন্তু সবাই যেরকম গম্ভীরভাবে করছে-কম্মাচ্ছে, হাসতে সাহস হল না; কী যে বলবে, তাও ভেবে পেল না, মাথাটা একবার সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে সেই আঙুল-ঢাকাটা নিলে, যতটা পারা যায় গম্ভীর হয়ে রইল।

এবার সেই শুকনো মোরব্বা খাওয়ার পালা। খাওয়ার সময়ে বেশ খানিকটা গোলমাল হল, হট্টগোল হল, কারণ, বড়ো-বড়ো পাখিরা নালিশ জানাতে লাগল যে, ভালোমতো স্বাদ পাবার আগেই মোরব্বা পেটে চলে গেছে, আর ছোটো-ছোটো পাখিদের বেলা মোরব্বার টুকরো গেল গলায় আটকে, পিঠে থাবড়া মেরে মেরে তবে নামে। যাই হোক, খাওয়ার পালা চুকল এক সময়ে, তখন আবার সবাই গোল হয়ে বসল; নেংটিকে সবাই আরো কিছু বলবার জন্যে ধরাধরি করলে।

অ্যালিস বললে, "আমায় তোমার ইতিহাস শোনাবে বলেছিলে, মনে আছে তো?" তার পর ফিস্‌ফিস্‌ করে আরো বললে, "বলেছিলে বে আর কু কেন তোমার দু চক্ষের বিষ, সেই গল্প আমায় শোনাবে।" একটু একটু ভয় করছে, নেংটি আবার না চোটে যায়।

অ্যালিসের দিকে ফিরে ফোঁস করে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে নেংটি বললে, "সে বড়ো করুণ কাহিনী, বড্ডো বড়ো, আগা থেকে গোড়া, মুড়ো থেকে ল্যাজা, অনেক লম্বা।"

নেংটির পেছন বাগে তাকিয়ে দেখে নিয়ে অ্যালিস বললে, "তা তো দেখতেই পাচ্ছি, ল্যাজটা তো তোমার বেশ লম্বাই বটে, কিন্তু তাতে দুঃখের কী আছে!" অ্যালিস তখনো ল্যাজের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, এদিকে নেংটি তার কাহিনী বলে চলেছে; অ্যালিসের কল্পনায় তাই গল্পের চেহারাটা দাঁড়াল এইরকম—

নেড়ি কুকুর করছিল পায়চারি,
নেংটি দেখে ছুটে তাড়াতাড়ি,
দাঁত খিঁচিয়ে বললে এসে চোটে,
"তোর নামেতে নালিশ আছে
কোর্টে। এক্ষুনি এক ভীষণ
কঠিন মামলা করবো
দায়ের, এখন ঢ্যালা
সামলা! কস্‌নে কথা
মানবো নাকো বারণ,
মামলা হবেই, সেটার
আসল কারণ—আজকে
আমার নেই কোনো
কাজকম্মো।" নেংটি
বলে, "মশাই, একী
ধম্মো! জজ নেইকো,
জুরীও নেই, তবে?
মামলা লড়া
পণ্ডশ্রমই হবে।"
স্যায়না কুকুর
বললে, "আমিই
জজ, আমিই
জুরী, করিস নে
গজ্‌গজ্‌! আইন-
মাফিক দেখব
সকল দিক,
করব আমি
ন্যায়-বিচারই
ঠিক। মোকদ্দমার
রায় বেরবে
বিচারে তোর
ফাঁসি
হবে।"

নেংটি অ্যালিসকে হঠাৎ ধমকে বলে উঠল, "মোটেই মন দিচ্ছ না তুমি, কী ভাবছ ?"

অ্যালিস খুব কাঁচমাচু হয়ে বললে, "মাফ কর ভাই ; তুমি তো পাঁচ নম্বর বাঁকের কাছে এসে পৌঁছেছ, তাই না ?"

নেংটি চোটে উঠে বললে, "বাঁক নয়, গাঁট !"

অ্যালিস সর্বদাই লোকের উপকার করতে ভালোবাসে তো, তাই সাত-তাড়াতাড়ি বললে, "গাঁট ? গাঁট পড়ে গেছে তোমার ল্যাজে ? এস না ভাই, খুলে দি !"

নেংটি বললে, "ও-সব কিছু হবে-টবে না," তার পর উঠে চলে যেতে যেতে বললে, "যত সব আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলে আমায় খালি খালি অপমান করা !"

অ্যালিস বেচারা কী আর করে, খুব বিনয় করে বললে, "আমি কিন্তু অপমান করবার জন্যে ও কথা বলি নি। আর, তুমি বড্ডো একটুতেই চোটে যাও !"

উত্তরে নেংটি শুধু বিজ্ বিজ্ করতে লাগল।

অ্যালিস পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে, "দয়া করে ফিরে এস, ভাই, গল্পটা শেষ করে যাও !" তখন বাকি সব্বাই এক সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, ভাই, লক্ষ্মীটি ভাই !" নেংটি শুধু অস্থিরভাবে ঘন ঘন মাথা নাড়াতে লাগল, আর, আরো তাড়াতাড়ি পা চালালে।

নেংটি চোখের আড়াল হতেই তোতা ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "আহা গো, থাকল না, চলে গেল !" এক কাঁকড়া-বুড়ি সেই ফাঁকে আবার তার মেয়েকে বলতে লাগল, "দেখলে তো মা, শিখলে তো ? কখখনো মেজাজটি খারাপ করবে না।" কাঁকড়া-মেয়ে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, "থাম, মা, থাম, তোমায় দেখলে শামুক-ঝিনুকের পর্যন্ত পিত্তি চোটে যায় !"

কাউকে ঠিক শোনাবার জন্যে নয়, এমনিই অ্যালিস বলে উঠল, "আহা, আমাদের ডাইনা এখানে থাকলে সত্যিই বড়ো ভালো হত ; তা হলে এক্ষুনি নেংটিকে ফিরিয়ে আনতে পারত গো !"

লরী বললে, "যদি অভয় দাও তো বলি, ডাইনাটি কে ?"

অ্যালিসের তো তার পোষা বেড়াল-টেড়ালের কথা বলতে ভালোই লাগে, তাই খুব আগ্রহ নিয়ে বলতে লাগল, "ডাইনা হল আমাদের

পোষা বেড়াল। ইঁদুর ধরতে যে কী ওস্তাদ, ধারণাই করতে পারবে না! ওঃ, আর পাখিদের পেছনে যে কী কাণ্ডই করে, একবার যদি দেখতে! পাখি চোখে পড়েছে কী আর রক্ষে নেই, ছোটোখাটো পাখি হলে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবে!"

অ্যালিসের এই বক্তিমে শুনে পুরো দলটার মধ্যে একটা আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল। কয়েকটা পাখি তো তক্ষুনি কেটে পড়ল; একটা ম্যাগপাই পাখি তার লম্বা ল্যাজ-ট্যাজ বেশ করে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে নিতে বিড়্ বিড়্ করে বললে, "নাঃ, এবার সত্যিই বাড়ি ফেরা দরকার; রাত্তিরের হাওয়াটা আবার আমার গলার পক্ষে বড়ো খারাপ!" একটা ক্যানারি পাখি তার ছানা-পোনাদের ডেকে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, "আয় রে বাছারা, চলে আয়, তোদের ঘুমের সময় হল!" নানান রকম সাফাই গেয়ে কেটে পড়তে লাগল সবাই একের পর এক; অ্যালিস আবার সেই একলা।

দুঃখু করে অ্যালিস বললে, "ডাইনার কথাটা কেন যে তুললুম ছাই! এখানে কেউই তো দেখছি ওকে পছন্দ করে না, অথচ আমি জানি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ভালো বেড়াল হচ্ছে ডাইনা! ডাইনা রে, আর কি তোর সঙ্গে দেখা হবে আমার?" বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল অ্যালিস—বড়ো একা একা লাগছে, বড্ডো দমে গেছে বেচারি। যাই হোক, খানিক বাদে কিছুটা তফাতে ফট্ ফট্ পায়ের শব্দ শুনে আকুল হয়ে চোখ তুলে দেখতে চেষ্টা করলে; মনে একটু আশা, হয়তো নেংটিভায়া মত পালেটছে, গল্পটা শেষ করতে ফিরে আসছে বোধ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খরগোসের গোলাম টিকটিকি

সেই সাদা খরগোসটা পটর-পটর করতে করতে ফিরে আসছে, আর চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী খুঁজছে, যেন হারিয়েছে কিছু। অ্যালিসের কানে গেল, সে বিড়্ বিড়্ করে বলছে, "ওরেব্বাবা, জমিদারগিন্নী! ওরেব্বাবা! হায় রে আমার নরম থাবা, হায় রে আমার লোম, হায় রে আমার গোঁফ! জমিদারগিন্নী যে আমায় ফাঁসী দেবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই, বনবেড়াল যেমন সাক্ষাৎ যম, তেমনি খাঁটি কথা! কোথায় যে ছাই ফেললুম জিনিসগুলো?" সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিস বুঝতে পারলে যে, সেই জাপানী হাত-পাখা আর দস্তানাজোড়ার জন্যেই খরগোসভায়ার এতো খোঁজাখুঁজি; তাই সেও ভাবলে, দেখা যাক-না, যদি খুঁজে পাই। সেও খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোত্থাও নেই—সেই পুকুরে সাঁতার-টাতার কাটবার পর থেকে সব কিছু কেমন বিলকুল পাল্টে গেছে, সেই বড়ো হল্‌ঘর, সেই কাঁচের টেবিল, সেই ছোট্টো দরজা—কিচ্ছুটি নেই, সব উবে গেছে।

মাথা নিচু করে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে খরগোসভায়ার চোখ পড়ল অ্যালিসের দিকে, ধমকের সুরে বললে, "ব্যাপারটা কী, মেরি অ্যান! এখানে কী করছিস, এ্যাঁ? যা দিকিনি বাড়ি থেকে দৌড়ে একজোড়া দস্তানা আর-একটা হাত-পাখা নিয়ে আয় তো! য়্যা,

"যা, চট্ করে যা!" খরগোসভায়া যেদিকে আঙুল দেখাল, অ্যালিস ভ্যাবাচাকা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে দৌড়তে লাগল।

দৌড়তে দৌড়তে ভাবলে, 'নির্ঘাৎ ব্যাটা আমায় ঝাড়ির ঝি বলে ভুল করেছে। যখন টের পাবে, আসলে আমি কে, তখন কী চমকেই না যাবে! তবে, ওর দস্তানা আর হাত-পাখাটা বরং এনেই দেওয়া যাক, মানে, যদি অবশ্য জোগাড় হয়।' বলতে না বলতেই সুন্দর একটা ছোট্টো বাড়ির সামনে এসে পৌঁছে গেছে অ্যালিস, তার দরজায় ঝক্‌ঝকে পেতলের পাতের ওপর লেখা রয়েছে 'সা. খরগোস'। কড়া-টড়া নাড়লে না, ভয় হল, পাছে সত্যিকারের মেরি অ্যানের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে যায়। সোজা উঠে গেল ওপরে। কারণ, মেরি অ্যানের সঙ্গে দেখা হলেই হয়তো তাকে ভাগিয়ে দেবে, দস্তানা আর হাত-পাখা খোঁজার সুযোগই পাবে না।

অ্যালিস নিজের মনেই বললে, 'কী মজার-ই না লাগছে, খরগোসের ফরমাশ খাটছি। এর পর ডাইনাও আমায় কাজে পাঠাবে হয়তো!' সেটা কেমন হবে, ভেবে দেখতে লাগল অ্যালিস: 'মিস্ অ্যালিস! শিগ্‌গির চলে এস, বেড়াতে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও।' 'এক্ষুনি আসছি দিদিমনি!' কিন্তু, ডাইনা যতক্ষণ না এসে পৌঁছোয়, ততক্ষণ ইঁদুরের গর্তের দিকে নজর রাখতে হবে যে আমায়! ইঁদুরগুলো যাতে বেরিয়ে না পালায়, দেখতে হবে যে! ডাইনা সত্যি সত্যি এইরকম হুকুম করে বেড়ালে, বাড়িতে সবাই ওকে দাবড়ানী দিয়ে থামিয়ে দেবে না তো?'

ইতিমধ্যে সে একটা সাজানো-গোছানো ছোট্টো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে! সেখানে জানালার গায়ে একটা টেবিল, আর, টেবিলের ওপর (অ্যালিস এমনিই আশা করেছিল মনে মনে) একটা হাত-পাখা আর দু-তিন জোড়া সাদা দস্তানা। পাখাটা আর এক জোড়া দস্তানা তুলে নিয়ে বেরবার জন্যে দরজার দিকে এগোতে গিয়েই চোখে পড়ল আয়নার সামনে একটা ছোট্টো বোতল বসান রয়েছে। এ বোতলটার গায়ে অবশ্য লেবেলে 'আমায় খাও'-টাও লেখা নেই। তা সত্ত্বেও অ্যালিস ছিপি খুলে বোতলটা মুখের মধ্যে উপুড় করে দিলে। মনে মনে বললে, 'কিছু খেলেই দেখা যাচ্ছে উদ্ভট কিছু একটা ঘটবেই, কাজেই দেখতে চাই, ইনি আবার কী ক্যারদানী

দেখান। ভগবান করুন, যেন আবার লম্বা হয়ে যাই, কারণ পুঁচকে থাকতে থাকতে এলে গেছি একেবারে!'

ভগবান ঠিক তাই-ই করলেন, অ্যালিস যতটা সময় লাগবে বলে ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই করলেন। বোতলের অর্ধেকটা সাবাড় করবার আগেই তার মাথাটা ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, ঘাড় মট্‌কে যাবার ভয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলতে হল। বোতলটা ঠক্ করে মাটিতে নামিয়ে রেখে বললে, "খুব হয়েছে, আর দরকার নেই বাবা—আশা করি আর বাড়ব না—এর মধ্যে এমন বেড়ে গেছি যে, দরজা গলে বেরবার তো উপায় রইল না—নাঃ, চট করে অতটা না-খেলেই ভালো ছিল!"

কিন্তু, হায় রে হায়! এখন আর সে কথা ভেবে কোনো লাভ নেই! বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে, দেখতে না দেখতে এতো লম্বা হয়ে গেল যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হল! মিনিট খানেকের মধ্যে যখন এমন অবস্থা হল যে বসে থাকাও আর সম্ভব নয়, তখন একটা হাতের কনুই দরজায় গুঁজে আর-একটা হাত মাথায় জড়িয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু, তখনো তার বাড়ের শেষ হল না। শেষ পর্যন্ত একটা হাত সে জানলা দিয়ে বাইরে বার

করে দিলে, আর-একটা পা গলিয়ে দিয়ে চিম্‌নির ফোঁকরের মধ্যে। বললে, "ব্যাস, আর কিচ্ছু করবার নেই আমার, এখন যাই হোক আর তাই হোক। কী হবে রে বাবা শেষ পর্যন্ত।"

ভাগ্য ভালো, বোতলের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে, এর পর আর সে বাড়ল না। তা যেন হল, কিন্তু, এ কী বদখৎ অবস্থা! যখন বুঝলে যে, এখান থেকে বেরবার কোনো উপায়ই নেই, তখন বেচারী মুষড়ে পড়বে না তো আর কী হবে!

অ্যালিস ভাবতে লাগল, 'বাড়িতে অনেক ভালো ছিলাম; খালি খালি বড়ো হওয়া নেই, খালি খালি ছোটো হওয়া নেই, ইঁদুর আর খরগোসের হুকুম তামিল করার ঝামেলা নেই। এখন একটু একটু মনে হচ্ছে, খরগোসের গর্তে না ঢুকলেই বোধ হয় ভালো হত—কিন্তু —তবু—ভেবে দ্যাখো, এইরকম সব মজার কাণ্ড-কারখানা, মন্দ লাগে না! কী যে হল আমার, ঠিক ধরা যাচ্ছে না! যখন রূপকথার গল্প পড়তাম, মনে হতো, ও-সব সত্যি সত্যি হয় না, আর এখন তো দেখছি নিজেই রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি! আমায় নিয়ে একটা বই লেখা উচিত, নিশ্চয়ই উচিত। যখন বড়ো হব, নিজেই একটা বই লিখে ফেলব—কিন্তু বড়ো হতে আর বাকি কী'— এবার গলায় দুঃখু মেশান—'অন্তত এখানে তো আর বড়ো হওয়ার জায়গাই নেই মোটে!"

আবার ভাবলে, 'তার মানে কি, আর আমি একটুও বড়ো হব না? এক দিক থেকে অবশ্য সুখের কথা—বুড়ি হব না কোনো কালে—কিন্তু, তার মানে তো পড়া মুখস্থ করার পালাও শেষ হবে না কোনোদিন! ওরে বাবা, সে আমার সইবে না!'

নিজের কথার উত্তর দিয়ে নিজেই বললে, "ওরে হাঁদা গঙ্গারাম অ্যালিস, এখানে পড়াশুনো করবি কী করে রে, বোকা মেয়ে? তোর নিজের জায়গাই কুলোয় না, বইপত্তর রাখবি কোথায়!"

এইভাবে নিজেই প্রশ্ন তোলে, নিজেই তার জবাব দেয়; বেশ রীতিমতো কথাবার্তাই চলতে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর ঘরের বাইরে কার যেন গলা শোনা যেতে, বক্‌বকানি থামিয়ে অ্যালিস কান খাড়া করলে।

আওয়াজ এল, "মেরি অ্যান! ও মেরি অ্যান! এক্ষুনি দস্তানা-

জোড়া এনে দে আমায় !" তার পর সিঁড়িতে প্যাটর-প্যাটর পায়ের শব্দ শোনা গেল। অ্যালিস বুঝলে, সাদা খরগোসমশাই আসছেন তারই খোঁজ করতে। ভুলেই গেল যে, এখন সে খরগোসটার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বড়ো, ভয় পাবার কিছু নেই ; সারা শরীর এমন ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল যে, পুরো বাড়িটাই নড়বড় করে উঠল।

ততক্ষণে খরগোসভায়া দরজার গোড়ায় এসে পৌঁছে গেছে, দরজাটা খোলবার চেষ্টা করছে ; কিন্তু দরজাটা তো ভেতর দিকে খোলে, আর অ্যালিসের কনুইটা সেখানে চেপে বসে আছে, কাজেই হাজার চেষ্টাতেও খোলা গেল না। শোনা গেল, বিড়বিড় করে খরগোসটা বলছে, "তা হলে নাহয় ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে জানালা দিয়েই ঢুকি।"

'সে গুড়েও বালি,' মনে মনে বললে অ্যালিস, তার পর যখন মনে হল ঠিক জানলার নীচেই খরগোসটার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তখন হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাতাসে একটা খামচা মারলে। কিছুই ধরতে পারলে না, কিন্তু একটা ভয়-পাওয়া চীৎকার শোনা গেল, আর তার সঙ্গে পড়ে যাবার শব্দ, আর ঝন্‌ঝন্ করে কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ। অ্যালিস বুঝলে, খরগোসটা কোনোও শার্সি-টার্সির ওপর পড়ে গেছে নিশ্চয়ই।

তার পরেই শোনা গেল রাগের গলায় খরগোসটা চেঁচাচ্ছে, "প্যাট্‌! প্যাট্‌! কোথায় গেলি ?" তার পরেই একটা অচেনা নতুন গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "এই যে আমি এখানে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আপেল তুলছি হুজুর !"

খরগোসটা রেগে কাঁই হয়ে বললে, "আপেল তুলছ তো মাথা কিনছ ! এদিকে এস, আমায় এখান থেকে টেনে তোল দিকিনি !" (এইখানে আরো কিছু কাঁচ ভাঙার শব্দ হল।)

"এবার বল্‌ তো প্যাট, জানলায় ওটা কী ?"

"একটা হাত হুজুর, নিচ্চয়ই একটা হাত !" (সে 'নিশ্চয়ই'কে বললে 'নিচ্চই'।)

"বুদ্ধু কোথাকার, ওটা হাত ? অতো বড়ো হাত কেউ কখনো দেখেছে কোনোদিন ? পুরো জানলাটা জুড়ে রয়েছে একেবারে !"

"তা তো রয়েছেই, হুজুর, কিন্তু তা হলেও ওটা হাত-ই বটে।"

"তা সে যাই-ই হোক, এখানেই-বা ওটা মরতে জুটেছে কেন? যা, গিয়ে সরিয়ে দে ওখান থেকে।"

এরপর অনেকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ নেই, মাঝে-মধ্যে অ্যালিস শুধু টুকরো-টুকরো ফিস্‌ফিস্‌ শুনতে পেলে, "বটেই তো, বটেই তো হুজুর, আমার তো মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না, একদম নয়!" "ভীতুর রাজা কোথাকার, যা বললুম কর না!" শুনতে শুনতে অ্যালিস আবার একবার হাতটা বাড়িয়ে বাতাসে খাম্‌চা মারলে। এবারে দুটো চীৎকার শোনা গেল, আর, আরো বেশি কাঁচ ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌। অ্যালিস ভাবলে, 'এদের বাড়িতে কতো কাঁচের শার্সিই আছে রে বাবা! এবার ওরা কী করবে, কে জানে! জানলা দিয়ে আমায় টেনে বার করবে! পারলে তো ভালোই হত! এখানে আর এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারা যাচ্ছে না!'

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলে, কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। শেষ কালে আরো কিছুক্ষণ পরে চলন্ত গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়ানি কানে এল, আর সেইসঙ্গে অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলার আওয়াজ। যেটুকু বোঝা গেল: "আর-একটা মই কোথায় গেল?—সে কী! আমার তো একটাই আনবার কথা; বিল্‌-এর কাছে আর-একটা আছে—বিল্‌! এদিকে নিয়ে এস তো ছোক্‌রা!—হ্যাঁ, এই তো, এই কোণে দাঁড় করিয়ে দাও তো—আহা, না, না, আগে দুটোকে একসঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নাও—এই সেরেছে, তাতেও আদ্দেক পর্যন্তও পেঁছচ্ছে না যে—আঃ, ওতেই হবে! অত খুঁতখুঁত করলে চলে না—এই যে, বিল্‌! দড়িগাছা পাকড়ে ধর তো—ছাদে ওর ভর সইলে হয়!—সাবধান, ওখানকার টালিটা আলগা—ঐ রে খসে পড়ল—মাথা নিচু কর, মাথা নিচু কর!" (দুম্‌ করে জোর শব্দ।) "কাণ্ডটা করলে কে, অ্যাঁ?—আমার তো মনে হয় বিল্‌-ই করেছে—তা হলে চিমনি দিয়ে গলে ঘরের মধ্যে ঢুকছে কে!—না না, এ কাজ আমি পারব না!—পারতেই হবে তোমাকে!—তা হলে, পারলেও আমি করব না!—বিল্‌কেই যেতে হবে—এই যে, বিল্‌! তোমার মনিব বলেছেন, তোমাকেই চিমনির মধ্যে সেঁধিয়ে ঘরের মধ্যে নামতে হবে!"

অ্যালিস আপন মনে বললে, 'ও! দেখা যাচ্ছে, বিল্‌ তা হলে চিমনির মধ্যে দিয়ে আসছে এখানে! সব দায়িত্বই তো এরা বিল্‌-এর

কাঁধে চাপাচ্ছে দেখছি। না, বাবা, হাজার টাকা দিলেও, আমি বিল্ হতে রাজি নই! আমার একটা পা তো চিমনির তলায় চুল্লীর মধ্যে ঢোকানই রয়েছে! খুব ঘুপসি, বেশি জায়গা নেই অবশ্য। তবে মনে হচ্ছে, পা দিয়ে ছোটোখাটো একটা ঠোক্কর মারতে পারব!'

চিমনির তলায় যতটা পারলে পাটা গুটিয়ে নামিয়ে আনলে অ্যালিস, তার পর চুপচাপ থাকতে থাকতে টের পেলে, ঠিক তার পায়ের ওপরেই চিমনির মধ্যে কী যেন একটা জীব (ধারণা করতে পারলে না, কী ধরনের হতে পারে!) নখ দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করছে। অ্যালিস মনে মনে বললে, 'এই হল বিল্,' বলেই ধাঁই করে একটা লাথি ছুঁড়ল, তার পর চুপ করে পড়ে রইল—দেখা যাক ব্যাপারটা কদ্দূর গড়ায়।

এর পর প্রথম যা শোনা গেল, তা হল একসঙ্গে অনেক গলার চীৎকার, "ঐ যে, ঐ যে, বিল্‌কে দেখা যাচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে!" তার পর শুধু খরগোসটার গলা, "ওহে, ঐ যে ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আছ, বিল্‌কে লুফে নাও!" তার পর আবার সব একদম চুপচাপ। তারও পরে আবার নানান জনের কথা বলার গোলমাল—"মাথাটা তুলে ধর, তুলে ধর—হ্যাঁ, এবারে একটু ব্রাণ্ডি দাও—আহা-হা, দেখ, একেবারে দম আটকে দিও না—এই যে, বল তো বাছা, ব্যাপারটা কী ঘটল? কী হয়েছিল তোমার? সব খুলে বল তো আমাদের!"

শেষ-মেশ অতি ক্ষীণ গলায় চিঁচিঁ করে কে যেন বললে (অ্যালিস বুঝলে, এটা বিল্-এর গলা), "কী যে হল, কিছুই জানি না—থাক, আর দেবেন না, ধন্যবাদ! এখন একটু ভালোই লাগছে—কিন্তু মাথার মধ্যে কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, গুছিয়ে বলতে পারব না—যেটুকু টের পেলুম, কী যেন একটা ইস্পিরিং-এর মতো ঠাঁই করে আমার ওপর এসে ঠোক্কর লাগল, আর আমি যেন হাউইয়ের মতো সাঁ করে আকাশে উড়ে গেলাম!"

সবাই বললে, "সত্যিই তাই গিয়েছিলে, বাছা!"

খরগোসের গলা শোনা গেল, "বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিতে হবে!" অ্যালিস তাই শুনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে; "তা যদি কর, তা হলে নির্ঘাৎ ডাইনাকে লেলিয়ে দেব তোমার পেছনে!"
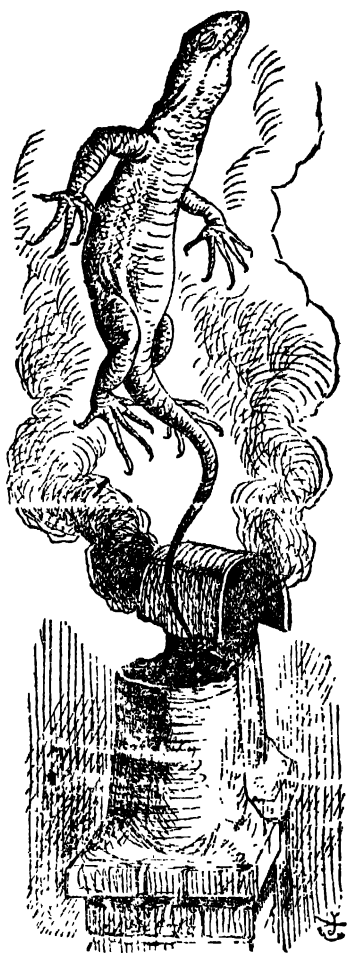
সঙ্গে সঙ্গে সব চুপচাপ, টুঁ শব্দটি নেই। অ্যালিসের ভাবনা শুরু হল, 'এবার ওরা কী করবে! ঘটে যদি একরত্তি বুদ্ধি থাকে, তা হলে ছাদটা খুলে ফেলবে।' দু-এক মিনিট বাদে আবার ওদের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল, অ্যালিস শুনতে পেলে খরগোসটা বলছে, "একগাড়ি হলেই চলে যাবে, আরম্ভ তো করা যাক।"

অ্যালিস ভাবলে, 'একগাড়ি কী?' বেশিক্ষণ অবশ্য ভাবতে হল না, পর মুহূর্তেই জানলায় খটাখট্ ঢিল পড়তে লাগল, দু-একটা জানলা দিয়ে অ্যালিসের মুখে এসেও লাগল। অ্যালিস ভাবলে, 'নাঃ, এ তো থামান দরকার!' তার পর চেঁচিয়ে বললে, "খবর্দার

বলছি, ফের যদি এমন কর, বুঝিয়ে দেব মজা!” এর ফলে আবার একবার সাড়াশব্দ থেমে গিয়ে সব চুপচাপ হয়ে গেল।

অ্যালিস একটু অবাক হয়ে দেখলে যে, ঘরের মেঝেয় পড়ে ঢিলগুলো সব ছোট্টো-ছোট্টো কেক হয়ে গেছে ; দেখে, তার মাথায় একটা মতলব এল। ভাবলে, ‘এই থেকে একটা কেক যদি খাই তা হলে নিশ্চয়ই আমার কিছু-না-কিছু একটা হবেই ; আর, এর চেয়ে বেশি বড়ো হওয়া যখন আর সম্ভব নয়, তখন ছোটোই হব মনে হচ্ছে।’

একটা কেক তুলে গালে ফেলতেই খুশি হয়ে দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে হুস হুস করে সে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। যেই না সেই ঘরের দরজা দিয়ে গলবার মতো ছোটো হয়েছে, আর দেখা-শোনা নয়, চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে বাইরে। এসে দেখে, বাইরে ছোটো-ছোটো পাখি-টাখি আর জানোয়ারদের বেশ বড়োসড়ো একটা ভীড় জমে গেছে। ভীড়ের মাঝখানে রয়েছে বেচারি টিকটিকিটা—সেই বিল্—দুটো গিনিপিগ তাকে তুলে ধরে রেখেছে, আর বোতল থেকে কী যেন খাওয়াচ্ছে। অ্যালিসকে দেখতে পাওয়া মাত্র সবাই হুড়মুড় করে তেড়ে এল তার দিকে ; কিন্তু অ্যালিস প্রাণপণে দৌড় লাগিয়ে এসে পেঁীছল একটা বনের মধ্যে, ওদের নাগালের একদম বাইরে।

বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অ্যালিস ভাবছে, ‘সব চেয়ে আগে দরকার নিজের ঠিক আসল মাপটা ফিরে পাওয়া, আর তার পর দরকার, সেই সুন্দর বাগানে যাবার রাস্তাটা খুঁজে বার করা। এইটাই মনে হচ্ছে সব চেয়ে ভালো মতলব।’

মতলবটা তো ভালোই, বেশ পরিষ্কার, ঝামেলা নেই, কিন্তু একটিমাত্র মুস্কিল হল, সেটা হাসিল করতে গেলে কী করা দরকার, সে সম্বন্ধে এক ফোঁটাও ধারণা নেই যে তার! গাছপালার ফাঁকে যখন উঁকি ঝুঁকি মারছে, হঠাৎ মাথার ওপর চড়া গলার ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় উঁচু করে ওপর দিকে তাকালে।

একটা বিরাট কুকুরছানা মুখ নিচু করে গোল-গোল চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর খুব সন্তর্পণে একটা থাবা বাড়িয়ে তাকে ছোঁবার চেষ্টা করছে। সোহাগ-মেশান গলায় অ্যালিস বললে, “আহা, ছোট্টো সোনামণি রে,” আর শিস দিয়ে তাকে কাছে ডাকবার চেষ্টা করলে ; অবশ্য মনে মনে ভয়ও পাচ্ছে, কুকুরটার খিদে

পায় নি তো! পেলেই তো চিত্তির, যতই সোহাগ জানাক, অ্যালিসকে খেয়ে খিদে মেটান মোটেই অসম্ভব নয়।

খানিকটা নিজের অজ্ঞান্তেই অ্যালিস কখন একটা গাছের ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে কুকুরটার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, আর কুকুরটাও তাই না দেখে চার পা তুলে লাফ দিয়ে, আনন্দে কেঁউ কেঁউ শব্দ করে ডালটার দিকে এগিয়ে এসে মিছিমিছি করে সেটাকে কামড়াতে শুরু করে দিয়েছে।

অ্যালিস তখন তার পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার ভয়ে একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর আবার যখন ঝোপের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল, দেখলে, কুকুরছানাটা তাড়াহুড়ো করে গাছের ডালটা ধরতে গিয়ে একেবারে চার পা তুলে উল্টে পড়েছে। তখন অ্যালিস ভাবলে, এ একেবারে চাকা-লাগান কাঠের ঘোড়ার মতো অবস্থা। কুকুরটা

যেরকম করছে, কখন না-জানি তার পায়ের নীচে পড়ে যায়, সেই ভয়ে অ্যালিস আবার ঝোপটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। কুকুরছানাটা বার বার তেড়ে আসতে লাগল ডালটার দিকে; প্রত্যেকবার একটু একটু করে আরো কাছাকাছি এসে থামছে, আর তেড়ে আসবার জন্যে আরো বেশি ক'রে পেছোচ্ছে, সমানে হেঁড়ে গলায় ঘেউ ঘেউ করে চলেছে; শেষ পর্যন্ত বেশ খানিকটা তফাতে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়েছে, জিভটা মুখের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছে, আর গোল-গোল চোখ দুটো আধ-বোজা করে ফেলেছে।

অ্যালিস দেখলে, সট্‌কাবার এমন সুযোগ আর হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালে, আর যখন পা ভেঙে এল, দম ফুরিয়ে গেল, কুকুরের ডাক দূর থেকে খুব আবছা শোনাতে লাগল-- তখন থামলে।

"তবু বলব বাপু, কুকুরছানাটা কিন্তু কী মিষ্টি!" বলতে বলতে অ্যালিস একটা বাটারকাপ ফুলের গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল, গাছের একটা পাতা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে শুরু করলে। "কুকুরছানাটাকে কিছু খেলা শেখালে হত, কিন্তু, ওকে শেখাতে গেলে শরীরটা যে-মাপের হওয়া দরকার, তা না-হলে তো—ওঃ, ভগবান! আর একটু হলে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমায় তো আবার বড়ো হতে হবে! কী করে হব, ভেবেচিন্তে দেখা যাক। মনে হচ্ছে কিছু একটা গিলতে হবে আমায়; কিন্তু, সমস্যাটা তো রয়েই গেল—গিলবটা কী?"

সত্যিই, খুব বিরাট সমস্যা—কী গিলবে? অ্যালিস চারিপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল—ফুল, ঘাসের শীষ, এমন কিছু চোখে পড়ল না, যা খাওয়া চলে তখনকার মতো। তার কাছেই একটা বিরাট ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, প্রায় তারই মাথার সমান উঁচু। অ্যালিস তার তলা দেখল, এপাশ দেখল, ওপাশ দেখল, পেছনদিক দেখল, কিছুই যখন চোখে পড়ল না, তখন ভাবলে ওপরটাও একবার দেখা যাক, যদি কিছু থাকে।

ডিঙি মেরে টান টান হয়ে ছাতাটার কিনারা থেকে ওপরটায় উঁকি মারতেই অ্যালিস দেখতে পেলে, ছাতার ওপর বসে রয়েছে বেশ গোব্দা একটা নীল রঙের শোঁয়াপোকা। হাত মুড়ে বসে আছে, খুব শান্ত হয়ে লম্বা নল মুখে দিয়ে গড়গড়া টানছে—অ্যালিসের দিকে বা অন্য কোনো কিছুরই দিকে তার গেরাহ্যিই নেই মোটে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শোঁয়াপোকার উপদেশ

শোঁয়াপোকা আর অ্যালিস, দুজনে দুজনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ; তার পর গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে ঘুম-জড়ান আল্‌সে গলায় শোঁয়াপোকা অ্যালিসকে বললে, "তুমি কে বট হে ?"

আলাপ শুরু করার পক্ষে কথাটা খুব মনের মতো নয়। অ্যালিস একটু আমতা আমতা করেই উত্তর করলে, "আমি—আমি নিজেই ঠিক জানি না, আজ্ঞে, যে, এখন আমি ঠিক কে। আজ সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছিলুম, তখন আমি কে ছিলুম, তা জানি, কিন্তু, তার পর থেকে কত বারই যে বদলালুম !"

শোঁয়াপোকা এবার কড়া সুরে বললে, "তার মানেটা কী ? বুঝিয়ে বল !"

অ্যালিস বললে, "আমার কথা আমি কী করে বোঝাই বলুন, আমি তো আর আমি নেই, জানেন !"

শোঁয়াপোকা বললে, "না, জানি না !"

খুব বিনয় করে অ্যালিস বললে, "এর চেয়ে বেশি গুছিয়ে বলার সাধ্যি নেই আমার, কী করব বলুন। প্রথম কথা হল, আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না। দিনের মধ্যে এত বার রকম রকম

মাপ হয়ে যাওয়াটা বড্ডো গোলমেলে ব্যাপার।"

শোঁয়াপোকা বললে, "না, নয়।"

অ্যালিস বললে, "এখনো আপনার কপালে সেরকম ব্যাপার ঘটে নি বলেই বলছেন, কিন্তু যখন একদিন গুটিপোকা হয়ে যাবেন—যেতেই হবে একদিন-না-একদিন—আর, তার পরে যখন আবার প্রজাপতি হয়ে যাবেন, তখন কেমন অদ্ভুত লাগবে, দেখবেন, লাগবে না ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "মোটেই না।"

অ্যালিস বললে, "হবে হয়তো, আপনার মন অন্যরকম। তবে আমি জানি, খুব অবাক লাগবে আমার।"

শোঁয়াপোকাটা বেশ অবজ্ঞার সুরেই বললে, "তোমার ? কেই-বা তুমি ?"

তার মানে আবার আলাপের সেই শুরুতে ফিরে এল ওরা। শোঁয়াপোকার ঐরকম কাটা-কাটা কথায় অ্যালিস ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছিল, এবারে রুখে উঠে বললে, "আমার মতে, আপনারই এবার বলার পালা, আপনি কে ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "কেন ?"

আবার সেই ধাঁধা-লাগান প্রশ্ন ; অ্যালিস লাগসই কোনো জবাব খুঁজে পেলে না, তার ওপর শোঁয়াপোকার মেজাজটাও বিশেষ সুবিধের নয় দেখে অ্যালিস চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

শোঁয়াপোকা পেছন থেকে হাঁক পাড়লে, "ফিরে এস, একটা দরকারি কথা আছে।"

একটা তবু আশার কথা শোনা গেল ! অ্যালিস ফিরে এল।

শোঁয়াপোকা বললে, "মাথা গরম করো না।"

কোনোরকমে রাগ চেপে রেখে অ্যালিস বললে, "ব্যাস, শুধু এই ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "না।"

অ্যালিস ভাবলে, 'কিছু তো করবার নেই, অপেক্ষা করেই দেখা যাক, বলা যায় না, হয়তো দরকারি কথা কিছু শোনাতে পারে।' শোঁয়াপোকাটা কয়েক মিনিট গড়গড়া টানলে আর ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়লে, তার পর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা আবার নামিয়ে রেখে বললে, "বেশ, তোমার তা হলে মনে হচ্ছে যে, তুমি বদলে গেছ, তাই তো ?"

অ্যালিস বললে "আজ্ঞে হ্যাঁ, দুঃখের কথা কী আর বলি, তাই তো গেছি বলে মনে হয় ! আগের মতো কিছুই আর মনে করে রাখতে পারছি না—আর, দশ মিনিটও এক মাপের থাকছি না আমি !"

শোঁয়াপোকা বললে "কী মনে রাখতে পারছ না ?"

অ্যালিস কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, "দেখুন না, বলতে গেলুম 'আহা, কেমন ব্যস্ত ছোটো মৌমাছি', কিন্তু কবিতার সব কথা অন্য-রকম হয়ে গেল !"

শোঁয়াপোকা বললে, "সেই 'বুড়োর কবিতা'টা বল তো দেখি।"

অ্যালিস হাতের ওপর হাত রেখে শুরু করলে—

ভাইপো বলে, "খুড়ো, তোমার বয়েস হল ঢের,
টাকটি ছাড়া পাকা চুলে সারা মাথাই ভরা,
ঠ্যাং উঠিয়ে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছ ফের,
ব্যাপারটা কী? এই বয়েসে উচিত এমন করা?"

বললে খুড়ো, "যখন আমার বয়েস ছিল কম,
ভয় পেয়েছি, হয়তো তাতে মগজ হবে মাটি।
এখন আমি উল্টোবাগে থাকি যে হরদম,
কারণ, আমার মগজই নেই, টের পেয়েছি খাঁটি

ভাইপো বলে, "বুড়োই তুমি, তা নয় দিলাম ছেড়ে,
কিন্তু, তুমি হাতির মতন ভীষণ রকম মোট্‌কা।
তা সত্ত্বেও পিছন ফিরে ডিগবাজি এক মেরে
ঘরের ভেতর ঢুকলে এসে! লাগছে মনে খট্‌কা।"

"ছোটো বেলায়,"—বললে খুড়ো চুলের গোছা ঝেঁকে,
—"দেহটাকে বানিয়েছিলাম নরম, তুলোর বস্তা,
এই যে মলম—দুপয়সা দাম—এইটা মেখে মেখে।
দু-এক শিশি কিনবি না-কি? দাম তো নেহাৎ সস্তা।"

"চোয়াল তোমার কম-জোর, খুড়ো, চিবোবার নেই ভরসা,
চর্বি ছাড়া তো আর সব কিছু শক্ত তোমার পক্ষে,
গোটা হাঁসটাকে সাবড়ালে তবু, হাড়, ঠোঁট সব ফর্সা !
কোন্ কায়দায় সামলালে, বল, অনুরোধ কর রক্ষে।"

"বিয়ের পরেই তোদের খুড়িমা হরদম দিত বাগ্‌ড়া,
ঝগড়া মেটাতে নালিশ করেছি, কোর্টে নিয়ে গেছি ঠেলে।
মামলা লড়তে,বকবক করে চোয়াল হয়েছে ডাগ্‌ড়া,
বাকি জীবনটা তারই দৌলতে কাটাচ্ছি অবহেলে।"

ভাইপো তখন বললে খুড়োয়, "বুড়ো বয়েসের ধারা—
নির্ঘাৎ জানি, এখন তোমার দুচোখে পড়েছে ছানি।
তবু অনায়াসে নাকের ডগায় বান মাছ রাখ খাড়া,
এমন কায়দা শিখলে কোথায়? দেখে যে অবাক মানি!"

"তিনবার তোর প্রশ্নের সাফ জবাব দিয়েছি আগে,
জ্যাঠামি-পাকামি অনেক হয়েছে, মুরুব্বিপনা রাখ্ তো!
তুই কি ভাবিস, দিনরাত ঐ ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভালো লাগে?
এক লাথি মেরে ফেলে দেব ঠেলে! ভালোয় ভালোয়
ভাগ্ তো!"

শোঁয়াপোকা বললে, "ঠিক হয় নি।"

অ্যালিস মিউ মিউ করে বললে, "সত্যিই সবটা ঠিক হল না, কয়েকটা কথা অন্যরকম হয়ে গেল।"

শোঁয়াপোকা সাফ জবাব দিলে, "আগাগোড়া সমস্তটাই ভুল।"

তার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

শোঁয়াপোকাই আবার শুরু করলে, "কী রকম মাপের হতে চাও তুমি ?"

অ্যালিস ঝটপট জবাব দেয়, "ঠিক কী রকম মাপ, সেটা নিয়ে আমার তত মাথাব্যথা নেই, তবে কি-না, খালি খালি মাপ বদল হলে বড়ো বিচ্ছিরি লাগে, জানেন ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "না, জানি না।"

অ্যালিস চুপ করে গেল। কথায় কথায় এতবার কেবল 'না' আর 'না' সে জীবনে কখনো শোনে নি। বুঝতে পারলে, মেজাজটা চড়ছে।

শোঁয়াপোকা বললে, "এখন যেমন আছ, তাতে তুমি খুশি তো ?"

অ্যালিস বললে, "আজ্ঞে, যদি রাগ না করেন তো বলি, আর সামান্য একটু বড়ো হতে চাই ; তিন ইঞ্চি মাপটা বড্ডো যাচ্ছেতাই।"

"অত্যন্ত সুন্দর, ভারি সুন্দর মাপ, খুব ভালো মাপ," বেশ রেগেমেগে এই কথা বলে শোঁয়াপোকা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। (দেখা গেল, তার মাপ একেবারে ঠিক ঠিক তিন ইঞ্চি।)

অ্যালিস বেচারি করুণ গলায় বললে, "কিন্তু তিন ইঞ্চি মাপে আমার অভ্যেস নেই যে!" মনে মনে ভাবলে, 'কথায় কথায় এরা বড়ো চোটে যায়।'

"ক্রমশ অভ্যেস হয়ে যাবে," এই কথা বলে শোঁয়াপোকা আবার গড়গড়ার নলটা মুখে গুঁজে নিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

অ্যালিস দেখলে, ও যতক্ষণ না আবার কথা বলে, ততক্ষণ চুপ করে থাকাই ভালো। দু-এক মিনিট পরে শোঁয়াপোকা গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে রাখলে, কয়েক বার হাই তুললে, তার পর আড়ামোড়া ভাঙলে। তার পর ব্যাঙের ছাতা থেকে নীচে নেমে সুড়্‌সুড়্ করে ঘাসের মধ্যে দিয়ে গুটিগুটি যেতে যেতে বললে, "একটা দিকে লম্বা হবে, আর-একটা দিকে ছোটো হবে।"

অ্যালিস ভাবলে, 'কিসের একটা দিক, কিসেরই-বা আর-একটা দিক ?'

অ্যালিসের মনের কথা শুনতে পেয়েই যেন শোঁয়াপোকাটা বললে, "ঐ ব্যাঙের ছাতার।" আর, তার পরেই সে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

অ্যালিস সেই ব্যাঙের ছাতাটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবে বার করতে

চেষ্টা করতে লাগল, ছাতাটার এদিকই-বা কোন্‌টা আর ওদিকই-বা কোন্‌টা। ছাতাটা একেবারে ছাতার মতোই গোল, কাজেই বঝতে পারলে, বড়োই মুস্কিলের ব্যাপার। যাই হোক, অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে ছাতাটাকে বেড় দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিলে যদ্দূর যায়, তার পর দুহাতে দুটো টুক্‌রো ভেঙে নিলে।

এখন চিন্তা হল, কোন্ দিকটায় কী হবে। তার পর ডান হাতের টুকরোয় একটা কামড় দিয়ে দেখতে লাগল, কী হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে তার থুৎনিটা সজোরে ঠকাস করে ঠুকে গেল কিসের সঙ্গে—সেটা তার নিজেরই পায়ের পাতা!

এইরকম হঠাৎ এতখানি বদল হতে দেখে অ্যালিসের খুব ভয় হল, তবে বুঝতে পারলে যে, সময় নষ্ট করা মোটেই চলবে না, হু হু করে ছোটো হয়ে যাচ্ছে; কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের টুক্‌রোটাতে চট করে একটা কামড় দিতে গেল। থুৎনিটা এমন চেপে বসে আছে পায়ের পাতার ওপর যে, ভালো করে হাঁ করতেও পারা যাচ্ছে না, তবু যা হোক করে সামান্য একটুখানি মুখে পুরে দিলে।

"যাক্ বাবা, বাঁচা গেল! মাথাটা শেষ অবধি আলগা হয়েছে।" খুব খুশি হয়েই বললে অ্যালিস, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল—তার কাঁধ দুটোকে মোটেই দেখা যাচ্ছে না! নীচের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ছে কেবল বিরাট লম্বা একখানা গলা। আরো নীচে খালি সবুজ আর সবুজ, আর, তার মধ্যে থেকে সেই বিরাট লম্বা গলাটা ডাঁটার মতো ওপর দিকে উঠে এসেছে!

অ্যালিস মনে মনে বললে, 'ঐ-সব সবুজ সবুজ জিনিসগুলো কী হতে পারে? আর আমার কাঁধদুটোই-বা গেল কোথায়? আর, ওরে আমার হাত রে, তোদের যে দেখতেই পাচ্ছি না।' বলতে বলতে সে হাত দুটো নাড়িয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি, শুধু অনেক-অনেক নীচের সেই সবুজ পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

হাত যখন ওপরে তোলা গেল না, অ্যালিস তখন মাথা নিচু করে হাতের নাগাল পাবার চেষ্টা করলে; দেখে স্বস্তি পেলে যে, গলাটা তার যেদিকে ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে ঘোরান-ফেরান যাচ্ছে, ঠিক সাপের মতো। নানানভাবে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে গলাটাকে যখন সে প্রায় নীচের বড়ো-বড়ো গাছের ওপরকার সবুজ পাতার কাছাকাছি

এনে ফেলেছে, পাতার ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে নীচে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনি হুস করে একটা জোর আওয়াজে চমকে গিয়ে ঝট করে মাথাটাকে তুলে নিতে হল। একটা বেশ বড়োসড়ো পায়রা উড়তে উড়তে তার মুখের ওপর এসে পড়ে ডানা দিয়ে ঠাস-ঠাস করে তার মুখে ঝাপটা মারছে।

পায়রাটা চীৎকার করলে, "সাপ, সাপ!"

অ্যালিস রেগে-মেগে বললে, "মোটেই আমি সাপ নই। জ্বালিও না বলছি আমায়!"

পায়রা বললে, "আবার বলছি, তুমি সাপ!" এবারে অবশ্য তার গলা একটু নরম। তার পর প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "কত-রকমই তো উপায় ঠাওরালাম, কিন্তু কিছুই হল না, ওদের নিয়ে কিছুতেই আর পারা গেল না!"

অ্যালিস বললে, "তোমার কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

অ্যালিসের কথায় কান না দিয়ে পায়রা বলেই চললে, "গাছের শেকড়ে চেষ্টা করে দেখেছি, নদীর পাড়ে দেখেছি, ঝোপে চেষ্টা করেছি—কিন্তু ঐ-সব বদমাস সাপ! ওদের মন পাওয়া ভার!"

আরো বেশি করে ধাঁধায় পড়ল অ্যালিস, কিন্তু ভাবলে, পায়রার কথা শেষ হবার আগে কথা বলে কোনো লাভ হবে না।

পায়রা বললে, "আহা, ডিম পাড়ায় যেন কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, অথচ, রাত-দিন আমায় সাপের জন্যে তটস্থ হয়ে থাকতে হবে! এই তিনটে হপ্তা তো দু চোখের পাতাই এক করতে পারি নি!"

অ্যালিস এবার যেন ব্যাপারটা খানিক আঁচ করতে পেরেছে। বললে, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমার দুঃখু হচ্ছে।"

পায়রা গলা চড়িয়ে বলে যেতে লাগল, "আমি কি-না এদিকে বনের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু গাছে বাসা বেঁধেছি, আমি কি-না ভাবছি যে, শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে রেহাই পেলাম, আমি কি-না ভাবছি যে, এঁকে-বেঁকে আকাশ থেকে ওরা যদি এসে না পড়ে, তা হলে আমার আর কোনো ভয় নেই—আর ঠিক সেই সময়ে কি-না—! ওফ্! সাপ!"

"কিন্তু, আমি সত্যিই সাপ নই, বলছি শুনুন! আমি হচ্ছি, আমি হচ্ছি—"

"তা হলে তুমি কী? কী তুমি? একটা কিছু বানিয়ে বলবার চেষ্টা করছ, বেশ দেখতে পাচ্ছি!"

"আমি—আমি একটা ছোট্টো মেয়ে।" অ্যালিসের নিজের গলাতেই সন্দেহের সুর, কেননা, একদিনে এত বার সে বদলেছে!

গলায় খুব একটা বিদ্রূপ মিশিয়ে পায়রা বললে "গাল-গল্প আমার অবশ্য ভালোই লাগে! এই বয়েসে অনেক ছোটো-ছোটো মেয়েই তো দেখলুম, অমন একটা সিড়িঙ্গে গলা তো কারো দেখি নি! না, না! তুমি সাপ, নিশ্চয়ই সাপ, এতে কোনো ভুল নেই। এবার হয়তো বলেই বসবে যে, জীবনে কখনো ডিম-ই খাও নি!"

অ্যালিস বড়ো সত্যবাদী, তাই বলে ফেললে "খাব না কেন নিশ্চয়ই খেয়েছি; তবে ছোটো-ছোটো মেয়েরা তো ডিম খায়-ই, সাপেদের চেয়ে কিছু কমও খায় না।"

পায়রা বললে, "বিশ্বাস করি না; তবে, ছোটো মেয়েরা ডিম খায়, এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি বলব, তারাও নিশ্চয়ই এক ধরনের সাপ, তা ছাড়া আর কী।"

অ্যালিসের কাছে কথাটা এমন নতুন শোনাল যে, খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না, আর পায়রাটা সেই ফাঁকে বলে চলল, "এটা তো জানি যে, তুমি ডিমের তালে আছ, কাজেই তুমি ছোট্টো খুকিই হও আর সাপ-ই হও, তাতে আমার কী আসে-যায়?"

অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "তোমার না গেলেও, আমার অনেক আসে-যায়। তবে ব্যাপারটা হল, আমি মোটেই ডিম খুঁজছি না। আর খুঁজলেও, তোমার ডিম নিতে আমার বয়ে গেছে, কাঁচা ডিম আমার একদম ভালো লাগে না।"

"বেশ তো, তা হলে কেটে পড়, বলেই পায়রাটা আবার তার বাসায় গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। আর অ্যালিস যতটা পারলে গাছপালার মধ্যে হেঁট হতে চেষ্টা করলে। তার গলাটা বার বার গাছের ডালপালায় জড়িয়ে যেতে লাগল, থেকে থেকে ছাড়িয়ে নিতে হল। কিছুক্ষণ বাদে তার মনে পড়ল যে, তার দুহাতে তখনো সেই ব্যাঙের ছাতার টুকরো দুটো রয়েছে। খুব সাবধানে সে একবার ডান হাতের, আর তার পর বাঁ হাতের টুকরোতে কামড় দিতে লাগল, একবার লম্বা, আর একবার বেঁটে হয়ে যেতে লাগল, আর,

এই করতে করতে শেষ অবধি যাহোক করে তার আসল মাপে এসে ঠেকল।

সারাক্ষণই তো বেচারিকে হরেকরকম মাপের হতে হয়েছে, নিজের ঠিক ঠিক মাপের ধারে-কাছেও আসতে পারে নি, তাই গোড়ায় গোড়ায় একটু কেমন-কেমন লাগল ; কিন্তু খানিক পরেই সব ঠিক হয়ে গেল, আর আবার সেই আগেকার মতো আপন মনে বকর বকর করতে শুরু করে দিলে, "যাক, আমার আদ্দেকটা কাজ তো হাসিল হল! উঃ, খালি খালি বদলাতে বদলাতে মাথা-টাথা গুলিয়ে যায় একেবারে! এই একরকম আছি, এক মিনিট বাদেই কী হব তার ঠিক নেই! যাই হোক, নিজের আসল মাপটা ফিরে পাওয়া গেছে, এখন সেই বাগানটাতে যাওয়া যায় কী করে, সেইটাই ভাবতে হবে।" এই-সব ভাবতে ভাবতে অ্যালিস কখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে, তার মাঝখানে ছোট্টো একটা বাড়ি, ইঞ্চি চারেক হবে। অ্যালিস ভাবলে, 'এ-বাড়িতে কে থাকে কে জানে, তবে এই চেহারায় ওখানে যাওয়া চলবে না ; দেখলে ভয় পেয়ে একেবারে মুচ্ছো-টুচ্ছো, যাবে হয়তো!' এই ভেবে অ্যালিস তার ডান হাতের সেই ব্যাঙের ছাতার টুক্‌রো থেকে একটু একটু করে খেতে লাগল ; তার পর যখন ছোটো হতে হতে ন ইঞ্চির মতো দাঁড়াল, তখন এগিয়ে গেল বাড়িটার কাছাকাছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শুয়োরছানা আর গোলমরিচ

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অ্যালিস ভাবছে এবার কী করবে এমন সময়ে উর্দিপরা একটা পেয়াদা বোঁ করে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। (নেহাৎ উর্দি পরা আছে, তাই অ্যালিস ওকে পেয়াদা বলে ধরে নিলে; নইলে, মুখ দেখে তাকে মাছ বলাই ঠিক।) তার পর আঙুলের গাঁট দিয়ে জোরে জোরে দরজায় টোকা মারতে লাগল। আর একটা পেয়াদা এসে দরজা খুলে দিলে, তার গায়েও উর্দি; গাল-ফুলো বড়ো-বড়ো ড্যাবড্যাবে চোখ। অ্যালিস লক্ষ্য করে দেখলে যে, দুজনেরই মাথার চুল পাউডার লাগিয়ে দুরস্ত করা, কুঁকড়ে কুঁকড়ে সারা মাথা ঢেকে রেখেছে। ব্যাপারটা কী, জানবার জন্যে অ্যালিসের খুব আগ্রহ হল, তাই জঙ্গল থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে এসে কান পাতলে।

মাছ-পেয়াদাই প্রথমে তার বগলের নীচে থেকে একটা বিরাট খাম টেনে বার করল—খামটা প্রায় তার নিজের মাপেরই হবে—তার পর অন্য পেয়াদার হাতে দিয়ে খুব গুরুগম্ভীর গলায় বললে, "জমিদারগিন্নীর চিঠি। ক্রোকে খেলার জন্যে মহারানীর নিমন্ত্রণ পত্র।" ব্যাঙ-পেয়াদাও ঐ একই ভঙ্গিতে সেই কথাই বললে-কেবল একটু ঘুরিয়ে—, "মহারানীর নিমন্ত্রণ পত্র। ক্রোকে খেলার জন্যে জমিদারগিন্নীর চিঠি।"

তার পর, দুজনেই কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত সামনে ঝুঁকিয়ে সহবৎ দেখাতে গেল, তাতে ওদের দুজনের চুলে চুলে গেল জড়িয়ে। অ্যালিস এতো জোরে হেসে ফেললে যে, শোনা যাবার ভয়ে দৌড়ে আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পর সামলে-সুমলে নিয়ে আবার যখন বেরিয়ে এল, তখন দেখলে, মাছ-পেয়াদা চলে গেছে,

আর অন্য পেয়াদাটা দরজার কাছে মাটিতে বসে পড়ে হাঁদার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অ্যালিস খুব আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, তার পর ঠুক্ ঠুক্ করে তাতে টোকা মারলে।

পেয়াদা বললে, "টোকা-ফোকা মেরে কিস্যু লাভ হবে না। তার

দুটো কারণ : প্রথম হচ্ছে, আমি তোমারই মতো দরজার বাইরের দিকেই বসে আছি ; আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ভেতরে সবাই এমন সোরগোল লাগিয়েছে যে, তোমার ঐ ঠুক্ ঠুক্ শব্দ কেউ শুনতেও পাবে না।” বাড়ির ভেতরে তখন সত্যিই এমন গোলমাল চলছে যে, কহতব্য নয়—অনবরত একটা হাঁউমাউ চীৎকার, হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হাঁচির শব্দ, আর মাঝে মাঝে ঝন্‌ঝন্ ঠাঁইঠাঁই করে বাসনপত্তর ভাঙার আওয়াজ।

অ্যালিস বললে, “তা হলে কী করে ভেতরে যাওয়া যায়, বলে দিন না একটু দয়া করে!”

পেয়াদা সে কথায় কান না-দিয়ে নিজের কথার জের টেনে বলে চলল, “দরজাটা যদি তোমার আর আমার মাঝখানে থাকত, তা হলেও নাহয় কথা ছিল। যেমন ধরো, তুমি যদি ভেতর দিকে থাকতে, আর দরজা ধাক্কাতে, তা হলে আমি তোমায় বাইরে আসবার জন্যে দরজা খুলে দিতে পারতুম, বুঝলে?” কথা বলার সময়ে পেয়াদাটা কিন্তু সারাক্ষণ আকাশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ; অ্যালিসের মতে সেটা খুবই অসভ্যতা। তার পর ভেবে দেখলে, ‘তবে, বেচারা নাচার, চোখ দুটো ওর বলতে গেলে একেবারে মাথার ওপরে বসান। তা নাহয় হল, কিন্তু আমার কথার জবাবটা তো দিতে পারে।’ এবার জোরেই বললে, “ভেতরে যাব কী করে?”

পেয়াদা বললে, “আমি এখানেই বসে থাকব—আজও থাকব, কালও থাকব—”

ঠিক সেই সময়ে দরজাটা খুলে গেল, আর একটা বড়ো প্লেট সাঁই-সাঁই করে পেয়াদার মুণ্ডু লক্ষ্য করে উড়ে এল ; তার নাক ঘেঁষড়ে দিয়ে পেছন দিকের একটা গাছের গায়ে লেগে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ল।

পেয়াদা কিন্তু তখনো সেই একইভাবে বলে চলেছে, “—কিম্বা হয়তো পরশুও থাকব”—যেন কিছুই হয় নি।

এবার আরো চীৎকার করে অ্যালিস বললে, “ভেতরে যাব কী করে, বল না।”

পেয়াদা বললে, “প্রথম কথা হল, বাড়ির ভেতর কি নেহাৎ যেতেই হবে?”

প্রশ্নটা তুলেছে ঠিকই, তবে কি-না অ্যালিসের কানে কথাটা ভালো

লাগল না। বিড়্ বিড়্ করে বললে, "কী বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার, যে যেখানে আছে, সবাই কেবল তর্ক করে। মাথা খারাপ হবার জোগাড় একেবারে।"

পেয়াদা বোধ হয় দেখলে যে, তার বক্তব্যগুলো একটু বদল-সদল ক'রে আবার একবার ঝালিয়ে নেবার এমন সুযোগ আর পাবে না, তাই বলতে লাগল, "আমি এখানেই বসে থাকব, কেবলই বসে থাকব, দিনের পর দিন বসে থাকব।"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু, আমি এখন কী করি?"

পেয়াদা বললে, "যা তোমার খুশি।" তারপর আপন মনে শিস দিতে শুরু করলে।

অতিষ্ঠ হয়ে অ্যালিস বললে, "ওফ্! এর সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি। একেবারে নিরেট হাঁদাগঙ্গারাম।" বলেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই যেখানে এল, সেটা একটা বিরাট রান্নাঘর, চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। ঘরের মাঝখানে তে-পায়া একটা টুলের ওপর বসে রয়েছেন জমিদারগিন্নী, কোলে তাঁর একটি বাচ্চা। একটা রাঁধুনী উনুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিরাট একটা হাণ্ডার মধ্যে হাতা দিয়ে ঘোঁটাচ্ছে, মনে হল সূপ রাঁধছে।

হাঁচতে হাঁচতে অ্যালিস বললে, "উঃ, সূপটাতে গাদাগুচ্ছের মরিচ দিয়ে মরেছে দেখছি!"

ঘরের বাতাসেও কড়া মরিচের ঝাঁঝ। জমিদারগিন্নী নিজেও মাঝে মধ্যেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করছেন। আর বাচ্চাটার তো কথাই নেই, হয় হাঁচছে, নাহয় ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আকাশ-ফাটান চীৎকার করছে, মোট কথা একবারও থামছে না। ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী দেখা গেল হাঁচছে না মোটেই—একজন সেই রাঁধুনী, আর অন্যটা হল একটা হুম্‌দো বেড়াল। বেড়ালটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাসি হাসি মুখ করে হেঁসেলের ধারে গরমে বেশ আরাম করে ব'সে আছে।

অ্যালিস ঠিক বুঝতে পারল না আগ বাড়িয়ে কথা বলা উচিত কি-না, তাই খুব বিনয় করে নরম গলায় বললে, "কিছু মনে করবেন না, আচ্ছা, আপনার বেড়ালটা অমন মুচকি হাসছে কেন?"

জমিদারগিন্নী বলে উঠলেন, "ওটা কাবলী বেড়াল, তাই। শুয়োর কোথাকার!"

শেষের কথা দুটো এতো আচমকা চটে গিয়ে বললেন যে, অ্যালিস তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল ; তবে তক্ষুনি বুঝতে পারলে যে, কথাটা তাকে বলা হয় নি। বলা হয়েছে কোলের বাচ্চাটাকে। তখন সে সামলে নিয়ে আবার বললে, "কাবলী বেড়াল যে সব সময়ে হাসে, তা তো জানতুম না। তা ছাড়া, বেড়াল যে আবার মুচকি হাসতে পারে তাও তো শুনি নি কখনো।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "সব বেড়ালই পারে। আর, বেশিরভাগ বেড়াল করেও তাই।"

আলাপ করবার সুযোগ পেয়ে অ্যালিসের খুব আনন্দ লাগছে তখন। খুব বিনয় করে বললে, "আমার জানা-শোনা কোনো বেড়ালকে কখনো কিন্তু হাসতে দেখি নি।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "তুমি আর কতোটুকুই-বা জানো। বিশেষ কিছুই যে জানো না, এতে কোনো সন্দেহই নেই।"

কথাটা অ্যালিসের মোটেই ভালো লাগে নি, তাই ভাবলে, অন্য

কোনো ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা চালানোই ভালো। কী কথা পাড়া যায় ভাবছে, এমন সময়ে রাঁধুনী উনুন থেকে সুপের হাণ্ডাটা নামিয়ে রাখলে, আর, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে যা পেলে সটাসট্ ছুঁড়ে মারতে লাগল জমিদারগিন্নী আর তাঁর কোলের বাচ্চাটাকে টিপ করে। প্রথমে এল উনুন খোঁচাবার শিক ; তার পর এক ঝাঁক সস্প্যান, প্লেট আর ডিশ। জমিদারগিন্নীর কোনো হেলদোল নেই, তাঁর গায়ে এসে লাগল কয়েকটা, তাতেও তিনি নির্বিকার। আর বাচ্চাটা গোড়া থেকেই এমন চিল-চীৎকার করছে যে, তার চোট লেগেছে কি-না, বোঝবার কোনো উপায় নেই।

ভয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে অ্যালিস বলে উঠল, "আহা, আহা, কী করছেন কী, দয়া করে দেখুন তো, কী কাণ্ডটা করছেন আপনি। ঐরে! নাকটা গেল বোধ হয় বেচারার!" একটা ঢাউস সস্প্যান সাঁ করে বাচ্চাটার নাক ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

জমিদারগিন্নী হেঁড়ে গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, "যে যার নিজের চরকায় তেল দিলে পৃথিবীটা আরো তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারত।"

"তাতে কিন্তু খুব একটা সুবিধে হত না," এই তালে নিজের বিদ্যে জাহির করার মওকা পেয়ে অ্যালিসের খুব ভালো লাগছে। "একবার ভেবে দেখুন তো দিন আর রাত্তিরের দশাটা তখন কী দাঁড়াবে! ধরুন না, পৃথিবীটা চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে তার নিজের অক্ষের ওপর খাড়া হয়ে—"

জমিদারগিন্নী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "খাঁড়ার কথাই যখন উঠল, তা হলে বলি, এই খুকিটাকে কোতল কর!"

অ্যালিস দুরু দুরু বুকে রাঁধুনীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, হুকুমের মানেটা সে ধরতে পেরেছে কি-না ; কিন্তু দেখা গেল তিনি এক মনে হাতা দিয়ে সুপ ঘুঁটছেন, কথা কানেই নেন নি। তখন সে আবার শুরু করলে, "তা হলে হচ্ছে গিয়ে আপনার, চব্বিশ ঘণ্টা, তাই তো? সেইরকমই তো মনে হচ্ছে ; না-কি বারো ঘণ্টা? আমার—"

জমিদারগিন্নী বললেন, "আঃ, হাড় জ্বালিয়ে ছাড়লে, ও-সব অঙ্ক-ফঙ্ক আমার একদম ধাতে পোষায় না!" এই বলে তিনি আবার কোলের বাচ্চাটাকে আদর করতে লাগলেন, ঘুমপাড়ানী গানের মতো

কী একটা গাইতে শুরু করলেন, আর গানের এক-একটা কলির শেষে বাচ্চাটাকে ভীষণ জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন :

'খোকার সঙ্গে কইবে কথা দাঁত খিঁচিয়ে, ধমক দিয়ে ;
হাঁচলে পরেই রাম-পেঁদিয়ে ভূত ভাগাবে।
আর কিছু নয়, হাঁচছে ব্যাটা হাড় জ্বালানোর ফন্দি নিয়ে,
কারণ, জানে তাতেই মেজাজ বিগড়ে যাবে।'

এবার সবাই মিলে গাইলে (রাঁধুনী আর বাচ্চাটাও বাদ গেল না) :

'ওউ ! ওউ ! ওউ !'

গানের পরেরটুকু গাইবার সময়ে জমিদারগিন্নী এত জোরে জোরে কোলের বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফতে লাগলেন যে, তার হাঁউমাউ চীৎকারে গানের কথাগুলো অ্যালিস খুব ভালো করে শুনতে পেল না :

'খোকায় আমার বেদম ধাঁতাই, দাবড়ানি দিই বিষম রাগে,
হাঁচলে পরেই দমদমিয়ে পেটাই জোরে ;
কারণ, জানি এমনিতে তার মরিচগুঁড়ো ভালোই লাগে ;
ইচ্ছে করেই মিচ্‌কে ব্যাটা অমন করে।'

সবাই : 'ওউ ! ওউ ! ওউ !'

জমিদারগিন্নী বললেন, "এই নাও, ইচ্ছে হয় তো খানিকক্ষণ কোলে নিতে পার।" বলেই বাচ্চাটাকে অ্যালিসের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তার পর, "আমি যাই, সাজগোজ করিগে, মহারানীর সঙ্গে আবার ক্রোকে খেলতে যেতে হবে—"বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাঁধুনীটা সঙ্গে সঙ্গে একটা ফ্রাই-প্যান ছুঁড়ে মারলে তাঁকে তাগ করে, তবে একটুর জন্যে ফস্কে গেল।

অনেক কায়দা করে তবে অ্যালিস বাচ্চাটাকে বাগিয়ে ধরলে, কারণ তার দেহের গড়নটা যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের ; তার ওপর কেবলই এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে। 'যেন তারামাছের মতো,' অ্যালিস মনে মনে বললে। অ্যালিসের কোলে এসে বাচ্চাটা ইঞ্জিনের মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল, আর, এক-একবার কুঁকড়ে দু-ভাঁজ হয়ে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে সোজা টান্ টান্ হয়ে যেতে লাগল। এই-সমস্তর জন্যে প্রথমে মিনিট দুয়েক তাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে গেল অ্যালিস।

তারপর, যখন তাকে বেশ বাগিয়ে কোলে নেওয়া গেল (বাচ্চার দেহটাকে প্রায় কুণ্ডুলির মতো করে পাকিয়ে তার ডান কান আর বাঁ পাটাকে এক সঙ্গে চেপে ধরতে হল, যাতে আবার না ছিট্‌কে সোজা হয়ে যায়), তখন অ্যালিস সোজা বাইরের হাওয়ায় চলে এল। ভাবলে, 'সঙ্গে নিয়ে না-এলে, বাচ্চাটাকে ওরা দু-এক দিনের ভেতরে মেরেই ফেলত দেখছি!' বেচারাকে ওখানে ফেলে রেখে আসা মানে তো খুন করারই সামিল হত।' শেষ কথাগুলো একটু চেঁচিয়েই বলে ফেললে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল (ইতিমধ্যে তার হাঁচি থেমে গেছে)। অ্যালিস বললে, "চুপ কর, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কেউ কথা বলে না।"

বাচ্চাটা আবার ঘোঁৎ করে শব্দ করতেই অ্যালিস ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে। হুঁ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ওর নাকটা বেশ খানিকটা ওপর দিকে ওল্টানো মতন—নাকের চেয়ে বেঁড়ে গোছের শুঁড়ের সঙ্গেই তার মিল বেশি; তা ছাড়া বাচ্চা ছেলে হলেও, চোখদুটো যেন বড্ডো কুৎকুতে হয়ে গেছে; সব জড়িয়ে তার চেহারাটা মোটেই পছন্দ হল না অ্যালিসের। ভাবলে, হয়তো বেচারি ফুঁপিয়ে কেঁদেছে বলেই এমন হয়েছে। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, জল আছে কি-না।

না, জলটল কিচ্ছু নেই। অ্যালিস বেশ ভেবে-চিন্তেই বললে, "দেখ বাছা, যদি সত্যিই শুয়োর বনে যাও, তা হলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই, বলে দিচ্ছি!" ক্ষুদে বাচ্চাটা আবার ফুঁপিয়ে উঠল (কিম্বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে হয়তো, বলা মুস্কিল,) আর অ্যালিস কোনো কথা না-বলে হাঁটতে লাগল।

অ্যালিস সবে ভাবছে, 'কিন্তু, বাড়ি ফিরে যাবার পর একে নিয়ে করবটা কী?' আর, ঠিক সেই সময়ে বাচ্চাটা এমন জোরে একটা ঘোঁৎ শব্দ করে উঠল যে, বেশ একটু ভয় পেয়ে অ্যালিস আবার তার মুখের দিকে তাকাতেই দেখলে—নাঃ, এবার আর কোনোও ভুল নেই, বাচ্চাটার আগাপাশতলা এক্কেবারে শুয়োর। তখন ভেবে দেখলে, আর এটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ানর কোনো মানেই হয় না।

আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়ে দিতেই শুয়োরছানাটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে টুক্‌টুক্ করে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল, অ্যালিসও হাঁফ ছেড়ে

বাঁচল। মনে মনে বললে, 'মানুষের বাচ্চা হিসেবে বড়ো হলে কী বিদিকিচ্ছিরি দেখতেই না হত ; তবে বাচ্চা শুয়োর হিসেবে দেখতে বরং ভালোই বলা যায়।' তার পর জানাশোনা অন্য-সব ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবতে লাগল, শুয়োর হিসেবে যারা মোটেই বেমানান হতো না। 'ওদের বদ্‌লে দেবার আসল উপায়টা যদি জানা থাকত কারুর—'। অ্যালিস ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে কয়েক হাত তফাতে একটা গাছের ডালে সেই কাবলী বেড়ালটাকে বসে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল।

অ্যালিসকে দেখে বেড়ালটা কেবল হাসিহাসি মুখ করলে। দেখে বেশ শান্তশিষ্টই মনে হয়, তবে যেমন বড়ো-বড়ো থাবা, তেমনি এক গাদা দাঁত, কাজেই অ্যালিস ভাবলে একটু সমীহ করে চলাই ভালো।

অ্যালিস ডাকলে, "কাব্‌লী পুষি!" একটু ভয়ে ভয়েই ডাকলে, কারণ, জানে না তো, এ-নাম ওর পছন্দ হবে কি-না। দেখা গেল বেড়ালের মুখের হাসিটা আরো বড়ো হল। অ্যালিস ভাবলে, 'যাক বাবা, এখনো তো চটে নি দেখছি।' আবার বললে, "এখান থেকে কোন্‌ দিকে যাব, দয়া করে একটু বলে দেবে?"

বেড়াল বললে, "কোথায় যেতে চাও, সেটা তারই ওপর নির্ভর করছে।"

অ্যালিস বললে, "ঠিক কোথায় যাব, তা নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই—"

বেড়াল বললে, "তা হলে কোন্‌ দিকে যাবে না-যাবে তাতেই বা কী আসে-যায়।"

অ্যালিস কথাটাকে মানিয়ে নেবার জন্যে বললে, "—না, মানে, কোথাও একটা পৌঁছতে হবে তো?"

বেড়াল বললে, "বেশ খানিকটা হাঁটলে কোথাও না-কোথাও পৌঁছবে তো বটেই।"

অ্যালিস ভেবে দেখলে, কথাটা ঠিকই বটে, কাজেই ঘুরিয়ে বললে, "ধারে-কাছে যারা থাকে, তারা কীরকম লোক?"

বেড়াল ডান থাবাটা ঘুরিয়ে বললে, "ঐ দিকে থাকে একটা টুপিওলা," তার পর বাঁ থাবাটা ঘুরিয়ে বললে, "আর ঐ দিকে থাকে চৈতী খরগোস। যে কোনো একজনের কাছে যেতে পার ; দুজনেই পাগল।"

অ্যালিস বললে, "আমি কিন্তু পাগলের পাল্লায় পড়তে চাই না বাপু।"

বেড়াল বললে, "উপায় নেই, এখানে আমরা সবাই পাগল। আমি পাগল। তুমি পাগল।"
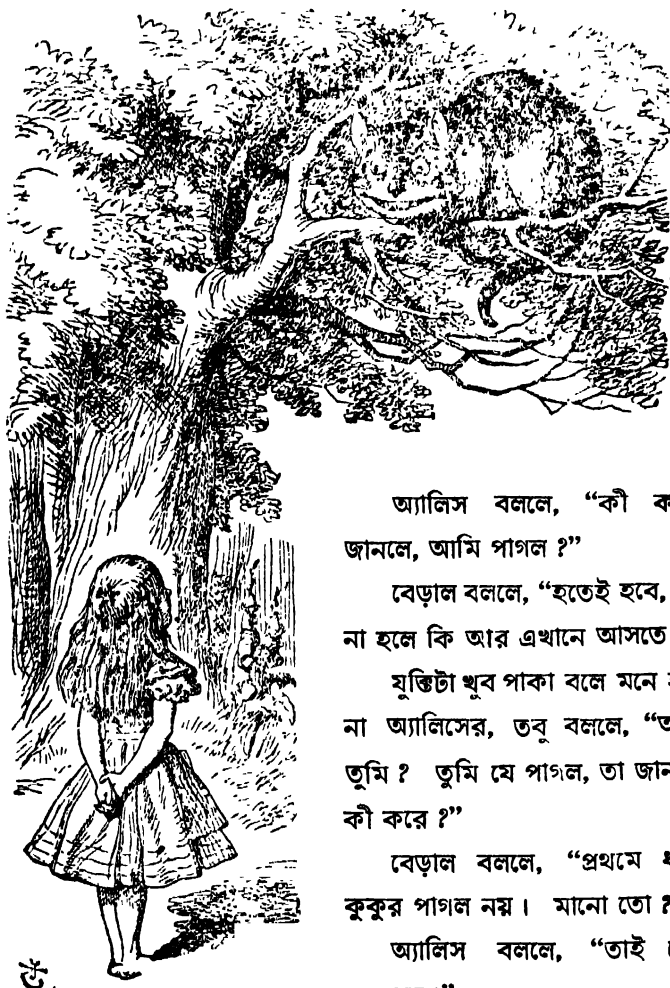
অ্যালিস বললে, "কী করে জানলে, আমি পাগল?"

বেড়াল বললে, "হতেই হবে, তা না হলে কি আর এখানে আসতে?"

যুক্তিটা খুব পাকা বলে মনে হল না অ্যালিসের, তবু বললে, "আর তুমি? তুমি যে পাগল, তা জানলে কী করে?"

বেড়াল বললে, "প্রথমে ধর, কুকুর পাগল নয়। মানো তো?"

অ্যালিস বললে, "তাই তো মনে হয়।"

বেড়াল বলতে লাগল, "তাই যদি হয়, তা হলে দেখ, কুকুর যখন রেগে যায়, তখন গোঁ গোঁ করে, আর ফুর্তি হলে ল্যাজ নাড়ে; অথচ, আমি ফুর্তি হলে গোঁ গোঁ করি, আর রেগে গেলে ল্যাজ নাড়ি। কাজেই, আমি পাগল।"

অ্যালিস বললে, "ওকে গোঁ গোঁ বলে না, গর্‌গর্‌ বলে।"

বেড়াল বললে, "তা সে তোমার যা ইচ্ছে বলতে পার। আজ রানীর সঙ্গে ক্রোকে খেলতে যাচ্ছ না-কি?"

অ্যালিস বললে, "খেলতে পেলে তো খুবই আনন্দ হত, কিন্তু আমার তো নেমন্তন্নই হয় নি।"

"আমার সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে," বলে বেড়ালটা হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অদ্ভুত কাণ্ড দেখে দেখে অ্যালিসের এমন সয়ে গেছে যে, এতে সে মোটেই অবাক হল না। বেড়ালটা যেখানে বসেছিল, সেই জায়গাটার দিকে তখনো তাকিয়ে রয়েছে, এমন সময়ে আবার বেড়ালটাকে দেখা গেল।

বললে, "হ্যাঁ, ভালো কথা, বাচ্চাটার কী হল? জিগেস করতে ভুলেই যাচ্ছিলুম আর-একটু হলে।"

বেড়ালটার অদৃশ্য হওয়া বা ফিরে আসাটা যেন কিছুই অদ্ভুত ব্যাপার নয়, এইভাবে অ্যালিস জবাব দিলে, "বাচ্চাটা শুয়োরছানা হয়ে গেল।"

"জানতুম, ওটা শুয়োরই হয়ে যাবে," বলে বেড়ালটা আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অ্যালিস ভাবলে বেড়ালটা আবার হয়তো দেখা দেবে, তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে, কিন্তু মিনিট দুয়েক পরেও যখন তাকে দেখা গেল না, তখন, যেদিকে চৈতী খরগোস থাকে, সেই দিকে পা বাড়ালে। আপন মনে বলতে লাগল, 'টুপিওলা তো অনেক দেখেছি, চৈতী খরগোসটাই বেশ মজার হবে মনে হচ্ছে। আর, এটা তো মে মাস, এখনো বোশেখ চলছে, কাজেই একেবারে খ্যাপা উন্মাদ হবে না নিশ্চয়ই—অন্তত চৈত্র মাসের চেয়ে কম তো হবেই।' বলতে বলতে ওপর দিকে চোখ পড়তেই আবার দেখা গেল বেড়ালটা গাছের ডালে এসে বসে আছে।

বেড়াল বললে, "তখন কী বললে যেন—'শুয়োর' না 'দুয়োর'?"

অ্যালিস বললে, "বললুম শুয়োর। আর, তুমি বাপু হঠাৎ হঠাৎ অমন করে উবে যেও না আর দেখা দিও না, মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।"

"বেশ, ভালো কথা", এই বলে বেড়ালটা এবার অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে অদৃশ্য হতে লাগল; ল্যাজের ডগা থেকে শুরু

করলে, শেষ করলে হাসি দিয়ে। সমস্ত কিছু উবে যাওয়ার পরেও, কেবল হাসিটুকু বেশ কিছুক্ষণ শূন্যে ভেসে রইল।

অ্যালিস ভাবলে, 'বেশ তো! হাসি-ছাড়া বেড়াল তো কতো দেখেছি, কিন্তু বেড়াল-ছাড়া হাসি! এমন তাজ্জব ব্যাপার জন্মে দেখি নি, বাবা!'

বেশি দূর যেতে হল না, চৈতী খরগোসের বাড়িটা দেখা গেল। বাড়ির ছাদের ওপরকার চিম্‌নিগুলোর গড়ন কানের মতো, আর চালটা লোম দিয়ে ছাওয়া, কাজেই অ্যালিস বুঝলে যে, ঐ বাড়িটাই হবে। বাড়িটা বেশ উঁচু, তাই বাঁ হাতের ব্যাঙের ছাতার টুকরোটায় কয়েকটা কামড় দিয়ে ফুট দুয়েক লম্বা হয়ে নিলে; তার পর বাড়িটার কাছে যেতে ভরসা হল। তবু, একটু ভয়ে ভয়েই এগোতে লাগল; মনে মনে বললে, 'বলা যায় না তো, যদি সত্যিই একেবারে উদোম পাগল হয়! এখন দেখছি টুপিওলার কাছে গেলেই ভালো হত!'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর

বাড়ির সামনে গাছের তলায় টেবিল পাতা, চৈতী খরগোস আর টুপিওলা সেখানে বসে চা খাচ্ছে ; তাদের দুজনের মাঝখানে বসে আছে একটা গেছো ইঁদুর, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। আর ওরা দুজন তার ঘাড়ের ওপর কনুয়ের ভর রেখে তার মাথার ওপর দিয়ে দিব্যি

কথাবার্তা চালাচ্ছে। অ্যালিস ভাবলে, 'গেছো ইঁদুরটার ভারি অসুবিধে তো ; তবে, ঘুমোচ্ছে বলেই হয়তো গায়ে মাখছে না।'

টেবিলটা বেশ প্রকাণ্ড, কিন্তু তবু, তিনজনে এক কোনায় জড়ো হয়ে বসে আছে। অ্যালিসকে দেখতে পেয়েই সবাই বলে উঠল, জায়গা নেই! মোটে জায়গা নেই!" অ্যালিস চটে উঠে বললে "এক গাদা জায়গা আছে!" বলে টেবিলের এক পাশে একটা বড়ো আরাম-চেয়ারে বসে পড়ল।

চৈত্রী খরগোসটা বেশ আপ্যায়নের সুরে বললে, "একটু আঙুরের রস খাও।"

অ্যালিস তন্ন তন্ন করে টেবিলটা দেখলে, কিন্তু কেবল চা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বললে, "আঙুরের রস তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।"

চৈত্রী খরগোস বললে, "নেই, তা দেখবে কোত্থেকে।"

অ্যালিস রাগ করে বললে, "তা হলে আমায় আঙুরের রস খেতে বলাটা মোটেই ভদ্রতা হয় নি।"

চৈত্রী খরগোস বললে, "আর, না-ডাকতেই যে টেবিলে এসে বসলে, সেটা কোন্ দেশী ভদ্রতা হল?"

অ্যালিস বললে, "এটা যে তোমার টেবিল, তা জানা ছিল না, তিন-জনের চেয়ে অনেক বেশি লোকের জন্যে এটা পাতা হয়েছে।"

টুপিওলা বললে, "তোমার চুল ছাঁটা দরকার।" অনেকক্ষণ ধরেই খুব কৌতূহল নিয়ে সে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই প্রথম মুখ খুললে।

অ্যালিস খানিকটা কড়া সুরে বললে, "কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে নেই, এটা ছোটোলোকমি।"

এই কথা শুনে টুপিওলার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল ; কিন্তু, শুধু বললে, "কাক কেন লেখবার ডেস্কোর মতন, বলতে পার?"

অ্যালিস ভাবলে, 'এই তো, এই বার বেশ মজা হবে। ধাঁধাঁ-টাঁধা জিগেস করতে শুরু করেছে, ভালোই হয়েছে!' তার পর বললে, "আঁচ করতে পারব মনে হচ্ছে।"

খরগোস বললে, "তার মানে কি বলতে চাও যে, এর উত্তরটা তুমি বার করতে পারবে?"

অ্যালিস বললে, "ঠিক তাই।"

খরগোস সঙ্গে সঙ্গে বললে, "তা হলে, যা বোঝাতে চাও, তাই-ই বলা উচিত তোমার।"

অ্যালিসও জবাব দিলে, "তাই তো করি। অন্তত—অন্তত, যা বলি ঠিক তাই-ই বোঝাতে চাই—একই তো ব্যাপার।"

টুপিওলা বললে, "মোটেই এক ব্যাপার নয়। তা হলে তো বলতে পার 'আমি যা খাই, তা দেখতে পাই' বলাও যা, আর, 'আমি যা দেখি, তাই-ই খাই' বলাও তা!"

খরগোসটা বললে, "তা হলে তো এও বলতে পার যে, 'আমি যা পাই, তা চাই' আর 'যা চাই তাই-ই পাই' একই কথা।"

গেছোইঁদুরটা মনে হল ঘুমতে ঘুমতেই ফোড়ন কাটলে, "বলতে পার 'যখন ঘুমোই, তখন নিশ্বাস নিই' যা, আর, 'যখনই নিশ্বাস নিই, তখনই ঘুমোই' বলাও তা!"

টুপিওলা গেছোইঁদুরের দিকে চেয়ে বললে, "তোমার বেলা অবশ্য এক কথাই বটে।" এর পর আর কথাবার্তা হল না, মিনিটখানেক সবাই চুপচাপ রইল, আর সেই ফাঁকে অ্যালিস সেই কাক আর লেখার ডেস্কোর ধাঁধাঁটার উত্তর বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

প্রথমে কথা বললে টুপিওলা, "আজকে মাসের ক'তারিখ?" অ্যালিসের দিকে মুখ ফিরিয়েই বললে। ইতিমধ্যে সে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে বার বার ভুরু কুঁচকে দেখছে, মাঝে মাঝে ঝাঁকাচ্ছে আর কানের কাছে লাগিয়ে শুনছে।

একটু ভেবে নিয়ে অ্যালিস বললে, "চৌঠো।"

টুপিওলা ফোঁস্ করে নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "দুদিনের গরমিল।" তার পর চৈত্রী খরগোসের দিকে ফিরে বললে, "তখনই বলেছিলুম মাখনের কম্ম নয়।"

খরগোস কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলে, "একেবারে সরেস মাখন ছিল, কিন্তু।"

টুপিওলা বললে, "তা ঠিক, তবে মাখনের সঙ্গে কিছুটা পাঁউরুটির গুঁড়োও ভেতরে চলে গেছে বোধ হচ্ছে। রুটি-কাটা ছুরি দিয়ে মাখন লাগানটা ঠিক হয় নি তোমার।"

খরগোস তখন থমথমে মুখ করে ঘড়িটা নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলে,

তার পর তার চায়ের কাপের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে আবার দেখলে, কিন্তু বেচারা বলবার মতো নতুন কোনো কথা খুঁজে না-পেয়ে সেই আগের কথাটাই আওড়ালে ফের, "মাখনটা কিন্তু এক্কেবারে সরেস ছিল, জানলে!"

অ্যালিস খুব আগ্রহভরে আড়-চোখে দেখছিল। বললে, "কী আজব ঘড়ি রে বাবা! তারিখ বলা যায়, অথচ সময় বলা যায় না!"

টুপিওলা বিড়্ বিড়্ করে বললে, "কেনই-বা বলা যাবে? তোমার ঘড়িতে সাল বলা যায়?"

অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "বলা যায়-ই না তো, তার কারণ হল, অনেক দিন ধরে তো একই সাল থাকে।"

টুপিওলা বললে, "আমার বেলাতেও অবস্থাটা ঠিক তাই।"

অ্যালিসের ভয়ানক ধোঁকা লাগল। টুপিওলার কথার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলে না, অথচ ভাষায় কোনো গণ্ডগোল নেই। যথা-সম্ভব বিনয় করে বললে, "মানেটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

টুপিওলা বললে, "গেছোইঁদুরটা আবার ঘুমচ্ছে," বলেই তার নাকে খানিকটা গরম চা ঢেলে দিলে।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চোখ না চেয়েই গেছোইঁদুর বললে, "একশো বার, একশো বার; আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

আবার অ্যালিসের দিকে ফিরে টুপিওলা বললে, "ধাঁধার উত্তরটা বার করতে পারলে না-কি?"

উত্তরে অ্যালিস বললে, "না, আমার দ্বারা হবে না; কী উত্তর বলুন তো?"

টুপিওলা বললে, "কিছু জানি না।"

খরগোস বললে, "আমিও জানি না।"

হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অ্যালিস বললে, "উত্তর হয় না এমন সব ধাঁধা বলে সময়টা নষ্ট না করে, কাজের কিছু করলে ভালো হত না?"

টুপিওলা বললে, "সময়কে আমি যতখানি চিনি, তুমি যদি ততখানি চিনতে, তা হলে ওকে 'টা' বলতে না, বলতে সময়'বাবু'।"

অ্যালিস বললে, "বুঝলুম না।"

অবজ্ঞাভরে মাথা দোলাতে দোলাতে টুপিওলা বললে, "বুঝতে তো পারবেই না। আমি জোর করে বলতে পারি সময়ের সঙ্গে কখনো কথাবার্তাও হয় নি তোমার!"

অ্যালিস এবার একটু সাবধান হয়ে জবাব দিলে, "খুব সম্ভব হয় নি, তবে, যখন গান শিখি, তখন ঠিক ঠিক সময়ে হাতে তাল মারতে হয়, তা জানি।"

টুপিওলা বললে, "অ্যাই তো, ধরে ফেলেছি! মারলে ও ভীষণ চটে যায়। ব্যাপার হল, ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখলে ঘড়ির ব্যাপারে তুমি যা চাও, ও তাই-ই করে দেবে। যেমন ধর, এখন সকাল ন'টা বেজেছে, পড়তে যেতে হবে; কিচ্ছু না, সময়বাবুর কানে ফিস্-ফিস্ করে ইশারায় একটু জানিয়ে দাও, ব্যস্! এক লহমায় ঘড়ির কাঁটা সাঁ করে ঘুরে যাবে! বেলা দেড়টা, দুপুরে খাবার সময়!"

(খরগোস আপন মনে বিড়্ বিড়্ করে বললে, "আহা, তাই যদি হত রে!")

অ্যালিস ভাবনামেশান গলায় বললে, "ব্যাপারটা তো খুবই চমৎকার, কিন্তু তখনো আমার খিদে পাবে না, বুঝতেই পারছ।"

টুপিওলা বললে, "প্রথম মুখে পাবে না, তবে যতক্ষণ খুশি বেলা দেড়টাতেই সময়কে বেঁধে রাখতে পারছ তো!"

অ্যালিস বললে, "তুমি কি এইরকম করেই কাজ সার না-কি?"

অতি দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে টুপিওলা বললে, "না, আমার বেলা তা হয় না। গত চৈত্র মাসে আমাদের ঝগড়া হয়ে গেছে—" তার পর হাতের চামচটা দিয়ে খরগোসের দিকে ইশারা করে বললে "—যে-সময়ে ও পাগল হয়ে গেল, ঠিক তার আগেই। ঘটনাটা ঘটেছিল হরতনের বিবির জলসায়, সেখানে আমায় এই গানটা গাইতে হয়েছিল—

'ঝিকমিক ঝিকমিক বাদুড়ের ছা
কোন্ তালে যাচ্ছিস সেটা বলে যা'

গানটা জান বোধ হয়?"

অ্যালিস বললে, "ঐরকমই কী যেন শুনেছি।"

টুপিওলা বলতে লাগল, "তার পরে এইরকম—

'কাপ-ডিশ রাখবার ট্রের মতো ভাসিয়া
আকাশেতে উড়ছিস হাসিয়া হাসিয়া।
ঝিকমিক, ঝিকমিক—'

এই সময়ে গেছোইঁদুরটা গা ঝাড়া দিয়ে ঘুমের মধ্যেই গেয়ে যেতে লাগল, "ঝিকমিক, ঝিকমিক, ঝিকমিক, ঝিকমিক—"

আর এতক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে একই কথা আওড়ে যেতে লাগল যে, তাকে চিমটি কাটতে, তবে থামে।

টুপিওলা বলে যেতে লাগল, "গানের প্রথম পদটা তখনো শেষ হয়েছে কি হয় নি, মহারানী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'এ ব্যাটা সময়কে খুন করছে! একে কোতল কর!' "

অ্যালিস চোখ বড়ো-বড়ো করে বললে, "কী হিংস্র রে, বাবা!"

টুপিওলা করুণ গলায় বলতে লাগল, "সেই থেকে ও আমার একটা কথাও রাখে না! সেই থেকে সব সময়ে ছ'টাই বেজে রয়েছে!"

অ্যালিসের মাথায় চট্ করে বুদ্ধি খেলে গেল; বললে, "ও, তাই জন্যে বুঝি এখানে এত-সব চায়ের বাসন-পত্র?"

ফোঁস্ করে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে টুপিওলা বললে, "ঠিক বলেছ, বিকেলের চা-খাবার সময় আর কিছুতেই পার হচ্ছে না; বাসন-পত্তর ধোবার ফুরসতটুকু পর্যন্ত নেই।"

অ্যালিস সাহস করে জিগেস করলে, "যখন একবার চায়ের পালা শেষ করে আবার নতুন করে শুরু কর, তখন কী হয়?"

চৈতী খরগোস একটা হাই তুলে বলে উঠল, "অন্য কোনো কথা হোক-না; এক কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল্লাগে না বাপু। আমি বলি কি, এই খুকিটি একটা গল্প শোনাক।"

অ্যালিস সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে, "ভারি মুস্কিল হল তো, গল্প যে আমি জানিই না মোটে।"

তাই শুনে টুপিওলা আর চৈতী খরগোস দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "তা হলে গেছোইঁদুর গল্প বলুক। উঠে পড় হে, গেছো-ইঁদুর, জেগে পড়!" বলে একসঙ্গে দুদিক থেকে তাকে খিমচতে লাগল।

গেছোইঁদুর খুব ধীরে ধীরে চোখ খুললে, তার পর ভাঙা-ভাঙা গলায় আস্তে করে বললে, "আমি কিন্তু মোটেই ঘুমোই নি। তোমাদের প্রত্যেকটি কথা আমার কানে গেছে।"

চৈতী খরগোস বললে, "আমাদের একটা গল্প বল।"

অ্যালিস বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনাও শোনাও।"

টুপিওলা ফোড়ন কাটলে, "হ্যাঁ, আর চট্ করে শুরু করে ফেল, নইলে তার আগেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে।"

খুব তড়বড় করে গেছোইঁদুর তার গল্প শুরু করলে, "এক সময়ে তিনটি বোন থাকত। তাদের নাম ছিল এল্‌সি, লেসি আর টিলি। একটা কুয়োর তলায় তারা থাকত—"

অ্যালিস বললে, "কী খেয়ে থাকত?" খাবার-দাবারের দিকে অ্যালিসের ভয়ানক ঝোঁক।

মিনিট দুয়েক ভেবে নিয়ে গেছোইঁদুর বললে, "ঝোলা গুড় খেয়ে থাকত।"

অ্যালিস নরম হয়েই বললে, "তা কী করে হবে বল, শুধু ঝোলা গুড় খেয়ে থাকলে যে অসুখ করে যাবে।"

গেছোইঁদুর বললে, "তাই-ই তো হল; ভীষণ অসুখ করল ওদের!" অ্যালিস ভেবে দেখতে চেষ্টা করল, কী অদ্ভুত জীবন তাদের; তবে ভাবতে গিয়ে এমন ধাঁধায় পড়ে গেল যে, সে-চেষ্টা আর করলে না, বললে, "কিন্তু, ওরা কুয়োর তলাতেই-বা থাকতে গেল কী দুঃখে?"

এই সময়ে চৈতী খরগোস খুব সমাদর করে অ্যালিসকে বললে, "আরো একটু চা নাও।"

অ্যালিস একটু গোঁসা করেই বললে, "এর আগে তো একবারও নিই নি। কাজেই আরো নেব কী করে?"

টুপিওলা বললে, "তার মানে তমি এই কথা বলছ তো যে, তুমি আরো 'কম' নিতে পারবে না, তাই তো? কিছু না-নেওয়ার চেয়ে, কিছু বেশি নেওয়া অনেক সোজা।"

অ্যালিস বললে, "তুমি আগ বাড়িয়ে কথা বলছ কেন? কে তোমাকে কথা বলতে ডেকেছে?"

টুপিওলা জিতে যাওয়ার সুরে বললে, "এবার? ব্যক্তিগত কথা এবার কার মুখ থেকে বেরল?"

এর কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে অ্যালিস নিজেই একটু চা আর মাখন-রুটি নিলে, তার পর গেছোইঁদুরের দিকে ফিরে আবার প্রশ্ন করলে, "ওরা কুয়োর তলায় থাকত কেন?"

গেছোইঁদুর আবার মিনিট দুয়েক সময় নিলে, তার পর বললে, "ওটা ছিল ঝোলা গুড়ের কুয়ো, তাই।"

অ্যালিস রেগে-মেগে বলতে গেল, "ঝোলা গুড়ের কুয়ো বলে কিছু হয় না!" কিন্তু টুপিওলা আর চৈতী খরগোস 'শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌' করে বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। গেছোইঁদুর মুখ গোমড়া করে বললে, "যদি শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকতে না পার, তা হলে গল্পটা তুমি নিজেই শেষ করে নাও।"

অ্যালিস বললে, "না, না। দয়া করে বাকিটুকু বল, ভাই। আর আমি বাগড়া দেব না। আমি বলছি তো, ঝোলা গুড়ের কুয়ো থাকতেও পারে, অন্তত একটা হয়তো আছে কোথাও।"

গেছোইঁদুর বেশ চটে গিয়ে বললে, "হুঁঃ, একটা!—তা, সেই ছোটো-ছোটো তিন বোন তারা টানতে শিখল।" অ্যালিস বাধা দেবে না বলে কথা দিয়েছিল, সে-সব ভুলে গিয়ে বলে ফেললে, "কী টানত?"

গেছোইঁদুর এবারে আর রাগ করলে না, বললে, "ঝোলা গুড়।"

টুপিওলা বলে উঠল, "আমার একটা পরিষ্কার কাপ দরকার। এস, সবাই এগিয়ে এগিয়ে বসি।"

বলেই সে তার পরের চেয়ারটায় বসল, গেছোইঁদুরও তাই করলে;

চৈতী খরগোস গিয়ে বসল গেছোইঁদুরের জায়গায়, আর অ্যালিসকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসতে হল চৈতী খরগোসের জায়গায়। জায়গা বদলের ফলে একমাত্র টুপিওলারই সুবিধে হল; অ্যালিসের খুবই খারাপ হল, কারণ ঠিক তার আগেই চৈতী খরগোস তার প্লেটে দুধের পাত্রটা উল্টে ফেলে গেছে।

গেছোইঁদুরের মনে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না, তাই অ্যালিস খুব সাবধানে বললে, "একটা কথা ঠিক বুঝলুম না, কোথা থেকে তারা ঝোলা গুড় টেনে তুলত?"

টুপিওলা বললে, "জলের কুয়ো থেকে যখন জল টেনে তোলা যায়, তখন ঝোলা গুড়ের কুয়ো থেকে ঝোলা গুড় তোলা যাবে না কেন? অ্যাঁ, হাঁদাগঙ্গারাম?"

শেষ কথাটা গায়ে না-মেখে অ্যালিস গেছোইঁদুরকে বললে, "কিন্তু, ওরা তো কুয়োর ভেতরেই রয়েছে।"

গেছোইঁদুর বললে, "তা তো রয়েইছে, অনেক ভেতরে রয়েছে।"

এই উত্তর শুনে অ্যালিসের বুদ্ধি এমন ঘুলিয়ে গেল যে, গেছো-ইঁদুরের গল্পে অনেকক্ষণ আর বাগড়া দিলে না।

গেছোইঁদুরের ঘুম পাচ্ছিল, তাই হাই তুলতে তুলতে আর চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলতে লাগল, "তারা তো টানতে শিখল, তুলি টানতে শিখল, তুলির টানে আঁকতে লাগল—কতরকমের জিনিসই-না আঁকল, সব জিনিসেরই গোড়ার অক্ষর 'ই'—"

অ্যালিস বললে, "কেন? 'ই' কেন?"

চৈতী খরগোস বললে, "নয়ই-বা কেন?"

অ্যালিস চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে গেছোইঁদুরের চোখের পাতা বুজে গেছে, তন্দ্রাও এসে গেছে; কিন্তু টুপিওলার চিমটি খেয়ে আঁক করে চমকে উঠে আবার বলতে লাগল, "—হ্যাঁ, সব কিছু 'ই' দিয়ে শুরু, যেমন ইঁদুর-ধরা-কল, ইন্দু, ইচ্ছা, ইত্যাদি—জানোই তো, আমরা বলি, জিনিসটা যেন, 'ইত্যাদিতে একেবারে ইত্যাদি'—ইত্যাদির ছবি দেখেছ কখনো?"

অ্যালিস ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে, "বাঃ, বেশ তো, আমায় জিগেস করা কেন'; আমার তো বাপু মনে হয় না যে—"

টুপিওলা বললে, "তা হলে কথা না-বলে চুপ করে থাক।"

অ্যালিসের আর কতই-বা সয়; টুপিওলার এই ইতরের মতো ব্যবহারে অ্যালিস আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। তিতিবিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, সেখানে আর একদণ্ডও দাঁড়ালে না। গেছোইঁদুরটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল, আর বাকি দুজন লক্ষ্যও করলে না যে, অ্যালিস চলে যাচ্ছে। অ্যালিস হাঁটতে হাঁটতে দু-এক বার পেছন ফিরে তাকিয়েও ছিল—হয়তো ওরা তাকে ডাকবে। শেষ বারের মতো যখন পেছন ফিরে তাকালে, দেখলে টুপিওলা আর চৈতী খরগোস প্রাণপণে গেছোইঁদুরটাকে টি-পট্‌টার মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করে চলেছে।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অ্যালিস বললে, "কিছুতেই আর ও-মুখো হচ্ছি না! জন্মে কখনো এমন উদ্ভুট্টে চায়ের আসর দেখি নি, বাবা!"

বলতে বলতে দেখে, একটা গাছের গায়ে ছোটো একটা দরজা লাগান রয়েছে—সোজা গাছের ভেতরে চলে যাওয়া যায়। ভাবলে, 'অদ্ভুত তো! তবে আজকের সবই তো অদ্ভুত। তা, ভেতরে ঢুকে গেলেই তো হয়।' ঢুকেই পড়ল অ্যালিস। আর—

ঢুকেই দেখে—আবার সেই হল্‌-ঘর, হাতের কাছেই সেই ছোটো কাঁচের টেবিল। মনে মনে বললে, 'নাঃ, এবারে আরো গুছিয়ে-গাছিয়ে কাজ করতে হবে।' বলে, আগে সেই সোনালি চাবিটা নিয়ে, বাগানে যাবার দরজাটা খুলে ফেললে। তার পর সেই ব্যাঙের ছাতার টুকরো থেকে একটু-একটু কামড়ে খেতে লাগল। (পকেটে একটা টুকরো বরাবরই রেখে এসেছে সে।) যখন লম্বায় ফুট খানেক হল, তখন আর খেল না। তার পর সেই সরু পথটা হেঁটে পার হয়ে গেল; আর তার পর?—অ্যালিস এখন ঝলমলে ফুল আর ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা-ভরা সেই সুন্দর বাগানটার মধ্যে এসে গেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারানীর খেলার মাঠে

বাগানে ঢোকবার মুখেই একটা বড়ো গোলাপ গাছ, তাতে সাদা-সাদা গোলাপ ফুটে আছে, কিন্তু তিনজন মালী খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সব-কটা ফুলের গায়ে লাল রঙ মাখাচ্ছে। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভালো করে লক্ষ্য করবার জন্যে অ্যালিস একটু কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেলে, মালীদের একজন বলছে, "ওহে পঞ্জা, হাত সামলে হে, হাত সামলে! আমার গায়ে রঙের ছিটে লাগছে যে!"

পঞ্জা গোমড়ামুখে বললে, "তা কী করব, সাতা আমার কনুইতে ধাক্কা মারলে যে।"

তাই শুনে সাতা মুখ তুলে বললে, "বা ভাই, পঞ্জা, বেশ, বেশ! কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপান!"

পঞ্জা বললে, "তুমি আর কথা বল না, কালকেই তো শুনলুম, মহারানী বলছেন তোমার গর্দান নেওয়া উচিত!"

যে প্রথমে কথা বলেছিল, সে জিগেস করলে, "কীসের জন্যে গর্দান নেবে?"

সাতা বললে, "তাতে তোমার দরকারটা কী হে, দুরি?"

পঞ্জা বললে, "একশো বার ওর দরকার আছে, হাজার বার আছে! আমি বলে দিচ্ছি—কারণ হল, রাঁধুনিকে পেঁয়াজের বদলে ও রজনী-

গন্ধার শেকড় এনে দিয়েছিল।"

সাতা তার হাতের বুরুশটা আছড়ে ফেলে সবে বলতে শুরু করেছে, "ভালো রে ভালো, যেখানে যত অন্যায়, আর—" এমন সময়ে অ্যালিসের ওপর চোখ পড়তেই সে আচমকা থেমে গেল; বাকি দুজনও অ্যালিসের দিকে ফিরে তাকাল, আর, সব্বাই মাথা নিচু করে তাকে খাতির দেখালে।

অ্যালিস নরম গলায় বললে, "আচ্ছা, গোলাপ ফুলগুলোকে রঙ করছ কেন বল তো?"

পঞ্জা আর সাতা কোনো কথা না-বলে দুরির দিকে তাকালে। দুরি নিচু গলায় বলতে লাগল, "শোন, ব্যাপার হচ্ছে, এই জায়গায় লাল গোলাপের গাছ থাকবার কথা, কিন্তু আমরা ভুল করে সাদা গোলাপ লাগিয়ে ফেলেছি; এখন, কোনোরকমে যদি মহারানীর চোখে পড়ে, আমাদের সবাইকার মুণ্ডু উড়ে যাবে, জানলে? কাজেই বুঝতেই পারছ তো খুকি, মহারানী এদিকে এসে পড়ার আগেই আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছি—।" পঞ্জা এতক্ষণ ইতিউতি তাকাচ্ছিল, দুরির কথা শেষ হবার আগেই আঁৎকে বলে উঠল, "মহারানী! মহারানী!" আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজন ধড়াস্ করে সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে মুখ থুবড়ে। অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর, অ্যালিস ঘুরে দাঁড়াল মহারানীকে দেখবে বলে।

প্রথমেই এল দশজন সৈন্য, হাতে তাদের ডাণ্ডা। এদের সবাই-কারই চেহারা ঐ মালী তিনজনের মতো—চ্যাপ্টা, আর একদিক লম্বা চৌকোণা আকারের, তারই চারকোণ থেকে বেরিয়েছে হাত আর পা। তার পর এল দশজন সভাসদ; তাদের সারা দেহে রুইতনের মতো হীরে ঝকমক করছে। সৈন্যদের মতো এরাও এক-এক সারিতে দু'জন দু'জন করে দাঁড়িয়েছে। এর পর এল রাজ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা; এরাও দশজন। দুজন দুজন হাত ধরাধরি করে নেচেকুঁদে চলেছে তারা; এদের সারা গায়ে হরতন আঁকা। এর পর এলেন সব অতিথি-সজ্জনরা—বেশির ভাগই রাজা বা রানী; অ্যালিস দেখতে পেলে, এদের মধ্যে সেই সাদা খরগোসটাও রয়েছে। খুব একটা সন্ত্রস্তভাবে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সে এর ওর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, আর যে যা জবাব দিচ্ছে, তাতেই হেঁ হেঁ করে হাসছে; অ্যালিসের

কাছ দিয়ে যাবার সময়ে তাকে লক্ষ্যও করলে না। এর পর এল হরতনের গোলাম, টকটকে লাল ভেলভেটের একটা বালিশের ওপর মহারাজের মুকুটটা রেখে বয়ে নিয়ে আসছে। আর, এই জমকাল শোভাযাত্রার এক্কেবারে শেষে আসছেন হরতনের রাজা আর হরতনের রানী!

মালীদের মতো তাকেও ঐরকম উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে কি-না, অ্যালিস ঠিক বুঝতে পারলে না; তবে, শোভাযাত্রার বেলা সেরকম কোনো নিয়ম-কানুনের কথা তো কখনো শোনে নি; আর, তা ছাড়া, অ্যালিস ভেবে দেখলে, 'সব্বাই যদি উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়েই পড়ে, কিছু দেখতেই যদি না পায়, তা হলে শোভাযাত্রা করে লাভটাই-বা কী?' কাজেই, সে নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

শোভাযাত্রা যখন অ্যালিসের ঠিক সামনা-সামনি এসেছে, তখন সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে অ্যালিসের দিকে তাকাল; মহারানী রুক্ষ গলায় বললেন, "এটা আবার কে?" কথাটা বলা হল হরতনের গোলামকে। উত্তরে সে শুধু মাথাটা সামনে দিকে একবার ঝুঁকিয়ে ফিক করে হাসলে।

অধৈর্যে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মহারানী বললেন, "আহাম্মক!" তার পর অ্যালিসের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার নাম কী খুকি?"

খুব বিনয়ের সঙ্গে অ্যালিস বললে, "আমার নাম হল অ্যালিস, মহারানী।" বিনয় করলে বটে, তবে মনে মনে ভাবলে, 'আরে বাবা, এক গোছা তাস ছাড়া তো কিছু নয়, অত সমীহ করার কী আছে!

সেই গোলাপ গাছটার এপাশে ওপাশে মালী তিনজন উপুড় হয়ে পড়েছিল, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মহারানী বললেন, "আর এরা কে?" ব্যাপার হল, ওরা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বলে, ওদের পেছনকার নকশাই শুধু দেখা যাচ্ছে; আর, একগোছা তাসের সবকটারই পেছনকার নকশা তো একইরকম, তাই মহারানী বঝতেই পারছেন না যে, ওরা মালী, না সৈন্য, না সভাসদ, না তাঁর ছেলেমেয়েদেরই কেউ কেউ।

"তা আমি কী করে জানব? আমার কিসের মাথাব্যথা?" কথাটা বলে অ্যালিসের নিজেরই আশ্চর্য লাগল—তার সাহস তো কম নয়!

মহারানী তো রেগে একেবারে সিঁদুরবর্ণ। অ্যালিসের দিকে বুনো জানোয়ারের মতো এক পলক তাকালেন, তার পর তারস্বরে হুঙ্কার ছাড়লেন, "গর্দান নাও! কোতল..."

অ্যালিস বেশ চেঁচিয়েই সাফ জবাব দিলে, "ধ্যাৎ!" মহারানী এক্কেবারে চুপ।

মহারাজ মহারানীর হাতের ওপর হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, "একটু ক্ষমাঘেন্না করে নাও, গো; বাচ্চা মেয়ে বৈ তো নয়!"

মহারানী রেগেমেগে ঝটকা মেরে তাঁর কাছ থেকে সরে এসে গোলামকে বললেন, "ওদের উল্টে দাও!"

খুব সন্তর্পণে একটা পা দিয়ে গোলাম তাদের উল্টে দিলে।

মহারানী খনখনে গলায় চীৎকার করে উঠলেন, "উঠে দাঁড়াও।" সঙ্গে সঙ্গে মালী তিনজন তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজাকে, রানীকে, রাজবাড়ির ছেলেমেয়েদের, মায় বাকি সব্বাইকে সেলাম করতে লাগল।

মহারানী হুঙ্কার ছাড়লেন, "ঢের হয়েছে, থাম! আমার মাথা ঝিমঝিম করছে!" তার পর গোলাপ-গাছটার দিকে চেয়ে বললেন, "এখানে কী করা হচ্ছিল?"

দুরি এক হাঁটু গেড়ে খুব কাকুতি করে বললে, "মহারানী রাগ না-করেন তো বলি, আমরা চেষ্টা করছিলাম যে—"

ইতিমধ্যে মহারানী গোলাপ ফুলগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছেন; বললেন, "ও, এই ব্যাপার! এদের গর্দান নাও!" শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল আবার, তিনজন সৈন্য রয়ে গেল ওদের কোতল করবার জন্যে; মালী তিনজন প্রাণের ভয়ে ছুটে এল অ্যালিসের কাছে।

"কোনো ভয় নেই, কে তোমাদের গর্দান নেয় দেখি" বলে অ্যালিস তাড়াতাড়ি হাতের কাছে একটা ফুল-গাছের টবের মধ্যে তাদের রেখে দিলে। সৈন্য তিনজন মিনিট দুয়েক এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করলে, তার পর তক্ষুনি শোভাযাত্রার পেছন পেছন রওনা দিলে।

মহারানীর চীৎকার শোনা গেল, "ওদের ধড়ে আর মাথা নেই তো?"

সৈন্যরা তার উত্তরে চেঁচিয়ে বললে, "আজ্ঞে, রানীমা, ওদের মাথার কোনো পাত্তাই নেই!"

মহারানী বললেন, "বহুৎ আচ্ছা।" তার পর বললেন, "ক্রোকে খেলতে পার?"

সৈন্যরা কোনো উত্তর না-দিয়ে অ্যালিসের দিকে তাকালে, বোঝা গেল, প্রশ্নটা অ্যালিসকেই করা হয়েছে।

অ্যালিস চেঁচিয়ে বললে, "হ্যাঁ, পারি!"

মহারানী হুঙ্কার ছাড়লেন, "তা হলে চলে এস!" অ্যালিস শোভা-যাত্রার সঙ্গে এগোতে এগোতে ভাবতে লাগল, এর পর বরাতে কী আছে, কে জানে।

পাশ থেকে মিন্‌মিনে গলায় কে বলে উঠল, "ভারি—ভারি সুন্দর দিনটা আজ!" পাশে পাশে সেই সাদা খরগোসটা চলেছে, আর

মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে।

অ্যালিস বললে, "খুব সুন্দর। জমিদারগিন্নী কোথায় ?"

খরগোসটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে গলা নামিয়ে বললে, "চুপ ! চুপ !" মাথা ঘুরিয়ে দুপাশ দেখে নিয়ে ডিঙি মেরে অ্যালিসের কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "বিচারে ওঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়ে গেছে।"

অ্যালিস বললে, "কী জন্যে ?"

খরগোস জিগেস করলে, "তুমি কি বললে, 'কী দুঃখের' ?"

অ্যালিস বললে, "মোটেই তা বলি নি, ব্যাপারটা একদম দুঃখের বলে মনে হচ্ছে না আমার। আমি বলেছি, 'কী জন্যে' ?"

খরগোস বললে, "জমিদারগিন্নী মহারানীর কান মলে দিয়েছেন"— শুনে অ্যালিস খুব জোরে খিল খিল করে হেসে উঠল। খরগোস খুব ভয় পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "আহা, চুপ কর-না, মহারানী শুনতে পাবেন যে! ব্যাপারটা হল কী, জমিদারগিন্নী এসে পেঁৗছতে দেরি করলেন, তাই মহারানী বললেন—"

বাজের মতো হুঙ্কার ছেড়ে মহারানী চেঁচালেন, "যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।" তাই শুনে সব্বাই এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল, আর এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়তে লাগল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত সব্বাই এক-এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে, খেলা শুরু হয়ে গেল। অ্যালিস ভেবে দেখলে ক্রোকে খেলার এমন উদ্ভুট্রে জায়গা সে জীবনে কখনো দেখে নি। মাঠময় লাঙল-চষা ক্ষেতের মতো ঢেউ খেলান মাটি ; বল হচ্ছে সব জ্যান্ত জ্যান্ত এক ধরনের ছোটো জাতের শজারু ; হাতুড়ির মতো যে ব্যাট দিয়ে ক্রোকে খেলে, তার বদলে রয়েছে জ্যান্ত সারস পাখি ; আর, যে-সমস্ত ছোটো-ছোটো খিলেনের মতো জিনিসের তলা দিয়ে বল গড়াতে হয়, সে-সব কিচ্ছু নেই ; তার বদলে সৈন্যরা দু-ভাঁজ হয়ে হাতে আর পায়ে ভর দিয়ে খিলেনের মতো চেহারা করে মাঠের এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

অ্যালিসের প্রথম মুস্কিল হল, তার ভাগে যে সারস পাখিটা, সেটাকে বাগ মানান। সারসের ঠ্যাং দুটো বাইরে ঝুলিয়ে রেখে দেহটাকে কোনোরকমে বগলের তলায় ঠেসে কায়দা করে ধরতে পেরেছে

অ্যালিস—পাখিটারও বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই হচ্ছে কী, যখনই তার লম্বা গলাটাকে বেশ খাড়া সোজা করে নিয়ে তার মাথাটা দিয়ে শজারুর গায়ে বাড়ি মারতে যাবে, তখনই সারসটা গলাটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে মুখটা ওপরে তুলে এমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে অ্যালিসের দিকে তাকাচ্ছে যে, হাসতে হাসতে অ্যালিসের পেট ফেটে যায়! কোনোরকমে গলাটাকে আবার সোজা নীচের দিকে নামিয়ে ফের যখন বলের দিকে তাগ করতে যায়, তখন দেখা যায় যে, শজারু মশাই গুটিয়ে বলের মতো হয়ে না-থেকে লম্বা হয়ে গুটি গুটি সরে পড়ছে। এ-সব ছাড়াও, শজারু-বলকে ব্যাটের বাড়ি মেরে যেদিকেই চালান করতে চেষ্টা করুক, লাঙলের ফালের নালা বা নালার ধারের মাটির ঢিবি—কিছু-না-কিছু বাধা পড়বেই; আর, দু-ভাঁজ-হওয়া সৈন্যরা মাঝে মাঝেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাঠের মধ্যে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে জায়গা বদলাচ্ছে; কাজেই খানিক বাদেই অ্যালিস টের পেলে যে, খেলাটা দারুন জটিল।

খেলোয়াড়রা নিজের নিজের দান আসবার আগেই সবাই একই সঙ্গে ব্যাট হাঁকড়াচ্ছে, অনবরত ঝগড়া করছে আর শজারু খুঁজে বেড়াচ্ছে;. কাজেই দেখতে-না-দেখতে মহারানী তো ক্ষেপে আগুন!

দুম দুম করে পা ফেলে মিনিটে একবার করে চীৎকার করতে লাগলেন, "এর গর্দান নাও! ওর গর্দান নাও!"

অ্যালিসের বেশ অস্বস্তি বোধ হতে লাগল; মহারানীর সঙ্গে তার অবশ্য তখনো পর্যন্ত কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয় নি, তবে যে-কোনো সময়ে হলেই হল। অ্যালিস ভাবলে, 'তখন কী হবে? মানুষের গর্দানের ওপর এদের যেরকম ভয়ানক লোভ দেখছি, এখনো যে একজনও বেঁচে আছে, সেটাই আশ্চর্য!"

কিভাবে এখান থেকে কেটে পড়া যায়, চারি দিকে তাকিয়ে তাই দেখছে, সবাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় কী করে, তাই ভাবছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, বাতাসে অদ্ভুত মতন কী একটা জিনিস যেন দেখা যাচ্ছে। প্রথমে খুব ধোঁকা লাগল, তার পর মিনিট দুয়েক লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারলে যে, ওটা হচ্ছে মুচ্‌কি হাসি। নিজের মনে বললে, 'কাবলী বেড়ালটা; যাক, কথা বলার মতো কাউকে একটা পাওয়া গেল।'

কথা বলতে গেলে মুখের যতটা দরকার, সেইটুকু ফুটে উঠতেই বেড়ালটা বললে, "কেমন চলছে?"

বেড়ালের চোখদুটো ফুটে ওঠার জন্যে অ্যালিস অপেক্ষা করছিল, দেখা যেতে ঘাড় নাড়লে। ভেবে দেখলে, 'কান দুটো—একটা কান অন্তত দেখা না-গেলে কথা বলে কিছু লাভ নেই।' দেখতে-না-দেখতে পুরো মুখটা ফুটে উঠল, আর অ্যালিস তার কাঁধ থেকে সারস পাখিটাকে নামিয়ে রেখে বেড়ালকে খেলার বর্ণনা দিতে লাগল। শোনবার মতো কাউকে যে পাওয়া গেছে, তাতে সে খুব খুশি। বেড়ালটা বোধ হয় ভাবলে, যতখানি দেখা গেছে, তাই-ই যথেষ্ট, কাজেই মুখ পর্যন্তই রইল, আর কিছু ফুটল না।

একটু নালিশের সুরেই অ্যালিস আরম্ভ করলে, "আমার তো মনে হল, খেলার রীতি-নীতির ধার ধারে না কেউই; তা ছাড়া, দিনরাত এমন কাঁউমাউ করছে যে, কারো কথাও শোনা যাচ্ছে না—আর, খেলার বিশেষ কোনো আইন-কানুনও কিছু আছে বলে মনে হল না; থাকলেও, মানবার দায় অন্তত কারোরই নেই দেখলুম—আর, জ্যান্ত জিনিস নিয়ে খেলা যে কী ঝকমারি, তা যদি জানতে! যেমন ধর, যে-খিলেনের তলা দিয়ে বল মারবার কথা, সেটা বেড়াতে বেড়াতে মাঠের অন্য দিকে

চলে গেল—আর, আমার শজারুটা যখন গড়িয়ে গিয়ে মহারানীর শজারুর গায়ে লাগবার কথা, তখন শজারুটাকে কাছে আসতে দেখে আগে-ভাগেই অন্য শজারুটা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে!"

একটু নিচু গলায় বেড়াল বললে, "মহারানীকে কেমন লাগছে?"

অ্যালিস বললে, "একদম বিচ্ছিরি! ওঁর এত বেশি—" বলতে বলতে অ্যালিস দেখতে পেলে, ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহারানী তার কথা শুনছেন; সামলে নিয়ে বললে, "—ওঁর এত বেশি জেতবার সম্ভাবনা যে, শেষ অবধি খেলার কোনো দরকারই নেই।"

মহারানী একটু মুচকি হেসে সেখান থেকে চলে গেলেন।

মহারাজ অ্যালিসের কাছাকাছি এসে বেড়ালের মাথাটার দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে তাকাতে তাকাতে বললেন, "কার সঙ্গে কথা বলছ?"

অ্যালিস বললে, "আমার বন্ধু—একটা কাবলী বেড়াল। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই।"

মহারাজ বললেন, "ওর চেহারাটা মোটেই সুবিধের ঠেকছে না। যাই হোক, ইচ্ছে করলে ও আমার হস্তচুম্বন করতে পারে।"

বেড়াল তাই শুনে বললে, "আমার বয়ে গেছে।"

"খাতির রেখে কথা বল, আর—আর, আমার দিকে ওরকম করে তাকিও না," বলতে বলতে রাজামশাই অ্যালিসের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অ্যালিস বললে, "বেড়ালরা তো রাজার দিকে তাকায়, কোন একটা বইয়েতে যেন পড়েছি।"

রাজা বললেন, "ব্যাটাকে এখান থেকে সরাতে হচ্ছে," রানী সেই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে বললেন, "দেখ, রানী, আমি চাই যে, তুমি এই বেড়ালটাকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করবে।"

ছোটো-বড়ো যে-কোনো মুস্কিলেরই একটি মাত্র আসান রানীর জানা আছে; কোনো দিকে না-তাকিয়েই তিনি হাঁকলেন, "গর্দান নাও!"

"আমি নিজেই জল্লাদকে ডেকে আনছি," বলে রাজা খুব ব্যস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অ্যালিস ভাবলে, সেও গিয়ে একবার দেখে আসে খেলা কেমন চলছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে রানী রেগেমেগে চীৎকার করছেন। নিজের নিজের দানের সময়ে খেলতে ভুলে গেছে বলে ইতিমধ্যেই তিন জনকে কোতল করবার হুকুম অ্যালিসের কানে গেছে। ব্যাপার

ব্যাপার দেখে খুব খারাপ লাগল অ্যালিসের—এমন এলোমেলো কাণ্ড চলেছে যে, বোঝাই যাচ্ছে না তার খেলার দান কখন। সে তার শজারুটার খোঁজ করতে লাগল।

দেখা গেল, তার শজারুটা অন্য একটা শজারুর সঙ্গে মারামারি করছে। অ্যালিস দেখলে, বল দিয়ে বল মারার এই বেশ চমৎকার সুযোগ। কিন্তু মুস্কিল হল, তার সারস পাখিটা ততক্ষণে মাঠের অন্য দিকে চলে গিয়ে কাছাকাছি একটা গাছে চড়ে বসবার জন্যে বার বার বৃথাই ওড়বার চেষ্টা করে চলেছে।

সারসটাকে ধরে আবার যখন অ্যালিস সেখানে ফিরে এল, শজারু দুটো ততক্ষণে মারামারি শেষ করে কোথায় সরে পড়েছে। অ্যালিস ভাবলে, 'যাকগে, তাতেই-বা কী। মাঠের এদিকে তো কোনো খিলেনই নেই, সব কটা ওদিকে গিয়ে জুটেছে।' সারসটাকে বেশ করে বাগিয়ে বগলের তলায় চেপে ধরলে অ্যালিস, যাতে না পালাতে পারে, তার পর বেড়াল-বন্ধুর সঙ্গে আবার একটু কথাবার্তা বলবার জন্যে পুরনো জায়গায় ফিরে এল।

ফিরে এসে দেখে, কাবলী বেড়ালের কাছাকাছি বেশ ভিড় জমে গেছে। জল্লাদ, রাজা আর রানীর মধ্যে তর্ক বেধে গেছে, তিনজনেই একই সঙ্গে কথা বলে চলেছে, আর, বাকি সবাই একেবারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে—মুখের চেহারা সুবিধের নয়।

অ্যালিস গিয়ে পৌঁছতেই তিনজনেই মীমাংসার জন্যে অ্যালিসকে সালিসী মানলে, বার বার নিজের নিজের বক্তব্য বলতে লাগল, আর, একসঙ্গে কথা বলার দরুন এমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল যে, অ্যালিস তাদের কথা একবর্ণও বুঝতে পারলে না।

জল্লাদের বক্তব্য হচ্ছে : ধড় না-থাকলে মুণ্ডু কাটা যায় না ; এরকম উদ্ভট কাজ তাকে এর আগে কখনো করতে হয় নি ; আর, এই বয়েসে নতুন করে এরকম কাজ সে করবে না।

রাজার বক্তব্য হচ্ছে : মুণ্ডু থাকলেই তা কাটা যায় ; আর জল্লাদ যেন বাজে না-বকে।

রানীর বক্তব্য হচ্ছে : এই মুহূর্তে কিছু একটা ব্যবস্থা না-করলে, যে যেখানে আছে, সব্বাইকার গর্দান নেবেন তিনি, কাউকে বাদ দেবেন না (তাঁর এই শেষের কথাটি শুনেই সবাইকার মুখ তোলো হাঁড়ি হয়েছে।)

বলবার মতো আর কিছু ভেবে না-পেয়ে অ্যালিস বললে, "বেড়ালটা জমিদারগিন্নীর, কাজেই তাঁকেই জিগেস করা হোক।"

রানী জল্লাদকে বললেন, "সে এখন জেলখানায় আছে, যাও, তাকে নিয়ে এস।" জল্লাদ তীরের মতো ছুটল।

আর, জল্লাদ চলে যেতেই বেড়ালের মাথাটা উবে যেতে শুরু করেছে; জমিদারগিন্নীকে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে একদম হাওয়া। রাজা আর জল্লাদ পাগলের মতো এদিক-সেদিক খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, আর, বাকি সবাই যে-যার খেলতে চলে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

নকল কাছিমের জীবন-কথা

অ্যালিসের হাতে হাত গলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে জমিদারগিন্নী বললেন, "আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল, বাছা—কী খুশিই যে হয়েছি, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।" দুজনে হাঁটতে লাগল।

জমিদারগিন্নীর মেজাজটা খুশ্ আছে দেখে অ্যালিসের ভালো লাগল; ভাবল, তখন রান্নাঘরে যে তাঁর মেজাজ অমন তিরিক্ষি ছিল, সেটা বোধ হয় মরিচের ঝাঁজের জন্যেই।

মনে মনে বললে, 'আমি যখন জমিদারনী হব, (খুব একটা আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না অবশ্য) আমার রান্নাঘরে মরিচের পাটই রাখব না একদম। মরিচ ছাড়াও স্যুপ কিছু খারাপ হয় না—লোকে যে বদ্‌মেজাজী হয়, সেটা হয়তো ঐ মরিচের জন্যেই।' এই নতুন ব্যাপারটা আবিষ্কার, করে অ্যালিসের বেশ আনন্দ হল। আবার ভাবলে, 'আর, বোধ হয় ভিনিগারে মেজাজ খাট্টা হয়—মেথির জন্যে হয় তিতিবিরক্ত—আর, চিনি-টিনির জন্যে ছোটোরা অমন মিষ্টি হয়। সবাই যদি এই-সব নিয়মগুলো জানত, তা হলে মিষ্টি জিনিসগুলো আর অত টেনে খরচ করত না।'

জমিদারগিন্নী যে সঙ্গে রয়েছেন, সে কথা খেয়ালই নেই, তাই হঠাৎ কানের কাছে তাঁর গলা পেয়ে চমকে গেল প্রথমটা—"কিছু একটা

ভাবছ তুমি, সোনা, তাই কথা বলার দিকে খেয়াল নেই। এ-থেকে একটা নীতি-উপদেশ পাওয়া যায়, এক্ষুনি ঠিক মনে আসছে না, একটু বাদেই মনে পড়ে যাবে।"

অ্যালিস বলেই ফেললে, "এর কোনো নীতি-উপদেশ নেই-ই হয়তো।"

জমিদারগিন্নী চুক চুক শব্দ করে বললেন, "ওরে বাছা! সব কিছুরই মধ্যে একটা-না-একটা নীতি-উপদেশ থাকে, শুধু খুঁজে বার করে নিতে হয়।" বলতে বলতে তিনি অ্যালিসের গায়ের ওপর ঘেঁষে এলেন।

ওঁর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে অ্যালিসের মোটেই ভালো লাগছে না: প্রথমত, জমিদারগিন্নীর চেহারাটা বড্ডো বদখৎ; দ্বিতীয়ত, অ্যালিসের তুলনায় তাঁর দেহের মাপটা এমনই যে, তাঁর থুতনিটা ঠিক একেবারে অ্যালিসের কাঁধের ওপর এসে ঠেকে; থুতনিটা আবার তেমনি সরু খোঁচা মতন। তবে, অ্যালিস তাঁর মনে আঘাত দিতে চাইলে না, তাই যতটা পারে সরে যেতে লাগল। বললে, "খেলাটা আগের চেয়ে ভালোই চলছে, মনে হচ্ছে।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "হ্যাঁ, তা চলছে; আর, এর মধ্যে যে নীতি-উপদেশ আছে, সেটা হল—'ভালোবাসাতেই পৃথিবী ঘোরে'।"

অ্যালিস বললে, "কে যেন বলেছিলেন, যে-যার নিজের নিজের কাজ করে গেলেই পৃথিবী ঘোরে।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "বাঃ, বেশ বলেছ! দুটো প্রায় একই কথা হল অবশ্য।" তার পর, অ্যালিসের কাঁধে তাঁর ছুঁচলো থুতনির খোঁচা মেরে আবার বললেন, "আর এর মধ্যে থেকে যে নীতি-উপদেশ পাওয়া যায়, সেটা হল 'যারে ফেল, সে-ই রাখে'!"

অ্যালিস ভাবলে, 'নীতি-উপদেশ খুঁজে বার করতে কী প্রচণ্ড উৎসাহ!'

খানিক বাদে জমিদারগিন্নী বললেন, "তুমি বোধ হয় ভেবে অবাক হচ্ছ যে, আমি তোমার কোমর জড়িয়ে ধরছি না কেন। ব্যাপার হল, তোমার ঐ সারসটার মেজাজ কেমন তা তো বুঝতে পারছি না। একবার দেখব না-কি?"

অ্যালিসের তাতে মোটেই আগ্রহ নেই, তাই নম্রভাবে বললে, "পাখিটা যদি কামড়ে দেয়।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "ঠিক কথা, সারস পাখি আর রাই সর্ষে,

দুই-ই কামড়ায়। আর, এর নীতি-উপদেশ হচ্ছে—'পালক যাদের এক-রকম, সেই পাখিরা দলবেঁধে এক ঝাঁকে ওড়ে'।"

অ্যালিস ফুট কাটলে, "দুঃখের বিষয়, রাই সর্ষে পাখি নয়।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "আবার একটা খাঁটি কথা শোনালে। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বল তুমি!"

অ্যালিস বললে, "যদ্দুর মনে হচ্ছে, রাই সর্ষে একধরনের খনিজ পদার্থ।"

জমিদারগিন্নী যেন অ্যালিসের সব কথাতেই সায় দেবার জন্য মুখিয়ে আছেন। বললেন, "ঠিক তাই। এই তো, কাছাকাছি একটা বিরাট রাই সর্ষের খনি রয়েছে। আর, এর নীতি-বাক্যটি হল, 'সর্ষের মধ্যে ভূত'।"

কথাটা অ্যালিসের কানে যায় নি; সে বলে উঠল, "এবার মনে পড়েছে, রাই সর্ষে একরকমের উদ্ভিজ্জ পদার্থ, দেখে অবশ্য তা মনে হয় না; কিন্তু তাই-ই।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "আমার মতও ঠিক তাই; আর এর নীতি-উপদেশ হল, 'তোমাকে দেখে যা মনে হয়, সেই রকমটি হও'; কিম্বা যদি আরো সহজ কথা চাও, তা হলে, 'তোমার আসল রূপের বদলে তোমায় অন্যরকম মনে করা, আর, তুমি যা, বা যা হতে পারতে বলে অন্য লোকের মনে হয়, তার মধ্যে কোনো অভিন্নতা নেই বলে অপরের যে-ধারণা, নিজেকে তার থেকে অভিন্ন বলে কক্ষনো মনে করবে না'।"

অ্যালিস বিনয় করে বললে, "কথাগুলো লিখে নিলে ভালো বোঝা যেত, কিন্তু, মুস্কিল হচ্ছে, আপনার মুখ থেকে শুনে ঠিক মাথায় ঢুকল না।"

জমিদারগিন্নী খুব খুশির সুরে বললেন, "এ তো কিছুই নয়, আরো কত কত বলতে পারি ইচ্ছে করলে।"

অ্যালিস বললে, "দয়া করে সে-কষ্ট আর করবেন না, অনুরোধ করছি।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "না, না, কষ্ট আবার কী? এতক্ষণ যা যা বলেছি, সব উপহার দিলাম তোমায়।"

অ্যালিস মনে মনে ভাবলে, 'কী উপহারেরই ছিরি! ভাগ্যিস

জন্মদিনে কেউ এইরকম উপহার দেয় না!' কথাগুলো চেঁচিয়ে বলবার ভরসা হল না।

আবার অ্যালিসের কাঁধে থুতনির খোঁচা মেরে জমিদারগিন্নী বললেন, "আবার ভাবছ?"

অ্যালিসের তখন একটু একটু বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে: ফট্ করে বলে দিলে, "বেশ করব ভাবব, ভাববার অধিকার আছে আমার।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "ঠিক কথাই বলেছ, যেমন শুয়োরদের ওড়বার অধিকার আছে। আর এর নী—"

জমিদারগিন্নীর কথা আস্তে আস্তে থেমে গেল দেখে অ্যালিস তো অবাক; তাঁর এত সাধের 'নীতি-উপদেশ' কথাটা শেষপর্যন্ত পুরো উচ্চারণ করলেন না, আর তাঁর হাতটাও অ্যালিসের হাতের ওপর আলগা হয়ে গেল। মুখ তুলতেই দেখলে, সামনে স্বয়ং মহারানী; হাতে-হাতে জড়িয়ে বুকের ওপর রেখেছেন, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে।

খুব মিন্‌মিনে গলায় ভয়ে ভয়ে জমিদারগিন্নী বললেন, "ভারি সুন্দর দিনটি, মহারানী!"

মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে রানী হুঙ্কার ছাড়লেন, "দেখ, খুব সাবধান, বলে দিচ্ছি, হয় তুমি কেটে পড়, নইলে তোমার মাথাটাকে কেটে পড়তে হবে! যে-কোনো একটা বেছে নাও!"

জমিদারগিন্নী একটা বেছে নিলেন—চোখের পলকে সেখান থেকে হাওয়া।

রানী অ্যালিসকে বললেন, "চল, খেলা চালান যাক।" অ্যালিস বেচারির কোনো কথা বলবার সাহস হল না, তাঁর পেছন-পেছন খেলার মাঠের দিকে এগোল।

রানী এতক্ষণ ছিলেন না, সেই সুযোগে অতিথিরা সব ছায়ায় বসে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল; রানীকে আসতে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আবার খেলা শুরু করে দিলে—রানী শুধু বলেছিলেন যে, এক মুহূর্ত দেরি হলেই তাদের কারোরই প্রাণ থাকবে না।

যতক্ষণ তারা খেলছে, সারাক্ষণই রানী তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছেন, আর, 'একে কোতল কর', 'ওকে কোতল কর', বলে চেঁচাচ্ছেন। যাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হচ্ছে, সৈন্যরা তাদের বন্দী

করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তার জন্যে তারা খিলেন হয়ে থাকতে পারছে না ; কাজেই আধ ঘণ্টাটাক বাদেই দেখা গেল, মাঠে একটাও খিলেন নেই, আর রাজা, রানী আর অ্যালিস ছাড়া বাকি সবাই প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়ে সৈন্যদের হাতে বন্দী।

রানীর তখন দম বেরিয়ে গেছে, খেলার পাট চুকিয়ে অ্যালিসকে বললেন, "নকল কাছিম দেখা হয়েছে ?"

অ্যালিস বললে, "না, নকল কাছিম কী, তাই-ই জানি না।"

রানী বললেন, "ঐ দিয়েই নকল কাছিমের স্যুপ তৈরি হয়।"

অ্যালিস বললে, "কখনো দেখি নি, শুনিও নি কখনো।"

রানী বললেন, "তা হলে চল, যাওয়া যাক। ও তোমাকে ওর নিজের ইতিহাস বলবে।"

রানীর সঙ্গে যেতে যেতে অ্যালিস শুনতে পেলে, সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাজা খুব নিচু গলায় বলছেন, "তোমাদের সব্বাইকে মাফ করে দেওয়া হল।" শুনে অ্যালিস মনে মনে বললে, 'যাক্, ভালো হল।' রানী এত লোকের গর্দান নেবার হুকুম দিয়েছেন দেখে তার খুব খারাপ লাগছিল এতক্ষণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গ্রাইফনের কাছে এসে পৌঁছল ; গ্রাইফন তখন রোদ পোহাতে পোহাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। (গ্রাইফন কী, যদি জানা না-থাকে, ছবি দেখে নাও।) রানী বললেন, "উঠে পড়্, কুঁড়ের বাদশা কোথাকার! এই খুকুমণিকে নিয়ে যা, নকল কাছিম দেখিয়ে আন, তার গল্প শুনিয়ে আন। আমি আবার গিয়ে দেখি, যে-সব গর্দান নেবার হুকুম দিলুম, তার কদ্দুর কী হল।" বলে তিনি চলে গেলেন, একা গ্রাইফনের কাছে রয়ে গেল অ্যালিস। গ্রাইফনের ছিরি-ছাঁদ মোটেই ভালো ঠেকছে না অ্যালিসের কাছে, তবে সব দিক ভেবে-চিন্তে দেখলে যে, ঐ বোম্বেটে রানীর সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে গ্রাইফনের কাছে থাকাটা কিছু বেশি বিপজ্জনক হবে না ; কাজেই অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্রাইফন উঠে বসে চোখ কচলালে, তার পর যতক্ষণ না রানী চোখের আড়াল হলেন, ততক্ষণ তাঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল, তার পর ঠোঁট টিপে মুচকে হাসলে। কিছুটা অ্যালিসকে লক্ষ্য করে, কিছুটা নিজের খেয়ালে বললে, "বেড়ে মজার ব্যাপার!"

অ্যালিস বললে, "কী মজার ব্যাপার ?"

গ্রাইফন বললে, "স্বয়ং মহারানী। সবটাই ওঁর কল্পনার খেয়াল, ঐ-যে, ঐ-সব ; কেউ কারো গর্দান নেয় না, জান ?—যাক্, চলে এস !"

আস্তে আস্তে গ্রাইফনের সঙ্গে যেতে যেতে অ্যালিস ভাবতে লাগল, 'সব্বাই এখানে খালি বলে, 'চলে এস !' জীবনে কখনো এত হুকুম শুনতে হয় নি আমায়, কক্ষনো না।'

বেশি দূর যেতে হল না, দেখা গেল, খানিকটা দূরে নকল কাছিম বেচারির মতো একলাটি বসে রয়েছে একটা সমান মতো পাথরের চাঁইয়ের ওপরে। কাছে আসতে তার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ কানে এল ; শুনে অ্যালিসের মনে হল নকল কাছিমের বুকটা ফেটে না-যায়। বড্ডো মায়া লাগল তার জন্যে। গ্রাইফনকে জিগেস করলে, "কিসের এত দুঃখু ওর ?" গ্রাইফন প্রায় আগের ভাষাতেই জবাব দিলে, "সবটাই ওর কল্পনার খেয়াল, ঐ-যে, ঐ-সব ; ওর কোনো দুঃখু নেই, জানলে ? চলে এস।"

ওরা নকল কাছিমের কাছে গিয়ে পৌঁছল। নকল কাছিম জল-ভরা বড়ো-বড়ো দুটি চোখ মেলে তাকাল ওদের দিকে, কোনো কথা বললে না।

গ্রাইফন বললে, "এই যে ছোটো মেয়েটিকে দেখছ, এই যে ; ও তোমার ইতিহাস শুনতে চায় ; সত্যিই চায়।"

খুব গভীর কাঁপা কাঁপা গলায় নকল কাছিম বললে, "বলব ওকে। দুজনেই বস তোমরা। আমার বলা শেষ না হলে একটি কথাও কয়ো না।"

ওরা বসল, কয়েক মিনিট কেউ-ই কোনো কথা বললে না। অ্যালিস মনে মনে বললে, 'আরম্ভ না-করলে শেষ করবে কী করে রে বাবা !' তবে ধৈর্য ধরে বসে রইল।

শেষ-মেশ ফোঁস্ করে একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে নকল কাছিম বললে, "একদিন আমি সত্যিকারের কাছিম ছিলাম।"

এর পর অনেকক্ষণ আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু গ্রাইফনের গলা দিয়ে আবেগের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—"হজ্‌কৃহ্‌ !" আর, তার সঙ্গে নকল কাছিমের অবিরাম ফোঁপানীর ফোঁৎ ফোঁৎ। অ্যালিস ভাবছে, 'ধন্যবাদ, স্যার, চমৎকার গল্প শুনিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ' বলে উঠে পড়ে ; কিন্তু আবার ভাবছে, নিশ্চয়ই এর পরে কিছু আছে। তাই কোনো কথা না-বলে চুপটি করে বসে রইল।

শেষপর্যন্ত নকল কাছিম আবার যখন বলতে শুরু করল, তখন মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠলেও, অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে—"যখন আমরা ছোটো ছিলাম, তখন সুমুদ্দুরে ঝাঁক বেঁধে পড়তে যেতাম। মাস্টার ছিলেন এক বুড়ো কাছিম—আমরা তাঁকে বলতাম, কূর্ম—কুর্‌মোমশাই!"

অ্যালিস প্রশ্ন করলে, "তিনি যদি কূর্ম না-হন, তা হলে তাকে কূর্মমশাই বলতে কেন?"

নকল কাছিম রাগের গলায় বললে, "তাঁকে কুর্‌মোমশাই বলতুম এই জন্যে যে, তিনি আমাদের পড়াতেন, আমাদের গুর্‌মোমশাই ছিলেন, তাই। তুমি বড্ডো হাঁদা দেখছি!"

গ্রাইফন ফোড়ন কাটলে, "এইরকম বোকার মতন প্রশ্ন করার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।" তার পর দুজনে চুপ করে বসে

বসে বেচারি অ্যালিসের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যে অ্যালিসের মনে হল মাটির নীচে সেঁধিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। শেষকালে গ্রাইফন নকল কাছিমকে বললে, "চালিয়ে যাও দোস্ত্! দিন কাবার করে দিও না!" নকল কাছিম বলতে শুরু করলে:

"হ্যাঁ, সুমুদ্দুরের ইস্কুলে যেতাম; বিশ্বাস না-করলে কী করব বল—"

অ্যালিস বাধা দিয়ে বললে, "বিশ্বাস করি না, বলেছি কি?"

নকল কাছিম বললে, "হ্যাঁ, বলেছ।"

অ্যালিস কিছু বলবার আগেই গ্রাইফন বলে উঠল, "খামোশ!"

নকল কাছিম বলে যেতে লাগল, "খুব ভালো শিক্ষা পেতাম আমরা —সত্যি কথা বলতে কি, রোজই ইস্কুলে যেতাম—"

অ্যালিস বললে, "আমিও ইস্কুলে পড়েছি, অত চাল মারবার কিছু নেই।"

নকল কাছিম একটু ভাবনায় পড়ল; বললে, " 'অধিকন্তু' বিষয় নিয়ে?"

অ্যালিস বললে, "অবশ্যই। আমরা ফরাসী ভাষা আর সঙ্গীত শিখতাম।"

নকল কাছিম বললে, "আর ধোলাই?"

অ্যালিস চটে উঠে বললে, "নিশ্চয়ই না।"

হাঁফ ছেড়ে নকল কাছিম বললে, "অ্যাই! তার মানে তোমাদের ইস্কুলটা তেমন ভালো নয়। আমাদের ওখানে লিস্টির তলায় লেখা থাকত, 'ফরাসী ভাষা, সঙ্গীত এবং ধোলাই—অধিকন্তু'।"

অ্যালিস বললে, "সুমুদ্দুরের তলায় তোমার ধোলাইয়ের তেমন দরকারটাই-বা কী হত।"

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নকল কাছিম বললে, "সেটা আর শেখা হয়ে উঠল না আমার, শুধু সাধারণ মামুলি বিষয়গুলো নিয়েই পড়েছিলাম।"

অ্যালিস জিগেস করলে, "সেগুলো কী?"

নকল কাছিম উত্তর দিলে, "প্রথমে ধর, ধপ্ করে পড়া আর হাতের ঠেকা, তার পর ধর গণিতের সব বিভিন্ন ব্যাপার—'রৈখিক নিয়ম,' 'কুটিল মগ্নাংশ,' 'খড়্গমূল,' আর 'বমিকরণ'।"

অ্যালিস বুক ঠুকে বলে ফেললে, "বমিকরণ বলে কোনো কথা শুনি নি। মানে কী?"

গ্রাইফন অবাক হয়ে দুটো থাবাই একসঙ্গে তুলে ফেললে।

সবিস্ময়ে বললে, "অ্যাঁ? বমিকরণ শোন নি কখনো? বশীকরণ কাকে বলে জান নিশ্চয়ই?"

অ্যালিস একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে, "বশীকরণ মানে— মানে—কাউকে—বশীভূত করা।"

গ্রাইফন বললে, "তা হলে, বুঝতেই পারছ, বমিককরণ মানে বমিভূত করা, অর্থাৎ বমি করা! এও যদি মাথায় না-আসে, তা হলে তুমি একেবারে বোকার বেহদ্দ!"

আর কিছু জিগেস করতে ভরসা হল না, অ্যালিস তাই নকল কাছিমের দিকে ফিরে বললে, "আর কী কী পড়তে হত?"

নিজের পাখনায় কড় গুনতে গুনতে নকল কাছিম বললে, "তার পর ছিল 'স্মৃতিনাশ', প্রাচীন এবং আধুনিক; তার পর তোমার 'উদ্‌গোল'; তার পর 'ঝঙ্কন'—ঝঙ্কন শেখাতেন একজন বুড়ো বানমাছ, তিনি সপ্তাহে একদিন করে আসতেন; আমাদের 'ঝঙ্কন' করতে শেখাতেন 'ঢং' করতে শেখাতেন 'কোঁদন' শেখাতেন।"

অ্যালিস বললে, "সেটা কীরকম?"

নকল কাছিম বললে, "আমার দ্বারা হবে না, দেহটা বড়ো শক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রাইফন তো আবার শেখেই নি।"

গ্রাইফন বললে, "সময় পাই নি; তার বদলে প্রাচীন ভাষার গুরু-মশাইয়ের কাছে যেতাম, তিনি হলেন বৃদ্ধ এক কাঁকড়া, হ্যাঁ, কাঁকড়াই তো।"

নকল কাছিম দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, "আমার আর তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। শুনতাম তিনি 'চমৎকৃত' আর 'গালি' পড়াতেন।"

এবার গ্রাইফনের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার পালা। "তাই তো পড়াতেন, পড়াতেনই তো।" বলে দুজনেই থাবা দিয়ে মুখ ঢাকলে।

কথা ঘোরাবার জন্যে অ্যালিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "দিনে কতক্ষণ পড়তে?"

নকল কাছিম বললে, "প্রথম দিন দশ ঘণ্টা, তার পর দিন ন' ঘণ্টা, এইরকম।"

অ্যালিস অবাক হয়ে বললে, "কী অদ্ভুত ব্যবস্থা!"

গ্রাইফন মন্তব্য করলে, "ঐজন্যেই তো ওকে 'পড়া' বলে। দিনে দিনে সময়টা পড়তির দিকে যায় বলেই তো 'পড়া'।"

অ্যালিসের কাছে ব্যাপারটা ভারি নতুন ঠেকল। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার জিগেস করলে, "তা হলে, এগারো দিনের দিন তো ছুটি থাকত?"

নকল কাছিম বললে, "অবশ্যই থাকত।"

অ্যালিস সাগ্রহে জানতে চাইলে, "বারো দিনের দিন কী ব্যবস্থা হত?"

গ্রাইফন কর্তৃত্বের সুরে বললে, "পড়ার কথা আর নয়, ঢের হয়েছে। এবার খুকিকে খেলাধুলোর কথা কিছু শোনাও-না।"

দশম পরিচ্ছেদ

গল্‌দা চিঙড়ির জোড়-বিজোড় নাচ

নকল কাছিম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাখনা-পানা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ-টোখ মুছে অ্যালিসের দিকে চেয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ফোঁপানীর জন্যে মিনিট দুয়েক তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। গ্রাইফন বললে, "গলায় হাড় আটকে গেলে যেমন হয়, তেমনি হয়েছে ওর।" বলে তাকে ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করে দিলে, পিঠে থাবড়া মারতে লাগল। শেষ অবধি নকল কাছিমের গলায় স্বর ফুটল। দু গাল ভাসিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আবার শুরু করলে :

"সুমুদ্দুরের তলায় হয়তো কখনো বেশি দিন তুমি থাক নি—" (অ্যালিস বললে, "না, থাকি নি।") "আর, গল্‌দা চিঙ্‌ড়ির সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগও পাও নি কখনো—" (অ্যালিস বলতে যাচ্ছিল, "একবার চেখে দেখেছি—" কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, "মোটেই না।")—"গল্‌দা চিঙ্‌ড়ির জোড়-বিজোড় নাচ যে কী চমৎকার, সে-সম্বন্ধে তোমার তো কোনো ধারণাই নেই।"

অ্যালিস বললে, "তা তো নেই-ই। কী ধরনের নাচ?"

গ্রাইফন বললে "ধর, প্রথমে সমুদ্রের কূল-বরাবর সার বেঁধে দাঁড়াতে হয়—"

নকল কাছিম বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "দু সারি! সীলমাছ, তার পর কাছিম, এইভাবে; তার পর যখন জেলিফিশগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গাটা সাফ করা হয়ে যাবে—"

গ্রাইফন ফোড়ন কাটলে, "এতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।"

"—তখন, দু পা এগুবে—"

গ্রাইফন চেঁচিয়ে উঠল, "প্রত্যেকে এক-একটা গল্‌দা চিঙড়িকে নেবে দোসর হিসেবে।"

নকল কাছিম বললে, "ঠিক তাই, দু পা করে এগিয়ে গিয়ে নিজের দোসরের সঙ্গে জোড় বাঁধবে—"

গ্রাইফন কথাটা শেষ করলে, "তার পর, যে-যার দোসর বদল করে অন্য চিঙড়ি মাছের সঙ্গে জোড় বেঁধে যেভাবে এগিয়েছিলে, সেইভাবে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আসবে।"

নকল কাছিম বলে চলল, "তখন, গল্‌দা চিঙড়িগুলোকে—"

গ্রাইফন বোমা ফাটার মতো শব্দ করে বললে, "ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

"—সুমুদ্দুরের জলে যত দূরে পার—"

গ্রাইফন তারস্বরে বললে, "তার পর তাদের পেছন পেছন সাঁতরাতে থাকবে!"

নকল কাছিম ক্ষ্যাপার মতো ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে বেড়াতে বললে, "তার পর, সুমুদ্দুরের জলে ডিগবাজি খাবে।"

গ্রাইফন গলা ফাটিয়ে বললে, "আবার গল্‌দা চিঙড়ি বদল করবে।"

নকল কাছিম বললে, "এবার ডাঙায় ফিরে এস; ব্যাস, জোড়-বিজোড় নাচের প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ।" হঠাৎ তার স্বরটা নিচু হয়ে গেল। গ্রাইফন আর সে এতক্ষণ পাগলের মতো লাফিয়ে-দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন আবার খুব দুঃখু দুঃখু ভাব নিয়ে বসে বসে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে রইল চুপচাপ।

অ্যালিস ভয়ে ভয়ে বললে, "নাচটা তো খুব চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে।"

নকল কাছিম বললে, "একটু নমুনা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না-কি?"

অ্যালিস বললে, "খুব ইচ্ছে হচ্ছে।"

নকল কাছিম গ্রাইফনকে বললে, "এস, নাচের প্রথম ফেরটা

নেচে দেখা যাক। গল্‌দা চিঙ্‌ড়ি না-থাকলেও চলবে, বুঝলে? কে গাইবে?"

গ্রাইফন বললে, "তুমিই গাও, আমার কথা-টথা মনে নেই।"

তখন তারা খুব নিবিষ্ট মনে অ্যালিসের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করে দিলে, আর তার খুব কাছ-ঘেঁষে নাচবার সময়ে তার পা মাড়িয়ে দিতে লাগল, ওপরের থাবা নেড়ে নেড়ে তাল দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নকল কাছিম খুব করুণভাবে ধীরে ধীরে গাইলে—

"আরো তাড়াতাড়ি পা চালাও ভাই," খয়রা বললে শামুকে,
"পেছনে শুশুক কেবলই ধাক্কা মারছে ল্যাজের কাছেতে।
দেখ-না, গল্‌দা, কাছিমেরা সব এগিয়ে গিয়েছে সমুখে—
পাড়ে গ্যাছে তারা—যাবে কি সেখানে? যোগ দেবে সেই নাচেতে?"

যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে?
যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে?

"ভাবতে পার না, কতই যে ভালো লাগবে তোমার তখন—
আমাদের ধরে তুলে তুলে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেবে যখন!"
শামুক বলিল, "বহু দূর পথ!" সাধুবাদ দিল মাছে;
অপাঙ্গে চেয়ে জানাল তাহারে—যোগ দেবে না সে নাচে।

দেব না, পারব না, দেব না, পারব না, যোগ দেব নাকো নাচে।
দেব না, পারব না, দেব না, পারব না যোগ দেব নাকো নাচে।

খয়রা-বন্ধু বলিল, "যতই দূর পথ হোক, ক্ষতি নেই,
আরো এক কূল আছে ঐ পারে, ঠিক আমাদের পিছনেই।
ইংলণ্ড থেকে যত দূরে যাবে, ফ্রান্স হবে তত কাছেতে,
ভয় পেয়ো নাকো, প্রিয় সখা মোর, চল, যোগ দাও নাচেতে!"

যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে?
যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে?

অ্যালিস মুখে বললে, "ধন্যবাদ, নাচটা দেখতে খুব ভালো লাগল," মনে মনে ভাবলে- থেমেছে, না বেঁচেছি!—"আর খয়রা মাছের ঐ অদ্ভুত গানটাও তেমনি সুন্দর!"

নকল কাছিম বললে, "খয়রা মাছের কথাই যদি তুললে, তা হলে বলি, ওরা—খয়রা মাছ নিশ্চয়ই দেখেছ?"

অ্যালিস বললে, "হ্যাঁ, কত বার দেখেছি খাবা—" তার পর বাকিটুকু শেষ না করেই সামলে নিলে।

নকল কাছিম বললে, "খাবা জায়গাটা ঠিক কোথায়, জানা নেই, তবে যদি কত বারই দেখে থাক, তা হলে তো জানই ওদের দেখতে কেমন।"

অ্যালিস ভেবে নিয়ে বললে, "তা বোধ হয় জানি; ল্যাজটা মুখের মধ্যে ঢোকান থাকে, আর সারা গায়ে পাঁউরুটির গুঁড়ো খড়্‌খড়্ করে।"

নকল কাছিম বললে, "ঐ পাউরুটির গুঁড়োর কথাটা ঠিক নয়, সুমুদ্দুরের জলে ও-সব তো ধুয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ল্যাজটা মুখের মধ্যেই থাকে; তার কারণ হল—" বলতে বলতে নকল কাছিম হাই তুলে চোখ বন্ধ করে ফেললে। গ্রাইফনকে বললে, "কারণ-টারণগুলো বলে দাও তো, হে।"

গ্রাইফন বললে, "গল্‌দা চিঙড়ির সঙ্গে ওরা নাচতে যাবেই। কাজেই ওদের সুমুদ্দুরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হবেই। তার মানে অনেক দূরে গিয়ে ওদের পড়তে হবেই। কাজেই ওদের ল্যাজগুলো ঠেসে মুখের মধ্যে ঢোকাতে হবেই। কাজেই ওরা ল্যাজটা আর মুখ থেকে বার করতে পারবেই না। এই হল ব্যাপার।"

অ্যালিস বললে, "ধন্যবাদ, ভারি মজার ব্যাপার। খয়রা মাছ সম্বন্ধে এত-সব ব্যাপার কিছুই জানতুম না।"

গ্রাইফন বললে, "যদি চাও, আরো অনেক কথা জানাতে পারি। কেন ওদের খয়রা বলে, জান?"

অ্যালিস বললে, "কখনো ভেবে দেখি নি। কেন?"

গ্রাইফন খুব গম্ভীরভাবে বললে, "জুতো-টুতো পালিশ-টালিশ হয় বলে।"

অ্যালিস ভয়ানক ধাঁধায় পড়ে গেল। অবাক হয়ে গ্রাইফনের কথাটাই আওড়ালে, "জুতো-টুতো পালিশ-টালিশ হয় বলে?"

গ্রাইফন বললে, "কেন? তোমার জুতো পালিশ কর কী দিয়ে? মানে, কিসের দৌলতে তোমার জুতো চক্‌ চক্‌ করে?"

অ্যালিস তার পায়ের জুতো-জোড়াটা দেখে নিয়ে একটু ভেবে বললে, "আমার তো মনে হয় কালো পালিশ দিয়ে।"

ভারী গলায় গ্রাইফন বললে, "সুমুদ্দুরের তলায় খয়েরি রঙ দিয়ে জুতো পালিশ করা হয়। এবার হল তো?"

অ্যালিস খুব কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলে, "জুতোগুলো কী দিয়ে তৈরি?"

গ্রাইফন বেশ একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিলে, "শোল আর হিল্‌-সা দিয়ে। কুচো চিঙড়িও এ কথা জানে।"

গ্রাইফন হঠাৎ অ্যালিসকে বললে, "এবার তোমার কথা কিছু শোনাও দিকিনি।"

অ্যালিস একটু ভয়ে ভয়েই বললে, "আজ সকাল থেকে যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, সেগুলো তোমাদের বলা যেতে পারে, কিন্তু গত কালের কথা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ তখন আমি অন্য মানুষ ছিলাম।"

নকল কাছিম বললে, "বেশ করে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে বল।"

গ্রাইফন অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "না, না! আগে ওর অদ্ভুত ঘটনার কথা শোনা যাক। ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যায় বড্ডো সময় নেয়।"

সেই সাদা খরগোসের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করল অ্যালিস। ওরা দুজন ওর দুপাশে এমন ঘেঁষে এসে বসল আর ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে, আকাশ-পাতাল হাঁ করে এমনভাবে ওর কথা শুনতে লাগল যে, প্রথমটায় কেমন গা শির্‌শির্‌ করতে লাগল, তার পরে অবশ্য ভরসা পেল। সারাক্ষণই বেশ চুপচাপ ছিল ওরা, কিন্তু শোঁয়াপোকাকে সেই বুড়োর কবিতাটা শোনাতে গিয়ে কথাগুলো কেমন সব ভুল-ভাল হয়ে গেল, সেই জায়গাটা যখন শোনাচ্ছে, তখন নকল কাছিম খুব লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে বললে, "ভারি অদ্ভুত তো!"

গ্রাইফন বললে, "যদ্দূর অদ্ভুত হতে পারে।"

নকল কাছিম চিন্তার সুরে বললে, "সমস্তটা অন্যরকম হয়ে গেল! এখন একটা কিছু যদি ও মুখস্থ বলে, তো শুনে দেখি। ওকে কিছু একটা শুরু করতে বল তো।" গ্রাইফনের দিকে চেয়ে এমন-ভাবে কথাটা বললে, যেন অ্যালিসের ওপর তার কর্তৃত্বের অধিকার আছে।

গ্রাইফন বললে, "উঠে দাঁড়াও, সেই কবিতাটা বল—'স্বর শোনা যায়—'।"

অ্যালিস ভাবলে, 'আশ্চর্য! সবাই কেবল হুকুম করছে, আর কবিতা আওড়াতে বলছে। তার চেয়ে ইস্কুলে গেলেই হয়। যাই-হোক, উঠে দাঁড়িয়ে কবিতা বলতে শুরু করলে, কিন্তু তার মাথায় সেই গল্‌দা চিংড়ির নাচের কথাটা এমন চেপে বসে আছে যে, কী বলছে, তা খেয়ালই রইল না; উদ্ভট উদ্ভট সব কথা বেরতে লাগল তার মুখ দিয়ে:

'স্বর শোনা যায় চিংড়ি মাছের, কান পেতে তাই শুনি ঃ
"বড্ডো কড়া ভাজলে আমায়, চুলে লাগাই চিনি।"
হাঁসের যেমন চোখের পাতা, তাহার তেমন নাক,
তাই দিয়ে সে সাফ করে বেল্ট, বোতাম এবং টাক।
বালি যখন শুকনো থাকে, তখন থাকে সুখে,
হাঙর-মাছের নিন্দা সদাই যায় শোনা তার মুখে;
কিন্তু যখন জোয়ার আসে, হাঙর আসে ফিরে,
তখন ভয়ে গলার আওয়াজ মিলায় ধীরে ধীরে।"

গ্রাইফন বললে, "ছোটোবেলায় যেরকম বলতাম মোটেই তার সঙ্গে মিলছে না।"

নকল কাছিম বললে, "আগে অবশ্য কখনো শুনি নি, তবে অসাধারণ আবোল-তাবোল শোনাচ্ছে।"

অ্যালিস কোনো কথা বললে না; দুহাতের ওপর মুখ রেখে ভাবতে লাগল, কোনো দিন কী আর স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু ঘটবে!

নকল কাছিম বললে, "আমি চাই, পুরোটা ব্যাখ্যা করে বোঝান হোক।"

গ্রাইফন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা ও করতে পারবে না। তুমি বরং পরের চরণটা বল।"

নকল কাছিম বললে, "কিন্তু টাক? নাক দিয়ে সে টাক সাফ করবে কী করে?"

অ্যালিস বললে, "নাচের একটা মুদ্রা আর কি।" কিন্তু নিজেরই কেমন ধাঁধা লাগল, তাই অন্য কথা পাড়তে চাইলে।

গ্রাইফন আবার বললে, "কবিতার পরের চরণগুলো বল-না। শুরুটা হচ্ছে এইরকম: 'তার বাগানে···'।"

হুকুম অমান্য করতে অ্যালিসের ভরসা হল না, অথচ বেশ বুঝতে পারলে যে, প্রত্যেকটা কথাই ভুল হবে, তাই কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলে:

'তার বাগানের পাশ দিয়ে যেতে, দেখি এক চোখ দিয়ে,
প্যাঁচা আর চিতা ব্যস্ত রয়েছে পিঠে ভাগাভাগি নিয়ে।
চিতা অনায়াসে গোটা পিঠেটাই তার ভাগে নিলে টানি,
ভাগীদার হয়ে প্যাঁচা পেল শুধ শূন্য সে-ডিশখানি।
খাওয়া শেষ হলে দয়াবান চিতা দেখালে করুণা তার—
ফাউ হিসাবেতে প্যাঁচা পেয়ে গেল চামচেটা উপহার।
চিতাবাঘ নিলে কাঁটা-চামচেটা, নিয়ে নিলে ছুরিটাও,
শেষ করে দিলে ভোজনপর্ব—'

নকল কাছিম বাধা দিয়ে বলে উঠল, "ব্যাখ্যাই যদি না করলে, তা হলে এ-সব মুখস্থ বলে যাওয়ার কী কোনো মানে হয়? এমন দারুণ গোলমেলে জিনিস আমি তো বাপের জন্মে শুনি নি!"

গ্রাইফন বললে, "হ্যাঁ, আমিও তাই বলি, ও-সব বাদ দেওয়াই ভালো।" অ্যালিস তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গ্রাইফন তখনো বলে চলেছে, "তার চেয়ে সেই গল্দা চিঙ্ড়ির জোড়-বিজোড় নাচের আর একটা ফের নেচে দেখাব? না-কি, নকল কাছিমের একটা গান শুনবে?"

অ্যালিস সাগ্রহে বললে, "খুব ভালো কথা, নকল কাছিম যদি দয়া করে শোনান, তা হলে গানই শুনি।" অ্যালিসের উৎসাহ দেখে গ্রাইফন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই বললে, "হুম! বলিহারি পছন্দ! ওহে, সেই 'কাছিমের স্যুপ'-এর গানটা শুনিয়ে দাও তো!"

নকল কাছিম একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুরু করলে—মাঝে মাঝেই কান্নায় তার গলা বুজে যেতে লাগল—

'অতি মনোহর স্যুপ সে সবুজ
সুস্বাদে ভরপুর
হাঁড়ির ভিতরে বিরাজিয়া সবে
করিতেছে লোভাতুর।

এমন ভোজ্য সমুখে ধরিলে
কেবা না-হবে লোলুপ ?
ভোজনের সব সেরা আয়োজন,
অতি মনোহর স্যুপ !
মনো—ওহর স্যু—উপ !
মনো—ওহর স্যু—উপ !
ভোজন—এর স—অব সেরা,
মনোহর, মনোহর স্যুপ !
মনোহর স্যুপ ! মনোহর স্যুপ !
কে বা ধার ধারে মৎস্যের,
মুর্গি অথবা হংস কিম্বা
মোলায়েম ছাগ-বৎসের ?
কে আছে, যাহারে ভুলাবে না এই
রসনা-লোভন রূপ ?
কে আছে এমন, যেবা সব ফেলে
খাবে না এমন স্যুপ ?
মনো—ওহর স্যু—উপ !
মনো—ওহর স্যু—উপ !
ভোজনে—এর স—অব সেরা,
মনোহর, মনো—**হর স্যুপ ?**

গ্রাইফন চীৎকার করে উঠল, "আবার গাও, আমরাও গলা মেলাই !" নকল কাছিম সবে আবার শুরু করেছে, এমন সময়ে হঠাৎ দূর থেকে হাঁক শোনা গেল, "বিচার শুরু হচ্ছে—এ !"

"চলে এস !" বলে গ্রাইফন অ্যালিসের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে দৌড়তে লাগল, গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাও করলে না।

দৌড়ের চোটে হাঁফাতে হাঁফাতে অ্যালিস বললে, "কিসের বিচার হচ্ছে ?" গ্রাইফন শুধু বললে, "চলে এস !" তার পর আরো জোরে দৌড়তে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে অ্যালিসের কানে এল, বাতাসে ভেসে-আসা সেই করুণ সঙ্গীতের রেশটুকু ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে :

'ভোজনে—এর স—অব সেরা
মনোহর, মনোহর স্যুপ !'

একাদশ পরিচ্ছেদ

পেরাকি চুরি করল কে ?

সেখানে পৌঁছে ওরা দেখলে হরতনের রাজা আর রানী সিংহাসন জাঁকিয়ে বসে আছেন, চারিদিকে নানারকম পাখি আর জন্তু-জানোয়ারের ভীড় জমে গেছে, বাহান্নখানা তাস তো আছেই। একদম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাম, বন্দীর মতো শেকল-বাঁধা; দুপাশে দুজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই খরগোসটা, তার এক হাতে একটা ভেঁপু, আর-এক হাতে পাকান একটা বড়ো দলিল। আদালতের ঠিক মাঝখানে টেবিলের ওপর বিরাট একটা ডিশে কয়েকটা চাট্‌নি-ভরা পেরাকি রাখা রয়েছে; এত লোভনীয় চেহারা যে, দেখেই অ্যালিসের খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল, ভাবলে, 'তাড়াতাড়ি বিচারের পালা শেষ করে খাবারগুলো হাতে হাতে দিতে শুরু করলেই তো হয়!' তেমন কোনো লক্ষণ নেই দেখে, সময় কাটাবার জন্যে অ্যালিস চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আগে কখনো অ্যালিস আদালতে যায় নি, তবে বইয়ে পড়েছে। প্রায় সব জিনিসের নাম তার জানা, তাই খুব খুশি হল সে। মনে মনে বললে, 'উনি হলেন জজ, কারণ মাথায় পরচুল রয়েছে।'

জজ হয়েছেন রাজা নিজেই; পরচুলের ওপর মুকুট পরতে হয়েছে বলে বেশ অস্বস্তিতে রয়েছেন তিনি, দেখতেও কিছু একটা খোলতাই হয় নি।
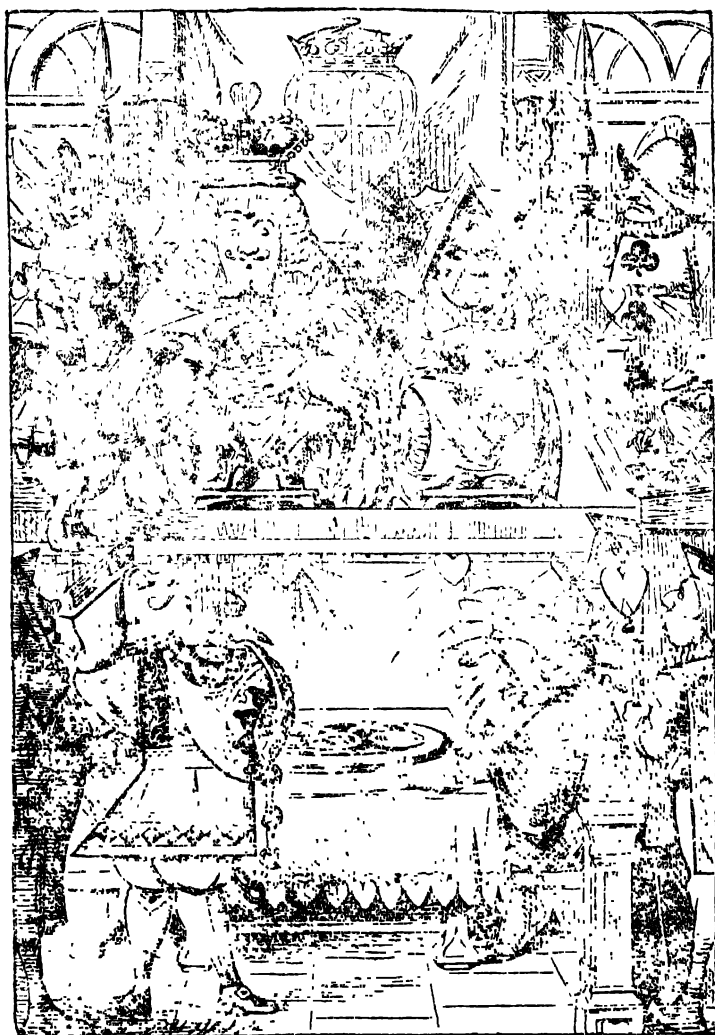
অ্যালিস মনে মনে বললে, 'আর, ঐটা হচ্ছে জুরিদের বসবার জায়গা, যাকে বলে 'জুরি-বক্স', আর ঐ-সব জন্তু-জানোয়ারগুলো হচ্ছে জুরি (জন্তু-জানোয়ার না-বলে উপায় নেই, কারণ জুরিরা কেউ পশু, কেউ পাখি)। ওদের বোধ হয় বলা উচিত 'জুরিবৃন্দ'।' শেষ কথাটা সে বেশ গর্বের সঙ্গে বার দু-তিন আওড়ালে, কারণ সে জানে যে, তার বয়সী অনেক ছেলেমেয়েই এ-সব কথার মানে জানে না।'

বারোজন জুরি খুব ব্যস্ত হয়ে শ্লেটে কী সব লিখে চলেছে। অ্যালিস গ্রাইফনকে জিগেস করলে, "কী করছে ওরা? বিচার শুরু হবার আগে আবার লেখবার কী হল?"

গ্রাইফন তার কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "নিজের নিজের নাম লিখছে, পাছে বিচার শেষ হবার আগে ভুলে যায়।"

অ্যালিস বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করেছে, "যত্ত সব ক্যাবলামী!" এমন সময়ে সাদা খরগোস চেঁচিয়ে উঠল, "আদালতে আর কোনো কথাবার্তা চলবে না, সব চুপ করুন!" রাজামশাই চোখে চশমা আঁটলেন, তার পর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলেন কেউ কথা বলছে কি-না।

জুরিদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে যতটুকু দেখা যায়, তাতে অ্যালিস দেখতে পেলে জুরিরা সবাই তাদের শ্লেটে লিখছে, "যত্ত সব ক্যাবলামী!" আর এও চোখে পড়ল যে, ওদের মধ্যে একজনের আবার, 'ক্যাবলামী' বানানটা ঠিকমতো জানা না থাকায়, পাশের জুরিকে জিগেস করে জেনে নিলে। অ্যালিস ভাবলে, 'বিচার শেষ হতে হতে এদের শ্লেটের কী দশাই-না হবে।'

লেখবার সময়ে একজনের পেন্সিল থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ বেরচ্ছিল। এই ধরনের শব্দ আবার অ্যালিস একদম সইতে পারে না, তাই সবাইকে পাশ-কাটিয়ে সে সেই জুরির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। খানিক বাদেই সুযোগ বুঝে তার হাতের পেন্সিলটা টপ্ করে তুলে নিলে। এমন ধাঁ করে কাজ সারলে যে, জুরি বেচারা (সেই টিকটিকি—বিল্) কিছু ঠাওর করতে পারলে না; খানিক এদিক-ওদিক হাতড়ে বাধ্য হয়ে তার পর থেকে সারাক্ষণ আঙুল দিয়ে লেখার কাজ চালালে। তাতে অবশ্য লাভ কিছুই হল না, কারণ শ্লেটের গায়ে কোনো দাগই পড়ল না।

রাজা বললেন, "নকীব! অভিযোগ পড়ে শোনাও!"

তাই শুনে ভেঁপুতে তিনবার আওয়াজ তুলে হাতের পাকান কাগজটা মেলে ধরে খরগোসটা পড়লে—

"মহারানী হরতন, দুপুরে করে যতন
গড়িলেন পেরাকি প্রচুর।
গোলাম তা চুরি করে, ঝটিতে পড়িল সরে
রাজবাড়ি হতে বহু দূর।"

রাজা জুরিদের বললেন, "আপনারা ভেবে চিন্তে এবার রায় দিন।"

খরগোস বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এখন নয়, এখন নয়! জুরিদের অভিমত দেবার আগে অনেক সব ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে!"

রাজা বললেন, "প্রথম সাক্ষীকে ডাকা হোক। খরগোস অমনি ভেঁপুতে তিনবার পোঁ পোঁ আওয়াজ করে, হাঁক পাড়লে, "প্রথম সাক্ষী হাজি—র!"
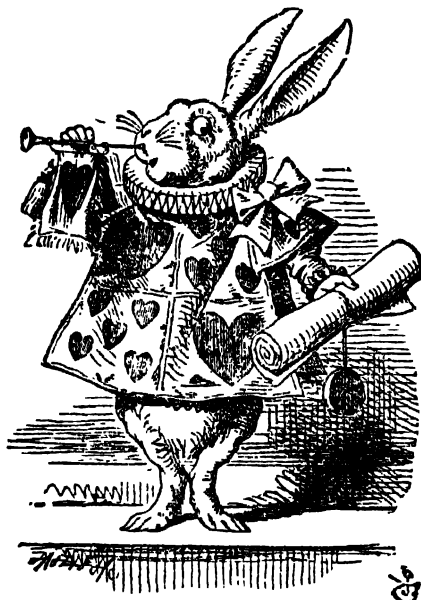
প্রথম সাক্ষী হল সেই টুপিওলা। একহাতে চায়ের পেয়ালা, আর অন্য হাতে এক টুকরো মাখন-রুটি নিয়ে সে ঢুকল। প্রথমেই বললে, "মাফ করবেন, মহারাজ, এই-সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি বলে মাফ করবেন; আমায় যখন ডেকে পাঠান হল, তখন আমার খাওয়া শেষ হয় নি।"

রাজা বললেন, "শেষ করা উচিত ছিল। শুরু করেছিলে কখন?"

চৈতী খরগোসটাও গেছোইঁদুরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে তার পিছু পিছু আদালতে ঢুকেছে; তার দিকে চেয়ে টুপিওলা বললে, "চোদ্দোই চৈত্র—তাই-ই হবে মনে হচ্ছে।"

চৈতী খরগোস বললে, পনেরোই।”

গেছোইঁদুর ফোড়ন দিলে, “ষোলোই।”

রাজা জুরিদের বললেন, “লিখে নিন”। আর সঙ্গে সঙ্গে জুরিরা মন দিয়ে যে-যার শ্লেটে তিনটে তারিখই লিখে ফেললে, সংখ্যা তিনটে যোগ দিলে, তার পর যোগফলটাকে শিলিঙ্ আর পেন্স-এ নিয়ে গেল।

রাজা টুপিওলাকে বললেন, “টুপি খোল।”

টুপিওলা বললে, “টুপিটা আমার নয়।”

জুরিদের দিকে ফিরে রাজামশাই গর্জে উঠলেন, “চোরাই মাল!” জুরিরাও অমনি কথাটা টুকে নিলে।

ব্যাপারটা খোলসা করবার চেষ্টা করে টুপিওলা বললে, “আমার সব টুপিই বিক্রির জন্যে, একটাও নিজের জন্যে নয়। আমি টুপিওলা।”

এই সময়ে মহারানী চোখে চশমা এঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টুপিওলার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, টুপিওলা ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

রাজা বললেন, “প্রমাণ বাৎলাও; আর দ্যাখ, ঘাবড়ে গিয়ে অমন কর না, তা হলে একেবারে এইখানেই তোমাকে জবাই করা হবে।”

এতে সাক্ষী বেচারা ভরসা পেলে বলে মনে হল না; একবার এ-পা, আর একবার ও-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, বারে বারে সন্ত্রস্তভাবে মহারানীর দিকে তাকাতে লাগল, আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাখন-রুটির বদলে চায়ের পেয়ালা থেকে বেশ বড়ো একটা টুকরো কামড়ে খেয়ে ফেললে।

ঠিক সেই সময়ে অ্যালিস টের পেলে, তার মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু ঘটছে। বেশ ধাঁধাঁয় পড়ে গেল প্রথমটায়, তার পর বুঝতে পারলে যে, আবার সে লম্বা হয়ে যাচ্ছে! গোড়ায় ভাবলে, আদালত থেকে উঠে চলে যায়; তার পরে ঠিক করলে যে, যতক্ষণ জায়গায় কুলোবে, ততক্ষণ সেখানেই থাকবে, নড়বে না।

তার পাশে বসেছিল গেছোইঁদুরটা, সে বললে, “আমাকে ওরকম ঠেসে না-ধরলেই নয়! নিশ্বাস বন্ধ হবার দাখিল হল যে!”

অ্যালিস খুব নম্রভাবে বললে, “উপায় নেই, আমি বড়ো হয়ে যাচ্ছি।’

গেছোইঁদুর বললে, "তা এখানে কেন? এখানে বাড়াবাড়ি করবার কোনো এক্তিয়ারই নেই তোমার।"

অ্যালিস এবার একটু কড়া হয়েই বললে, "বাজে বকো না তো, তুমিও তো বাড়ছ, জান না?"

গেছোইঁদুর বললে, "তা বাড়ছি, তবে তার একটা মাত্রা আছে, তোমার মতো উদ্ভুট্টে রকমের নয়।" তার পর চটে-মোটে সেখান থেকে উঠে অন্য দিকে চলে গেল।

মহারানী কিন্তু তখনো একদৃষ্টিতে টুপিওলার দিকে তাকিয়ে আছেন। গেছোইঁদুর যখন আদালতের এদিক থেকে ওদিকে গেল, তখন তিনি আদালতের একজন কর্মচারীকে বললেন, "গতবারের জলসায় যারা যারা গান করেছিল, তাদের নামের লিস্টিটা নিয়ে এস!" শুনে টুপিওলা বেচারি এমন থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল যে দুটো জুতোই খসে পড়ল তার পা থেকে।

রাজা খুব রেগে আবার বললেন, "প্রমাণ দাখিল কর, নাহলে তোমায় জবাই করা হবে, ঘাবড়ে গেলেও হবে, না-গেলেও হবে।" টুপিওলা কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলে, "আমি বড়ো গরিব, মহারাজ—তখনো চা খেতে শুরুই করি নি--হপ্তাখানেকের বেশি হবে

না—তা ছাড়া, রুটি-মাখন ক্রমশই বড়ো পাৎলা-পাৎলা হয়ে যাচ্ছিল —তার পর চায়ের চম্‌কানি—"

রাজা বললেন, "কিসের চম্‌কানি?"

টুপিওলা বললে, "আজ্ঞে, চম্‌কানিটার সূত্রপাত হল চায়ে।"

রাজামশাই খ্যাঁক করে উঠলেন, "চম্‌কানির সূত্রপাত 'চা' নয় 'চ' দিয়ে! আমায় কি বুদ্ধু পেয়েছ না-কি? তার পর বলে যাও!"

টুপিওলা বলতে লাগল, "আমি, বড়ো গরিব; তার পর থেকে প্রায় সমস্ত কিছুই চম্‌কে উঠতে লাগল—কেবল চৈতী খরগোস বললে—"

চৈতী খরগোস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, "মোটেই আমি বলি নি!"

টুপিওলা বললে, "হ্যাঁ বলেছ!"

চৈতী খরগোস বললে, "আমি অস্বীকার করছি!"

রাজা বললেন, "ও অস্বীকার করছে, এ-প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হোক।"

টুপিওলা বললে, "বেশ, তা হলে নাহয়, গেছোইঁদুরই বললে—" বলতে বলতে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘুরে দেখে নিলে গেছোইঁদুরটাও আবার অস্বীকার করে কি-না; তবে গেছোইঁদুর কোনো কিছুই অস্বীকার করলে না, কারণ সে তখন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে।

টুপিওলা বলে যেতে লাগল, "তার পর, আমি আরো কটা রুটি কেটে নিয়ে মাখন লাগালুম—"

একজন জুরি প্রশ্ন করলে, "কিন্তু, গেছোইঁদুর কী বললে?"

টুপিওলা বললে, "ভুলে গেছি।"

রাজা বললেন, "মনে কর, নইলে গর্দান যাবে।'

চায়ের পেয়ালা, আর মাখন-রুটি খসে পড়ে গেল বেচারা টুপিওলার হাত থেকে, এক পা ভেঙে হাঁটুগেড়ে বসে বললে, "আমি বড়োই গরিব মহারাজ! বড্ডো টানাটানি আমার!",

রাজা বললেন, "কথাবার্তায় তোমার যে খুবই টানাটানি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

এই সময়ে একটা গিনিপিগ্ বাহবা দিয়ে চীৎকার করে উঠতেই আদালতের কর্মচারীরা তাদের অবদমন করলে। ('অবদমন' কথাটা বড্ডো কড়া, তাই খুলে বলি, কী ভাবে সেটা করা হল: কর্মচারীদের কাছে ছিল মস্ত একটা ক্যাম্বিসের থলে, তার মুখে দড়ি বাঁধা;

ওরা গিনিপিগটাকে মাথা নিচু করে তার মধ্যে পুরে দিয়ে থলেটার ওপর চেপে বসে রইল।)

অ্যালিস ভাবলে, 'কাগজে প্রায়ই দেখেছি, লেখা থাকে, বিচারের শেষে 'চেঁচিয়ে বাহবা দেবার প্রয়াস দেখা যাইতেই আদালতের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহা অবদমন করিলেন' ; কিন্তু আগে তার মানে বুঝতে পারতুম না। এখন ভাগ্যিস চোখের সামনেই দেখতে পেলুম।'

রাজা টুপিওলাকে তখন বলছেন, "এ ছাড়া আর কিছু যদি তোমার জানা না-থাকে, তা হলে নেমে দাঁড়াতে পার।"

টুপিওলা বললে, "মাটিতেই তো দাঁড়িয়ে আছি, আর কোথায় নামব ?"

রাজা বললেন, "তা হলে বসে পড়তে পার।"

এই সময়ে অন্য-সব গিনিপিগরা চেঁচিয়ে বাহবা দিয়ে উঠতেই, তাদেরও অবদমন করা হল।

অ্যালিস ভাবলে, 'যাক, গিনিপিগের পালা শেষ! এবার নিশ্চিন্তে কাজ এগোবে।'

রানী জলসার গাইয়েদের নামের লিস্টি পড়ছিলেন, আশঙ্কাভরা চোখে তাঁর দিকে দেখে নিয়ে টুপিওলা বললে, "আমি বরং চা-টা শেষ করি।"

রাজা বললেন, "তুমি যেতে পার।" আর সঙ্গে সঙ্গে টুপিওলা এক দৌড়ে আদালতের বাইরে ; জুতো পরবারও তর সইল না।

রাজার কথার খেই ধরে রানী সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্মচারীকে বললেন, "বাইরে গিয়ে ওর গর্দানটা নিয়ে নাও গে।" কিন্তু কর্মচারীটি দরজার কাছে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই টুপিওলা হাওয়া হয়ে গেছে।

রাজা বললেন, "পরের সাক্ষীকে ডাক!"

পরের সাক্ষী হল জমিদারগিন্নীর রাঁধুনী। তার হাতে মরিচের কৌটো রয়েছে। সে আদালতে ঢোকবার আগেই, দরজার কাছাকাছি যারা ছিল, তাদের সবাইকে একসঙ্গে হাঁচতে শুনে অ্যালিস বুঝতে পারলে যে, তিনিই আসছেন।

রাজা বললেন, "তোমার সাক্ষ্য দাও।"

রাঁধুনি বললে, "দেব না।"

রাজা চিন্তাকুলভাবে সাদা খরগোসের দিকে তাকাতেই সে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "মহারাজ, একে জেরা করা দরকার।"

খুব করুণ গলায় রাজা বললেন, "তা, যদি করতেই হয়, তো করব।" তার পর বুকের ওপর দুহাত বগল-দাবা করে রাধুনীর দিকে এমন ভুরু কুঁচকে তাকাতে লাগলেন যে, শেষপর্যন্ত তাঁর চোখদুটো ভুরুর তলায় ঢাকা পড়ে গেল। তখন বললেন, "পেরাকি তৈরি হয় কী দিয়ে?"

রাঁধুনী বললে, "প্রধানত মরিচ দিয়ে।"

তার পেছন থেকে অমনি ঘুমঘুম গলায় আওয়াজ এল, "ঝোলা গুড় দিয়ে।"

রানী চীৎকার করে বললেন, "গেছোইঁদুরটার গলায় বকলস পরিয়ে দাও, গেছোইঁদুরকে কোতল কর! গেছোইঁদুরকে আদালত থেকে দূর করে দাও। ওকে অবদমন কর। ওকে চিম্‌টি কাট! ওর গোঁফ ছেঁটে দাও!"

গেছোইঁদুরকে আদালত থেকে বার করবার সময়ে কয়েক মিনিট ধরে সারা আদালত জুড়ে হট্টগোল চলতে লাগল, তার পর আবার যখন সব শান্ত হল, তখন দেখা গেল রাঁধুনির কোনো পাত্তা নেই।

হাঁফ ছেড়ে বেশ নিশ্চিন্ত গলায় রাজা বললেন, "যাক্ গে মরুক গে, এর পরের সাক্ষীকে ডাক।" সঙ্গে সঙ্গে নিচু গলায় মহারানীকে বললেন,

"সত্যি বলছি গো, এর পরের সাক্ষীকে তুমিই জেরা ক'র। জেরা করলে আমার মাথা ধরে যায়!"

সাদা খরগোসটা নামের লিস্টিতে চোখ বোলাতে বোলাতে মাঝে মাঝে থম্‌কে পড়ছে, আর, অ্যালিস তাই দেখতে দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাবছে যে, পরের সাক্ষীটি কেমন হবে কে-জানে; ভাবছে, 'এখনো পর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশেষ কিছুই তো পাওয়া গেল না।' এমন সময়ে—কী আর বলব তোমাদের—সাদা খরগোসটা তার সরু একরত্তি গলায় প্রাণপণে চীৎকার করে হাঁক দিলে—"অ্যালিস!" অ্যালিস তো আকাশ থেকে পড়ল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অ্যালিসের সাক্ষ্য

"এই যে!" বলে চেঁচিয়ে সাড়া দিলে অ্যালিস। তালেগোলে খেয়ালই রইল না যে, ইতিমধ্যে কতখানি বড়ো হয়ে গেছে সে। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তার ঘাগরার কোনায় লেগে জুরিদের খুপ্‌রিটা উল্টে পড়ে গেল, আর জুরিরা সব্বাই ঘাড় গুঁজড়ে পড়ল নীচের ভীড়ের মধ্যে, তার পর সেখানেই কিলবিল করতে লাগল। হপ্তাখানেক আগে লাল-মাছের একটা কাঁচের জার উল্টে ফেলেছিল অ্যালিস—ঠিক সেই মাছেদের মতো দশা।

অ্যালিস সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, "ছি, ছি! খুব অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করবেন!" বলে তাড়াতাড়ি তাদের মাটি থেকে তুলতে লাগল, কারণ সেই লাল-মাছের ঘটনার পর থেকে ওর কেমন একটা ধারণা হয়েছে যে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তুলে আবার খুপ্‌রিতে পুরে না-দিলে, ওরা বাঁচবে না।

রাজামশাই খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "জুরিরা যথাস্থানে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত বিচারের কাজ চলা সম্ভব নয়—সমস্ত জুরিরা।" শেষের কথাদুটো বিশেষ জোর দিয়ে বললেন তিনি, কঠিন চোখে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে।

জুরি-বক্সের দিকে তাকিয়ে অ্যালিস দেখতে পেলে যে, তাড়াতাড়িতে

সে টিকটিকিটাকে উল্টোবাগে বসিয়ে ফেলেছে, আর, সে বেচারা নড়াচড়া করতে পারছে না বলে অত্যন্ত করুণভাবে ল্যাজ নাড়াচ্ছে। অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে ঠিক করে বসালে। মনে মনে ভাবলে, 'বিশেষ কিছু আসে-যায় না অবশ্য। সোজাই হোক, আর উল্টোই হোক, বিচারের কী কাজেই-বা লাগছে ওরা!'

আচম্‌কা উল্টে পড়ে যাওয়ার ফলে জুরিরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল; সেটা কেটে যাবার পর তাদের শ্লেট আর পেন্সিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে যার-যার হাতে ফেরত দিতেই, তারা অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে পুরো ঘটনাটার একটা বিবরণ লিখে ফেলতে আরম্ভ করে দিলে। কেবল টিকটিকিটা পারলে না; তখনো সে কেমন-ধারা হয়ে রয়েছে, হাঁ করে আদালতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

রাজা অ্যালিসকে জিগেস করলেন, "এ-ব্যাপারে কী জান তুমি?"

অ্যালিস বললে, "কিচ্ছু না।"

রাজা আবার বললেন, "একেবারে কিছুই না?"

অ্যালিস বললে, "একেবারে কিছুই না।"

জুরিদের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, "এটা খুব দরকারি কথা।" জুরিরা কথাটা শ্লেটে টুকে নিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে সাদা খরগোস বাধা দিয়ে বললে, "মহারাজ নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছেন—অ-দরকারি কথা।" বেশ সম্ভ্রমের গলায় বললে অবশ্য, কিন্তু বলবার সময়ে রাজার দিকে ভুরু নাচিয়ে মুখ ভ্যাঙচালে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, অ-দরকারি-ই তো বলতে চেয়েছিলাম আমি।" তার পর বিড়্‌বিড়্ করে বলতে লাগলেন, "দরকারি—অদরকারি—দরকারি—অদরকারি—দরকারি—অদরকারি," যেন দেখতে চান, কোন কথাটা শুনতে ভালো।

কোনো জুরি লিখে নিলে 'দরকারি', কোনো জুরি লিখলে 'অদরকারি'। অ্যালিস সেটা দেখতে পেলে, কারণ ও কাছেই ছিল। মনে মনে ভাবলে, 'কীই-বা আসে-যায়!'

রাজা এতক্ষণ খুব ব্যস্ত হয়ে তাঁর নোটবইয়ে খস্‌খস্ করে কী সব লিখছিলেন, এখন হাঁকলেন, "চুপ কর সব!" তার পর নোট-বই থেকে পড়ে শোনালেন, "বিয়াল্লিশ নম্বর কানুন—এক মাইলের চেয়ে বেশি লম্বা যারা, তারা আদালত থেকে বেরিয়ে যাবে।"

সবাইয়ের চোখ পড়ল অ্যালিসের দিকে।

অ্যালিস বললে, "আমি এক মাইল লম্বা নই।"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, এক মাইল লম্বা।"

রানী ফোড়ন কাটলেন, "দু মাইলের কাছাকাছি।"

অ্যালিস বললে, "মোট কথা, আমি এখান থেকে নড়ছি না। তা ছাড়া, ওটা মোটেই কোনো সাধারণ নিয়ম নয়, আপনি এক্ষুনি এক্ষুনি বানালেন।"

রাজা বললেন, "কেতাবের সবচেয়ে পুরনো নিয়ম এটা।"

অ্যালিস বললে, "তা হলে তো এক নম্বর কানুন হত।"

রাজামশাই ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে তাড়াতাড়ি নোটবই বন্ধ করে দিলেন। তার পর কাঁপা কাঁপা মৃদু গলায় জুরিদের বললেন, "বিবেচনা করে রায় দিন।"

সাদা খরগোসটা ব্যাস্ত-সমস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে বললে, "মাফ করবেন মহারাজ, আরো সব সাক্ষ্য প্রমাণ বাকি রয়েছে। এই কাগজটা এইমাত্র পাওয়া গেল।"

রানী বললেন, "কী আছে ওতে?"

সাদা খরগোস বললে, "এখনো খুলে দেখি নি, তবে মনে হচ্ছে, এটা একটা চিঠি, বন্দী আসামী লিখেছে—কাকে যেন লিখেছে।"

রাজা বললেন, "তা তো হতেই হবে, কাউকে-না-কাউকে না-লিখলে তো নেই-লোককে চিঠি লিখতে হয়; সেটা সচরাচর হয় না, জান তো।"

একজন জুরি জিগেস করলে, "কাকে পাঠান হয়েছে?"

সাদা খরগোস বললে, "কাউকেই পাঠান হয় নি। আসলে বাইরের দিকে কিছু লেখাই নেই।" তার পর কাগজের ভাঁজ খুলে বললে, "আসলে এটা চিঠিই নয়, ছড়া।"

আর একজন জুরি প্রশ্ন করলে, "হাতের লেখাটা কি বন্দীর?"

সাদা খরগোস বললে, "না, তা নয়। আর সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার।" (জুরিরা সবাই ধাঁধায় পড়ে গেল।)

রাজা বললেন, "নিশ্চয় ও অন্য কারও হাতের লেখা নকল করেছে।" (জুরিরা সব আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল।)

গোলাম বললে, "দয়া করুন মহারাজ! ওটা আমার লেখা নয়, ওরা প্রমাণ করতেও পারবে না যে, আমি লিখেছি; তলায় তো কোনো নাম সই করা নেই।"

রাজা বললেন, "যদি সই না করে থাকো, তা হলে ব্যাপারটা আরো গুরুতর হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব ছিল তোমার মাথায়, তা না হলে সৎ লোকের মতো নাম সই করতে।"

এই কথায় চারিদিকে হাততালির ধুম পড়ে গেল; সারাদিনে এই প্রথম একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বেরিয়েছে মহারাজের মুখ থেকে।

রানী বললেন, "এতেই ওর অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে!"

অ্যালিস বললে, "এতে কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না! কাগজে কী লেখা আছে, তাই-ই তো জানেন না আপনারা!"

রাজা বললেন, "ছড়াগুলো পড়ে শোনাও।"

সাদা খরগোস নাকে চশমা এঁটে নিয়ে বললে, "আজ্ঞে, কোন জায়গা থেকে আরম্ভ করব, মহারাজ?"

রাজা গম্ভীরভাবে বললেন, "শুরু থেকে আরম্ভ করে, শেষ অবধি পড়, তার পর থাম।"

সাদা খরগোস পড়লে :

"তারা বলে তুই নাকি গিয়েছিলি তাঁর কাছে
আমার বিষয়ে বাৎলাতে
বলেছিলি মোর না-কি আর সব গুণ আছে,
কেবল পারি না সাঁৎরাতে
সে তাদের বলেছিল, আমি সেথা যাই নাই
(জানি মোরা, ভুল নেই তায়)
অল্পেতে তিনি যদি রেহাই না-দেন, ভাই,
তোর কী যে দশা হবে, হায় !

"দিনু তাঁরে একখানি তারা তাকে দিল দুটি,
তিন দিলি আমাদের ভাগে।
তার কাছ থেকে সব তোর কাছে গেল জুটি,
যদিও আমার ছিল আগে।
আমি আর তিনি যদি, পোড়া কপালের দোষে,
এ-ব্যাপারে কভু পড়ি জড়িয়ে
আমাদের মতো সবে ছেড়ে দিতে বলত সে
তোর ওপর বিশ্বাস করিয়ে।

"আমার ধারণা ছিল বরাবর মনেপ্রাণে
(তখনো হন নি তিনি রেগে খুন)
সে এবং আমরা ও ইহাটির মাঝখানে
বাধা দিতে তুই অতি সুনিপণ।
সে যেন শোনে না, তাঁর লেগেছে চমৎকার !
গোপনে হয়েছে এটা সারা।
এ কথা জানে না যেন ওরা, তারা, কেহ আর
শুধু এক তুই, আমি ছাড়া।"

রাজা হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, "এখনো পর্যন্ত যে-সব

সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা গেল, এটাই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই জুরিমহোদয়গণ এবার—"

অ্যালিস বললে, (ইতিমধ্যে সে এত বড়ো হয়ে গেছে যে, স্বয়ং রাজার কাজেও বাধা দিতে পেছপা নয়) "জুরিদের একজনও কেউ যদি ছড়াটার মানে বলতে পারে, আমি তাকে পয়সা দেব।"

জুরিরা সবাই নিজের নিজের শ্লেটে লিখে ফেললে, "এর মধ্যে এক কণাও অর্থ আছে বলে মেয়েটা মনে করে না।" কিন্তু কেউই তার মানে বার করবার চেষ্টা করলে না।

রাজা বললেন, "মানে যদি না-ই থাকে, তা হলে আমাদের অনেক খাটুনি বেঁচে গেল, বুঝলে কি-না, কারণ, তা হলে মানে বার করবার চেষ্টা না করলেও চলবে।" তার পর ছড়া লেখা কাগজটা কোলের ওপর বিছিয়ে একটা চোখ সেইদিকে রেখে আবার বললেন, "কিন্তু, তবু ঠিক বলা যাচ্ছে না। একটা অর্থ যেন পাচ্ছি পাচ্ছি মনে হচ্ছে আমার। '—কেবল পারি না সাঁৎরাতে—' তুমি সাঁতার কাটতে পার না তো?" শেষ কথাটা বললেন গোলামের দিকে ফিরে।

গোলাম বেশ দুঃখের সঙ্গেই মাথা নাড়লে। বললে, "আমায় দেখে কি তাই মনে হয় হুজুর?" (মনে তো হয়ই না, শক্ত কাগজ দিয়ে তো তৈরি!)

"বেশ, এপর্যন্ত ঠিক আছে।" বলে রাজামশাই ছড়াগুলো বিড়্ বিড়্ করে আওড়াতে আওড়াতে মন্তব্য করতে লাগলেন "—'জানি মোরা, ভুল নেই তায়—' তার মানে নিশ্চয়ই জুরিরা; '—দিনু তাঁরে একখানি, তারা তাকে দিল দুটি—' আরে, এত বেশ বোঝাই যাচ্ছে যে, পেরাকি নিয়ে সে এই কাণ্ডই করেছে—"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু তার পরেই যে রয়েছে '—তার কাছ থেকে সব তোর কাছে গেল জুটি—'।"

টেবিলের ওপরে পেরাকির থালার দিকে দেখিয়ে রাজা বিজয়গর্বে বলে উঠলেন, "ঐ তো, সামনেই তো রয়েছে! এর চেয়ে জলের মতো সোজা আর কী হতে পারে। তার পর এই যে '—তখনো হন নি তিনি রেগে খুন—' হ্যাঁগা, তুমি কখনো খুন হয়েছ বলে তো আমার মনে পড়ে না?" শেষের কথাটা রানীকে বলা হল।

রানী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "কখখনো না!" বলার

সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির দিকে তাগ করে একটা কালির দোয়াত ছুঁড়ে মারলেন। (বেচারি বিল্ আঙুল দিয়ে লেখা যাচ্ছে না দেখে লেখার চেষ্টা না করে চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ; এখন ঝট্ করে আবার লেখায় হাত দিলে—মুখচোখ বেয়ে কালি গড়াচ্ছিল, সেই কালি দিয়েই কাজ সারতে লাগল, যতক্ষণ পারলে।)

রাজা বললেন, "তা হলে এই-সব কথা তোমার গুণের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।" বলে মুচকি হেসে আদালতের চারিদিকে তাকালেন। টুঁ শব্দটি শোনা গেল না।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রাজা বললেন, " 'খুন' আর 'গুণ' কেমন মিল করলুম!" এবার সব্বাই হেসে উঠল।

রাজা বললেন, "জুরি-মহোদয়গণ এবার বিবেচনা করে রায় দিন।" এই নিয়ে বার কুড়ি বলা হল।

রানী বললেন, "না, না! আগে দণ্ড, তার পর রায়।"

অ্যালিস চেঁচিয়ে বললে, "আগে দণ্ড আবার কী? যত্ত সব আবোল-তাবোল কাণ্ড, মাথা-মুণ্ডু কিছু নেই!"
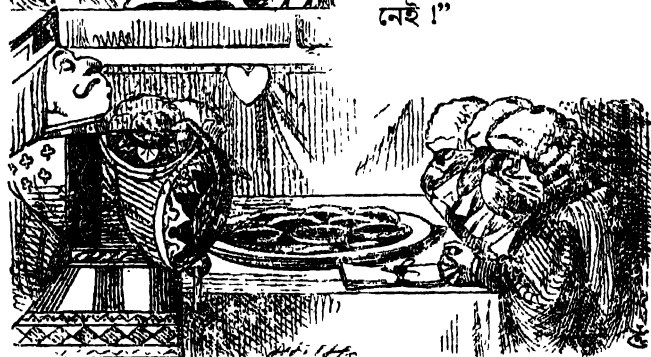
রানী লাল হয়ে বললেন, "মুখ সামলে !"

অ্যালিস বললে, "বয়ে গেছে !"

রানী তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, "ওকে কোতল কর।" কেউ নড়ল না।

অ্যালিস বললে, (এতক্ষণে নিজের আসল চেহারার মাপের হয়ে গেছে সে) "ভারি তো এক গোছা তাস ! কে তোমাদের তোয়াক্কা করে ?"

এই কথা বলতেই সবকটা তাস শূন্যে উঠে অ্যালিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ; খানিকটা ভয়ে আর খানিকটা রাগে একটা

তীক্ষ্ণ আওয়াজ বার হল তার গলা দিয়ে, হাত দিয়ে ওদের ঠেকাতে চেষ্টা করলে, আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেলে—দিদির কোলে মাথা রেখে সেই মাঠের ওপর সে শুয়ে রয়েছে, গাছের ঝরা-পাতা উড়ে উড়ে এসে পড়েছে তার মুখে, দিদি আস্তে আস্তে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছে।

দিদি বললে, "অ্যালিসরানী, উঠে পড়! বাব্বা, কী ঘুম ঘুমোলে!'

অ্যালিস বললে, "ওঃ, কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম, দিদি!" তার পর যতটা মনে এল, সব তার দিদিকে বললে—এতক্ষণ তোমরা যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার কথা পড়লে, সেই-সব কথা। যখন বলা শেষ হল, তখন দিদি তাকে চুমো খেয়ে বললে, "সত্যিই খুব অদ্ভুত স্বপ্ন তো; এবার কিন্তু, ছুট্টে বাড়ি গিয়ে চা খেয়ে নাও, দেরি হয়ে গেছে।" কাজেই অ্যালিসকে বাড়ির দিকে ছুটতে হল, ছুটতে ছুটতে ভাবতে লাগল, কী চমৎকার স্বপ্নটা!

তার দিদি কিন্তু যেমনকার তেমনি বসে রইল সেখানে; হাতের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল তার ছোট্টো বোনটির কথা, তার স্বপ্নের অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা। ভাবতে ভাবতে সেও একধরনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলে—

প্রথমে দেখলে ছোট্টো অ্যালিসকে; তেমনি করে তার দিদির হাঁটুর ওপর কচিকচি হাত দুটো জড়ো করে রেখেছে, জ্বলজ্বলে বড়ো-বড়ো চোখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে; অ্যালিসের গলার মিষ্টি স্বরটুকু কানে এল তার, পরিষ্কার দেখতে পেলে, চোখের ওপর কেবল-কেবল চুল এসে পড়ছে বলে অ্যালিস ঠিক সেইরকম ছোট্টো করে অদ্ভুতভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে—অ্যালিসের কথা তখনো তার কানে আসছে—মনে হচ্ছে যেন কানে আসছে—সেই-সব কথা শুনতে শুনতে তার আশ-পাশের সমস্ত জায়গাটা ছোট্টো অ্যালিসের স্বপ্নে-দেখা সেই-সব অদ্ভুত অদ্ভুত পশু-পাখির জটলায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

সাদা খরগোসটা দৌড়ে চলে যেতেই পায়ের কাছের ঘাসগুলো খস্‌খস্ করে উঠল—পাশের পুকুরটায় আতঙ্কিত নেংটিইঁদুর ছপ্‌ছপ্ করে সাঁতার কাটতে লাগল—অন্তহীন চায়ের আসরে চৈতী খরগোস আর তার স্যাঙাৎদের চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ কানে এল, কানে এল হতভাগ্য অতিথিদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে মহারানীর তীক্ষ্ণ

চীৎকার—জমিদারগিন্নীর কোলে শুয়োর-বাচ্ছাটা আবার হাঁচতে শুরু করলে, তার চারিপাশে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাসনপত্র পড়তে লাগল—গ্রাইফনের তারস্বর, টিকটিকির পেন্সিলের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ, 'অবদমিত' গিনি-পিগদের দম বন্ধ হবার আওয়াজ, আর তার সঙ্গে চিরদুঃখী নকল কাছিমের দূর থেকে ভেসে-আসা ফোঁপানির শব্দ মিলে সেখানকার আকাশ-বাতাস যেন ভরপুর হয়ে উঠল।

দিদি চোখ বন্ধ রেখে বসেই রইল সেখানে, আধো বিশ্বাস নিয়ে থেকে গেল সেই আজব দেশে; সে তো জানে যে, চোখের পাতাটুকু ফাঁক করলেই আবার ফিরে দেখা দেবে সেই একঘেয়ে পুরনো জগৎ—বাস্তব জগৎটা—দেখা যাবে, ঘাসগুলো নড়ছে বাতাসে, কাছের পুকুরটায় জলের শব্দ উঠছে নল খাগড়া দুলে উঠছে বলে—চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ হয়ে যাবে ভেড়ার গলার ঘন্টার শব্দ, রানীর চীৎকার হয়ে যাবে রাখাল-ছেলের ডাক—আর, বাচ্ছার হাঁচি, গ্রাইফনের তারস্বর, আর যত কিছু অদ্ভুত শব্দ এক হয়ে যাবে (সে জানে, হয়ে যাবে) পাশের খেত-খামারের কাজ-কর্ম, কথাবার্তার আওয়াজের সঙ্গে—নকল কাছিমের বুক-ফাটা গোমরানি একাকার হয়ে যাবে দূরের গোরু-বাছুরের হাম্বা ডাকের শব্দে।

এবার সে ভবিষ্যতের সেই সময়কার ছবি আঁকলে মনে মনে, তার ছোট্টো বোনটি কেমন গিন্নীবান্নি হয়ে উঠবে তখন, বড়ো হতে হতেও ছেলেবেলাকার তার এই মায়ায় ভরা সরল হৃদয়টিকে অম্লান রাখতে পারবে; তখন সে কেমন ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের জড়ো করে আজব আজব গল্প শুনিয়ে তাদের চোখে বিস্ময়ের আলো ফুটিয়ে তুলবে, আগ্রহের ঝিলিক জ্বালিয়ে তুলবে, অনেক দিন আগেকার এই আজব দেশের স্বপ্নের কথাও বলবে হয়তো; আর, বেশ কেমন তার নিজের ছেলেবেলার কথা, গ্রীষ্মের এই মধুর দিনগুলোর কথা তখনো তার মন থেকে মুছে যাবে না, আর তাই, সেই-সব খোকাখুকুদের সহজ-সরল দুঃখে তখনো তার বুক মুচড়ে উঠবে, তাদের সহজ-সরল আনন্দ তার মনে তুলবে খুশির ঢেউ।

সিল্‌ভি আর ব্রুনো

'সিল্‌ভি আর ব্রুনো' 'অ্যালিস'-এর পরের সময়কার রচনা। সাধারণ উপন্যাসের মতো বাস্তব ঘটনা নয়, আবার 'অ্যালিস'-এর মতো পুরো কাল্পনিক নয়—দুয়ের সংমিশ্রণ। ক্যারল-এর নিজের জবানিতে লেখা।

ব্রুনোর লেখাপড়া নিয়ে যে পরিচ্ছেদটি আছে, ছোটোগল্প হিসাবে সেটি আগেই এক সময়ে লিখেছিলেন। পরে দুই ভাই-বোনকে নিয়ে বেশ বড়ো-সড়ো কিছু লেখবার ইচ্ছা হল।

'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-তেই সে ইচ্ছা মেটে নি, পরে আরো একটি উপন্যাস লিখলেন ওদের নিয়ে; সেটি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশের অপেক্ষায় রইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কম রুটি ! বেশি ট্যাক্স !

আবার সবাই চীৎকার করে উঠল ; আর, একজন লোক—আর সবাইকার তুলনায় সে-ই সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত—মাথার টুপিটা বোঁ করে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল, (আমার কানে যা শোনাল) "সাব-ওয়ার্ডেনের জন্যে কে কে আওয়াজ দিতে চাও ?" প্রত্যেকেই চ্যাঁচালে, তবে সাব-ওয়ার্ডেনের জন্যে কি-না, পরিষ্কার বোঝা গেল না ; কেউ চ্যাঁচাচ্ছে 'রুটি' বলে, কেউ চ্যাঁচাচ্ছে 'ট্যাক্স' বলে, তবে সত্যি-সত্যি কী যে চায়, তা কেউই ঠিক জানে না মনে হল।

ওয়ার্ডেনের প্রাতরাশের কামরার জানলা থেকে লর্ড চ্যান্সেলর-এর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম। চীৎকার শুরু হওয়া-মাত্রই তিনি লাফিয়ে উঠে পড়েছেন, যেন আগে থেকে জানতেন, যে এইরকমটা ঘটবে, তার পর হুড়মুড় করে জানলার দিকে ছুটেছেন। সেখান থেকেই বাজারটা সবচেয়ে ভালো দেখা যায়।

কোমরের পিছনে দুহাত জড়ো করে ধরে, পরনের গাউনটা হাওয়ায় লটপট করে, কামরার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে কেবলই তিনি বিড়্‌বিড়্‌ করতে লাগলেন, "এ-সবের মানেটা কী ? এমন চীৎকার তো এর আগে কখনো শুনি নি—তার-ওপর, এই সাত-সকালে ! আর এমন সমস্বরে ! তোমার খুব আশ্চর্য লাগছে না ?"

খুব বিনীতভাবে নিবেদন করলাম যে, আমার কানে মনে হচ্ছে, যেন ওরা সব আলাদা আলাদা দাবি নিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে ; কিন্তু চ্যান্সেলর মশাই এক মুহূর্তের জন্যেও আমার কথা কানে নিলেন না। তিনি বললেন, "আমি নিশ্চয় করে বলছি, ওরা সব্বাই একই কথা বলে চ্যাঁচাচ্ছে!" তার পর জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কাছাকাছি দাঁড়ান একজন লোককে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "সবাইকে এক জায়গায় জমায়েৎ করে রাখতে পারছ না ? ওয়ার্ডেন সোজা এখানে আসছেন। ওদের মার্চ করবার সঙ্কেত দাও!" এ-সব অবশ্য আমার শোনার কথা নয়, কিন্তু আমার থুতনিটা যখন চ্যান্সেলরের কাঁধ ছুঁইছুঁই করছে, তখন না-শুনে আর উপায় কী।

মার্চ যা হল, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য : দুজন দুজন করে দাঁড়ান মানুষের বাঁকাচোরা একটা সারি বাজারের ওদিকটা থেকে প্রাসাদের দিকে এঁকে-বেঁকে এগোচ্ছে, একবার এদিকে যাচ্ছে একবার ওদিকে

সরে যাচ্ছে—যেন এলোমেলো ঝোড়ো বাতাসে জাহাজের মতো দশা—আর, তার ফলে শোভাযাত্রার মুখটা কখনো আমাদের কাছাকাছি থাকছে, আবার পরের পাকে অনেক দূরে সরে থাকছে।

তবে, একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সব কিছুই হচ্ছে হুকুম-মাফিক, কারণ দেখলাম, সকলেরই চোখ জানলার নীচে দাঁড়ান সেই লোকটির দিকে, এবং চ্যান্সেলর অনবরতই তার কানে কানে কী-সব আওড়ে যাচ্ছেন। লোকটি এক-হাতে নিজের টুপিটা ধরে রেখেছে, আর-এক হাতে নিয়েছে একটা সবুজ নিশান; যখনই নিশান নাড়াচ্ছে, শোভাযাত্রাটা কাছে আসছে, যখন নামিয়ে ধরছে, তখন একপাশে সরে যাচ্ছে, আর যখন টুপিটা নাড়ছে, তখন সবাই ফাটা-গলায় চেঁচিয়ে উঠছে। টুপির ওঠা-নামার সঙ্গে খুব সাবধানে তাল রেখে রেখে তারা চেঁচিয়ে উঠছে।—"হর্‌রা! নতুন! সং! বিধান! কম! রুটি! বেশি! ট্যাক্স!"

চ্যান্সেলর ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "এতেই হবে, এতেই হবে! আমি তোমায় খবর দেবার আগে পর্যন্ত ওরা একটু জিরিয়ে নিক। তিনি তো আসেন নি এখনো!" কিন্তু সেই মুহূর্তে কামরার ভাঁজ-করা পাল্লা দুটো হাট হয়ে খুলে গেল, চ্যান্সেলরমশাই কাঁচুমাচু হয়ে মহা-মহিমার্ণব অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল, আর কেউ নয়, ব্রুনো। চ্যান্সেলরমশাই স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়লেন।

চ্যান্সেলর বা পরিচারক, বিশেষভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না-করে ক্ষুদে মানুষটি বললে, "সুপ্রভাত! আপনারা কি জানো, সিল্‌ভি কোথায়? আমি সিল্‌ভিকে খুঁজছেন!"

খাতির দেখাবার জন্যে চ্যান্সেলর খুব নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকে বললেন, "আমার মনে হয় তিনি ওয়ার্ডেনের কাছে আছেন, মহামান্য-বাহাদুর!" যার বাবা কি-না অচিন দেশের একজন ওয়ার্ডেন ছাড়া আর কিছু নয়, সেই পুঁচকে একটা ছেলেকে ঐ-সব খেতাব দিয়ে সম্বোধন করাটা একটু কিম্ভূত ধরনের বটে, তবে পরীর দেশের রাজসভায় যিনি অনেক বছর কাটিয়েছেন, তাঁর সাত-খুন মাফ করা চলে। কিন্তু ব্রুনো এদিকে তখন ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটিমাত্র গলা শোনা গেল, মনে

হল বলছে, 'চ্যান্সেলরের বক্তৃতা হোক!' চ্যান্সেলরমশাই অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে উঠলেন, "অবশ্যই, বন্ধুগণ! নিশ্চয়ই ভাষণ শোনান হবে!" একজন পরিচারক এতক্ষণ ধরে ডিম আর শেরী মিশিয়ে অদ্ভুতরকমের কী-একটা বানাচ্ছিল, এবার রুপোর থালার ওপর গেলাসে করে তাঁর সামনে ধরলে। চ্যান্সেলরমশাই খুব নবাবী চালে সেটা নিলেন, কী যেন ভাবতে ভাবতে খেলেন, তার পর পরিচারকের দিকে প্রাণ জল-করা হাসি হেসে তাকে আনন্দ দিয়ে খালি গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বক্তৃতা শুরু করলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন:

"হুহুম্! হুহুম্! হুহুম্! একই দুঃখের শরিক আমার সাথীরা, বা, বলা যেতে পারে, আমার শরিক দুঃখীরা সব—" (জানলার নীচে-দাঁড়ান সেই লোকটি বিড়্‌বিড়্ করে বললে, "ওদের যা-তা বলছেন কেন!" চ্যান্সেলর বললেন, "আমি তো 'দুঃখীরা সব' বলেছি, 'দুঃখী রাসভ'তো বলি নি।" —"আপনারা নিশ্চিত জানবেন যে আপনাদের দুঃখে সর্বদাই আমার সহানু--"(এই সময়ে 'বাঃ, বাঃ' বলে জনতা এমন চীৎকার করলে যে, বক্তামশাইয়ের চিঁচিঁ-করা গলার আওয়াজ একদম ডুবে গেল) " -সর্বদাই আমার সহানু-- "। (জানলার তলার সেই লোকটি বললে, "অতবার সহানু করতে হবে না! আপনাকে একেবারে ক্যাবলাকান্ত বলে মনে হচ্ছে!" আর, এদিকে জনতার অবিরাম 'বাঃ, বাঃ' চীৎকার সেই বাজারের মধ্যে বাজের শব্দের মতো গুড়্‌গুড়্ করে চলেছে।) তার পর গোলমাল থামতেই প্রথম মওকাতেই চ্যান্সেলরমশাই চীৎকার করে বলে উঠলেন, "সহানুভূতি আছে। কিন্তু, আপনাদের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন, সাব-ওয়ার্ডেন! দিন-রাত তিনি আপনাদের অনধিকার নিয়ে চিন্তা করছেন—মানে, আমি বলছি, অধিকার নিয়ে—অর্থাৎ আপনাদের অনধিকার নিয়ে—না, না, আমি বলছি, অধিকার নিয়ে—" (জানলার তলার লোকটি বলে উঠল, "ঢের হয়েছে, আর কিছু বলতে হবে না! বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড করলেন একেবারে!") এই সময়ে সাব-ওয়ার্ডেন প্রবেশ করলেন সেই কামরায়। রোগাটে চেহারা, শিয়ালের মতো ধূর্ত মুখ-চোখ, সবুজেটে হলুদ গায়ের রঙ; খুব ধীরে ধীরে দরজা থেকে জানলার দিকে এগুতে লাগলেন চারিদিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে তাকাতে, যেন কোথাও পাগলা

কুকুর লুকিয়ে আছে, এক্ষুনি খ্যাঁক্ করে তেড়ে আসবে। চ্যান্সেলরের পিঠে চাপড় মেরে তিনি বললেন, "চমৎকার! খুব সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। আরে, আপনি তো দেখছি জন্ম-বক্তা!"

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খুব বিনয় করে চ্যান্সেলর বললেন, "না, না, ও আর এমন কি। তবে, জানেন তো, অধিকাংশ বক্তাই জন্মায়।" সাব-ওয়ার্ডেন থুতনিতে হাত বোলাতে-বোলাতে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "সত্যিই তো, বক্তারাও তো জন্মায়! সেদিক থেকে কথাটা তো কখনো ভেবে দেখি নি। তবু বলব, খুব ভালো বক্তৃতা হয়েছে।—আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলতে চাই।"

বাকি কথাবার্তা সব কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে হল; কাজেই কিছু শুনতে না পেয়ে ভাবলুম, বরং ব্রুনো কোথায় গেল, দেখি।

চলন-পথে দেখলুম সে দাঁড়িয়ে আছে, আর উর্দি-পরা একজন লোক ওকে বেশি বেশি খাতির দেখাবার জন্যে সামনে ঝুঁকে প্রায় দুমড়ে যাচ্ছে, আর তার হাতদুটো মাছের পাখনার মতো কাঁধ থেকে ঝুলছে। খুব সসম্ভ্রমে সে বললে, "মহমহিম বাহাদুর পড়ার ঘরে রয়েছেন, হুজুর।" ব্রুনো তাই শুনে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে পড়ার ঘরের দিকে চলল, আমিও ভাবলুম ওর পিছু পিছু যাই।

ওয়ার্ডেন বসে আছেন, সামনে তাঁর লেখার টেবিল, তাতে কাগজপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। লম্বা মানুষটি, দেখলে বেশ সম্ভ্রম হয়, গম্ভীর হলেও মুখে-চোখে বেশ মাধুর্য আছে। আর, তাঁর হাঁটুর ওপর বসে রয়েছে যে-মেয়েটি, তেমন মিষ্টি আর সুন্দর মেয়ে চোখে দেখবার সৌভাগ্য আর কখনো হয় নি আমার। দেখে ব্রুনোর চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়োই মনে হয়, তবে তারও সেই একইরকম গোলাপি গাল, জ্বলজ্বলে চোখ আর তেমনি একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া খয়েরি চুলের বাহার। হাসিমুখে উৎসুক হয়ে ঘাড় তুলে সে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, কী গভীর ভালোবাসা নিয়ে যে দুটি মুখ—একটি কচি বসন্তের, আর একটি পাকা শরতের—পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিল, তা দেখলেও আনন্দ হয়।

বয়স্ক ভদ্রলোকটি বলছিলেন, "না, তুমি ওঁকে একবারও দেখ নি। দেখা সম্ভব নয়, কারণ অনেক দিন ধরেই তো উনি এখানে নেই,

এ-দেশ ও-দেশ করে বেড়াচ্ছেন, শরীর সারাবার চেন্টা করছেন ; তুমি জন্মাবারও অনেক আগে থেকে, বুঝলে সিল্‌ভি !"

ব্রুনো তার অন্য হাঁটুর ওপর চড়ে বসতেই তিনজনে মিলে গোল-মেলে গোছের একটা চুমু খাওয়া-খাওয়ির পালা শুরু হয়ে গেল।

পালা চুকলে ওয়ার্ডেন বললেন, "সবে কাল রাত্তিরে তিনি ফিরেছেন। সিল্‌ভির জন্মদিনে যাতে এখানে থাকতে পারেন, তার জন্যে শেষের হাজারখানেক মাইল একেবারে ডাকের ঘোড়ার মতো তাড়াহুড়ো করে এসেছেন। তবে, খুব সকাল সকাল ওঠা অব্যেস, কাজেই নিশ্চয় এতক্ষণে তিনি লাইব্রেরিতে ঢুকেছেন। চল যাই, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। ছোটো ছেলেমেয়েদের ওপর তাঁর খুব দরদ। তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে তাঁকে।"

ব্রুনো সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, "আর একজন প্রফেসরও এসেছেন না-কি ?"

"হ্যাঁ, একসঙ্গেই এসেছেন দুজনে। অন্য প্রফেসরটিকে—মানে, হয়তো তোমাদের ততটা পছন্দ নাও হতে পারে। মাথায় নানারকম কল্পনা ঘোরে, মনে অনেকরকম স্বপ্ন-টপ্ন আছে আর-কি।"

ব্রুনো বললে, "সিল্‌ভির মনে আরো একটু স্বপ্ন-টপ্ন থাকলে ভালো হত।"

সিল্‌ভি বললে, "তার মানে ?"

ব্রুনো তার বাবার দিকে চেয়েই বলে চলল, "সিল্‌ভি বলে ও না-কি কিছুতেই স্বপ্ন দেখতে পারে না, জানলে ? আমি বলি, 'পারে না' নয়, ও ইচ্ছে করে 'দেখে না'।'

ওয়ার্ডেন থতমত খেয়ে জিগেস করলেন, "ও বলেছে, ও স্বপ্ন দেখতে পারে না ?"

ব্রুনো বললে, "বলেছেই তো। যখনই আমি বলি, 'এবার পড়া শেষ হয়ে গেছে'। তখনি ও বলে ওঠে, 'ওমা, এক্ষুনি পড়া শেষ করবে কী, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না' !"

সিল্‌ভি বললে, "যখনি পড়তে বসি, পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতেই ও পড়া শেষ করতে চায় !"

ওয়ার্ডন বললেন, "দিনে মাত্তর পাঁচ মিনিট পড়া ? এমন করলে তো কিছুই শিখতে পারবে না, বাবা !"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে বললে, "সিল্‌ভিও ঠিক তাই বলে। ও বলে, আমি না-কি পড়া 'করি না'। আমি বলি, বার বার বলি, আমি 'পারি না'। তাতে কি বলে জান? বলে, 'পারি না নয়, করি না'।"

এ-নিয়ে যাতে আর কথা-কাটাকাটি না হয়, তাই চালাকি করে ওয়ার্ডেন বললেন, "চল, প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে আসি।" হাঁটুর ওপর থেকে নেমে ওরা দুজনে ওঁর দুটো হাত ধরলে, তার পর তিনজনে লাইব্রেরির দিকে চলল—পেছনে আমি। ইতিমধ্যে আমি টের পেয়ে গেছি যে, এখানকার কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না (কিছুক্ষণের জন্যে চ্যান্সেলর অবশ্য পেরেছিলেন)।

ব্রুনো লাফাতে লাফাতে চলেছে এক হাত ধরে, আর অন্য হাত ধরে সিল্‌ভি ব্রুনোকে দেখাবার জন্যেই যেন একটু বেশি শান্ত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে, "কী হয়েছে প্রফেসরের?"

"কী হয়েছিল বল—এখন তো ভালোই আছেন মনে হয়—হয়েছিল কোমরের ব্যথা, বাত, এই-সব। নিজেই নিজের চিকিৎসা করছেন। জান তো, উনি খুব পণ্ডিত ডাক্তার। এমন-কি, তিন-তিনটে নতুন অসুখ পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তা ছাড়া, কণ্ঠার হাড় ভাঙবার নতুন উপায় তো বের করেইছেন।"

ব্রুনো বললে, "বেশ সুন্দর উপায়?"

লাইব্রেরিতে ঢুকতে ঢুকতে ওয়ার্ডেন বললেন, "হুম, খুব একটা সুন্দর উপায় নয় অবশ্য।—এই যে, ইনিই হচ্ছেন প্রফেসর।—সুপ্রভাত, প্রফেসর! এতখানি পথ পাড়ি দেবার ধকল সয়েছেন, আশা করি বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়েছেন!"

ছোট্টোখাট্টো মোটাসোটা আমুদে গোছের মানুষটি, গায়ে ফুলকাটা একটা ড্রেসিং গাউন, দু বগলে দুটো মোটা বই; ওদিক দিয়ে দুলকি চালে ঘরে ঢুকলেন, তার পর বাচ্চাদের দিকে নজর না-দিয়েই অন্যদিকে যেতে যেতে বললেন, "তৃতীয় খণ্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না, দেখেছেন কোথাও?"

প্রফেসরের কাঁধ ধরে সামনে ফিরিয়ে দিয়ে ওয়ার্ডেন বললেন, "আমার ছেলেমেয়েদের তো দেখলেন না, প্রফেসর!"

হো হো করে হেসে উঠলেন প্রফেসর, তার পর বড়ো-বড়ো চশমার ভেতর দিয়ে চুপচাপ তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিনিট দুয়েক।

শেষকালে ব্রুনোকে বললেন, “রাত্তিরটা কেমন গেল, ভালো তো?”

ব্রুনো একটু থতমত খেল, বললে, “আপনারও যে-রাত্তির, আমারও তো সেই রাত্তির। কালকে থেকে মোটে একটা রাত্তিরই তো গেছে!”

এবার প্রফেসরের থতমত খাওয়ার পালা। চশমাটা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে পুঁছলেন, তার পর আবার ভালো করে তাকালেন তাদের দিকে। তার পর ওয়ার্ডেনের দিকে ফিরে জিগেস করলেন, “সব কি বাঁধাই করা?”

ব্রুনো ভাবলে, এর জবাব সেই-ই দিতে পারে; তাই বললে, “না, আমরা বাঁধা নই।”

হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে প্রফেসর বললেন, “আধ-বাঁধাও নয়?”

ব্রুনো বললে, “আধ-বাঁধা-ই বা হব কেন, আমরা কি কয়েদী?”

কিন্তু ততক্ষণে ওদের কথা আর প্রফেসরের মনে নেই, তিনি আবার ওয়ার্ডনের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। বলছেন, “শুনে সুখী হবেন, তাপমান যন্ত্রের পারা নড়তে আরম্ভ করেছে।”

ওয়ার্ডেন বললেন, “কোন দিকে নড়েছে?” তার পর ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, “আমার যে জানবার গরজ আছে, তা নয়। তবে কি জান, উনি মনে করেন যে, পারা নড়লে আবহাওয়ার রদবদল ঘটে। উনি খুব বুদ্ধিমান লোক, বুঝলে তো। এক-এক সময়ে এমন সব কথা বলেন, অন্য প্রফেসরটি ছাড়া আর কেউই তার মানে বুঝতে পারে না!—হ্যাঁ, কোন দিকে যাচ্ছে, প্রফেসর, ওপর দিকে, না নীচের দিকে?”

আলতো করে হাতদুটো জড়ো করে ধরে প্রফেসর বললেন, “ওপরেও নয়, নীচেও নয়। আমার যা মনে হচ্ছে, তাতে বলতে হয়, পাশের দিকে।”

ওয়ার্ডেন বললেন, “তাতে কী ধরনের আবহাওয়া তৈরি হয়?—ভালো করে শোন এবার তোমরা! এবারে খুব জ্ঞানের কথা হবে!”

“সমান্তরাল আবহাওয়া,” বলেই প্রফেসর সোজা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। ব্রুনো সময় মতো পাশ কাটাতে না-পারলে, তার ঘাড়ের ওপর দিয়েই যাচ্ছিলেন আর একটু হলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর ফিরে এলেন আবার; এবারে ড্রেসিং গাউনের বদলে ফ্রক কোট পরেছেন, পায়ে দিয়েছেন উদ্ভট ধরনের

একজোড়া বুট-জুতো, তার ওপর দিকটা খোলা ছাতা। বললেন, "মনে হল, তোমরা হয়তো দেখতে চাইবে ; এই হল সমান্তরাল আবহাওয়ার পক্ষে উপযোগী বুট-জুতো !"

"কিন্তু, হাঁটুতে খোলা ছাতা পরবার দরকারটা কী ?"

প্রফেসর বললেন, "সাধারণ বৃষ্টিতে বিশেষ কোনো কাজে লাগবে না, ঠিকই। কিন্তু যদি কখনো সমান্তরাল বৃষ্টি হয়, মানে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে পাশের দিক থেকে বৃষ্টির ছাট আসে, তা হলে এ-জুতো যা কাজ দেবে, তার আর তুলনা নেই—একেবারে তুলনা নেই !"

ওয়ার্ডেন ছেলেমেয়েকে বললেন, "প্রফেসরকে তোমরা প্রাতরাশের কামরায় নিয়ে যাও, আর ওদের বলে দিও যে, আমার জন্যে যেন অপেক্ষা না করে। আমার একটু কাজ ছিল, তাই সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে নিয়েছি।" যেন কত কালের চেনা, এমনি আপনার লোকের মতো করে প্রফেসরের হাতদুটো ধরে ওরা তাঁকে নিয়ে চলে গেল। আমিও সন্তর্পনে ওদের পিছু নিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিচয়

প্রাতরাশের কামরায় যখন ঢুকলাম, তখন প্রফেসর বলছেন, "উনি একা একা প্রাতরাশ সেরে নিয়েছেন, তাই বলেছেন যে, আপনি যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন না। এই দিকে আসুন, দেবী!" বলে, মুখে ওড়না-ঢাকা এক মহিলাকে নিয়ে আমার কামরার মধ্যে ঢুকলেন।—ঝিক্‌ঝিক্‌ করে ট্রেন চলতে লাগল।

মহিলার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই মনে মনে নানারকম কল্পনা করছিলাম, না-জানি কেমন দেখতে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলাম যে, ওড়নাটা নেই। চকিতের জন্যে এক-একবার ওড়নাটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল, আর তারই মধ্যে এক-এক ঝলক যা দেখতে পেলাম, তাতে মনে হল, যেন ক্রমশই আরো কচি দেখাচ্ছে; তার পর যখন কল্পনায় পুরো ওড়নাটা সরে গেল, হুবহু সিল্‌ভির সেই মিষ্টি মুখখানি দেখতে পেলুম।

ভাবলাম, 'তা হলে, সিল্‌ভিকে দেখাটা স্বপ্ন, এখন যা দেখছি, এইটাই সত্যি। কিম্বা, সিল্‌ভির সঙ্গে সত্যিই দেখা হয়েছে, এইটাই স্বপ্ন! জীবনটাই কি স্বপ্ন না-কি?'

সময় কাটাবার জন্যে পকেট থেকে চিঠিটা বার করলাম। লণ্ডনের বাসা থেকে ইংলণ্ডের উত্তর উপকূলের অদ্ভুত একটা মেছো-

শহরের দিকে ট্রেনে চড়ে এই যে পাড়ি দিচ্ছি তার কারণ হল ঐ চিঠি। চিঠিটা আবার পড়লাম :

অনেক দিনের বন্ধু আমার,

এত বছর বাদে আবার যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে আমি যতটা খুশি হই, তুমিও নিশ্চয়ই তাই হবে ; তা ছাড়া ডাক্তারিতে আমার যে কুশলতা আছে, তার সুযোগ তো পাবেই। তবে, ডাক্তারি পেশার কয়েকটা রীতি-নীতি আছে, জান তো। লণ্ডনের পয়লা-নম্বরের একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় তো রয়েইছ, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি, এমন কথা বললে, সেটা সত্যের অপলাপ হবে। (তিনি যে বলেছেন, তোমার হৃৎপিণ্ডে গণ্ডগোল হয়েছে, তাতে আমারও সন্দেহ নেই ; তোমার রোগের লক্ষণ সব সেইরকমই।) ডাক্তার হিসাবে একটা কাজ আমি করে রেখেছি—নীচের তলায় তোমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছি যাতে তোমায় সিঁড়ি ভাঙতে না-হয়।

তোমার চিঠি অনুযায়ী শুক্রবারের শেষ গাড়িতে তুমি আসবে, সেই আশা করে আছি।

তোমার
আর্থার ফরেস্টার

পুনশ্চ : ভাগ্যে বিশ্বাস কর ?

পুনশ্চ দিয়ে এই লেখাটাই আমায় ভীষণ ধাঁধায় ফেলেছে। ভাবলাম, 'অত বিচারবুদ্ধি যার, তার তো ভাগ্য-বিশ্বাসী হওয়া সাজে না। কিন্তু, তা ছাড়া আর কীই-বা মানে হতে পারে ঐ লেখার।' চিঠিটা মুড়ে রাখতে রাখতে আমার মুখ ফস্কে চিঠির শেষ কথাটা বেরিয়ে গেল, "ভাগ্যে বিশ্বাস কর ?"

আচমকা এই প্রশ্ন শুনে দেবী চট করে আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন। হেসে বললেন, "না, করি না। আপনি করেন ?"

একটু থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললাম, "আমি—আমি ঠিক প্রশ্ন করতে চাই নি।"

দেবী এবার জোরেই হেসে উঠলেন—ঠাট্টার হাসি নয়, ছোটোদের মতো খুশির সরল হাসি। বললেন, "প্রশ্ন করতে চান নি ?' তা হলে,

ওটা হল আপনারা—ডাক্তাররা—যাকে বলেন অবচেতন চিন্তা।"

বললাম, "আমি ডাক্তার নই। আমায় দেখে কী ডাক্তার বলে মনে হয়? হঠাৎ আমায় ডাক্তার ভাবলেনই-বা কেন?"

যে বইটা পড়ছিলাম, সেই দিকে তিনি আঙুল দেখালেন। বইটা এমনভাবে পড়েছিল যে, তার নামটা দেখা যাচ্ছিল—'হৃৎপিণ্ডের রোগ।'

বললাম, "ডাক্তার না-হলে যে ডাক্তারি বইয়ে আগ্রহ থাকতে নেই, এমন তো নয়। আরো একধরনের পাঠক আছে, যাদের আগ্রহ আরো বেশি—"

"তার মানে, রুগীরা তো?" আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি বললেন; করুণার ভাব ফুটে উঠে মুখখানা আরো মিষ্টি দেখাচ্ছিল। তার পর, রোগ-টোগের মতো মন-ভার-করা কথাবার্তা এড়াবার জন্যে বললেন, "কিন্তু বিজ্ঞানের বই পড়ার আগ্রহ থাকতে হলে ডাক্তার বা রুগী কোনোটাই হবার দরকার করে না। আপনার মতে, বিজ্ঞানের বিষয় কোথায় বেশি আছে, বইয়ে, না মনে?"

দু-এক মিনিট ভেবে নিয়ে বললাম, "সঠিক কিছু বলা শক্ত। বিজ্ঞানের বিষয়ে এত লেখা হয়েছে যে, এক জীবনে পড়ে শেষ করা যায় না; আবার মানুষের মনে এত সব বৈজ্ঞানিক চিন্তা রয়েছে, যা এখনো লেখা হয় নি। তবে, যদি সমস্ত মানবজাতির কথা ধরেন, তা হলে বলব, মনের মধ্যেই বিজ্ঞান আছে সবচেয়ে বেশি। বইয়েতে যা ছাপা হয়েছে, একসময়ে-না-একসময়ে, সে-সব মনের মধ্যেই তো ছিল।"

তিনি বললেন, "অনেকটা বীজগণিতের সেই নিয়মের মতো হল, না? চিন্তাকে যদি উৎপাদক ধরা যায়, তা হলে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীর সমস্ত বইয়ে যা আছে, সমস্ত মানুষের মনের গ.সা.গু. মানে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া যাবে; কিন্তু বইয়ের বেলা তা হবে না। বলতে পারি না?"

এই উদাহরণ শুনে আমার খুব ভালো লাগল, বললাম "নিশ্চয়ই বলতে পারি।" তার পর কল্পনায় মশগুল হয়ে গিয়ে আপন মনেই বলতে লাগলাম, "বইয়ের ব্যাপারে যদি আমরা ঐ একই নিয়ম খাটাতে পারি, তা হলে কেমন চমৎকার হয়! জানেন তো, যখন আমরা লঘিষ্ঠ 'সাধারণ গুণিতক, বা. ল. সা. গু বার করি, তখন এক-একটা

সংখ্যাকে যতবার দেখি, ততবারই বাদ দিই, অবশ্য সবচেয়ে বড়ো সংখ্যাটাকে রেখে। সেইভাবে, মানুষের মনের চিন্তা যতবার বইয়ে লেখা হয়েছে, তা থেকে সবচেয়ে গভীর চিন্তাগুলোকে রেখে যদি বাদবাকিগুলোকে মুছে ফেলতে পারতাম!"

ভদ্রমহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, "তা হলে অনেক বইতেই শুধু সাদা পাতাই থাকত।"

"তা তো হবেই। অধিকাংশ লাইব্রেরিতেই বইয়ের বোঝা কমবে। কিন্তু, যা থাকবে তা কত উঁচুদরের হবে, ভাবুন তো?"

খুব সাগ্রহে তিনি শুধোলেন, "কবে এটা হচ্ছে বলুন তো? আমি বেঁচে থাকতে যদি হবার আশা থাকে, তা হলে তদ্দিন অপেক্ষা করে থাকি, বই পড়া আপাতত বন্ধ রাখি।"

"তা, ধরুন আরো হাজার বছরটাক—"

তিনি বললেন, "তা হলে অপেক্ষা করার মানে হয় না। আসুন, বসা যাক। আগ্‌গাগ্, এস তো সোনা, আমার পাশে এসে বস!"

সাব-ওয়ার্ডেন হুঙ্কার ছাড়লেন, "যে-চুলোয় বসে বসুক, তবে আমার পাশে নয়। হতচ্ছাড়া ছেলে সব সময়ে কফির পেয়ালা উল্টে ফেলে।"

তক্ষুনি বুঝতে পারলাম যে, মহিলা হচ্ছেন সাব-ওয়ার্ডেনের স্ত্রী, আর আগ্‌গাগ্ (বিদিকিচ্ছিরি মোটা একটি ছেলে, প্রায় সিল্‌ভির বয়সী হবে, প্রাইজ-পাওয়া শুয়োরের মতো ধরন-ধারন) হচ্ছে ওঁদের ছেলে। সিল্‌ভি, ব্রুনো আর লর্ড চ্যান্সেলরকে নিয়ে আমরা হলাম সাত জন।

সাব-ওয়ার্ডেন প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে; আগের কথার জের টেনে বললেন, "সত্যিই রোজ সকালে আপনি ডুব দিয়ে চান করেন? রাস্তার ধারে যে-সব আজে-বাজে সরাইখানা থাকে, সেখানেও?"

সদাপ্রফুল্ল মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রফেসর বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! বলেন তো বুঝিয়ে বলি। আসলে, এটা হল হাইড্রোডাইনামিক্‌স-শাস্ত্রের, মানে জল আর শক্তি এই দুই ব্যাপার নিয়ে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র, তারই খুব সরল একটা ব্যাপার।" মাটির দিকে চোখ নামিয়ে, একটু চাপা গলায় এবার প্রফেসর বললেন, "অবশ্য একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ডুব দিয়ে যে চান করবে, তার গায়ে অসম্ভব জোর থাকা দরকার। মাটি থেকে তাকে তার নিজের

উচ্চতার দু-গুণ উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে হবে—উঠতে উঠতে এমনভাবে নিজের দেহটাকে একটু একটু করে উল্টে ফেলতে হবে, যাতে পড়বার সময়ে মাথাটা নীচে থাকে।”

সাব-ওয়ার্ডেন বলে উঠলেন, “মানুষে কী হবে, তা হলে তো লাফানে-মাছির দরকার!”

প্রফেসর বললেন, “মাপ করবেন, এই বিশেষ ধরনের চানের ব্যবস্থাটা ঠিক মাছিদের উপযোগী নয়।” তার পর খাবার টেবিলের হাত-মোছার ন্যাপকিনটা নিয়ে একটা থলের মতো বানিয়ে বললেন, “ধরুন, এইটাই হচ্ছে সেই ডুব দিয়ে চান করবার চৌবাচ্চা, যেটা হল, এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে দরকারি জিনিস—‘কেজো পর্যটকের সহজ-বহনীয় স্নানব্যবস্থা’।” তার পর চ্যান্সেলরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ছোটো করে বলতে পারেন ‘কে. প. স. স্না’।”

সবাই তাঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে চ্যান্সেলর বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন; ফিস্‌ফিস্ করে শুধু বললেন, “তা বটে, ঠিক কথা!”

প্রফেসর বলে চললেন, “এই ‘ডুবগেলা-চানের’ মস্ত সুবিধে হল, এতে মাত্র আধ গ্যালনের বেশি জলের দরকার হয় না—”

সাব-ওয়ার্ডেন ফোঁস্ করে উঠলেন, “আমি একে ‘ডুবগেলা-চান’ বলতে মোটেই রাজি নই। আপনার ঐ ‘কেজো পর্যটক’ ওর ভেতরে ঢুকে যদি তলা পর্যন্ত না-যায়, তা হলে—”

প্রফেসর খুব ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, “ভেতরে ঢুকেই তো যায়। কে. প. এমনি করে স. স্না. টাকে পেরেকে ঝুলিয়ে দেয়। তার পর জলের জাগ থেকে সমস্ত জলটা ওর মধ্যে ঢেলে দেয়—খালি জাগটা থলের তলায় রেখে দেয়—শূন্যে লাফিয়ে ওঠে—মাথা নিচু করে থলের মধ্যে ঝুপ করে নেমে আসে—তার দেহের চারিদিক ঘিরে থলের মুখ পর্যন্ত জল আসে—ব্যস্, তা হলেই হয়ে গেল। সুমুদ্দুরের মাইল দুয়েক নীচে তলিয়ে গেলে যতখানি ডোবা যায়, কে. প.-র ঠিক ততখানিই ডোবা হয়ে গেল!”

“আর, ধরুন, মিনিট চারেকের মধ্যে সে জলে ডুবে মরেও গেল—”

গর্বের হাসি হেসে প্রফেসর বললেন, “মোটেই নয়! মিনিট খানেক পরে সে টুক করে স. স্না-র তলাকার একটা কল খুলে দেবে—সব জল জাগের মধ্যে ফিরে আসবে—হয়ে গেল!”

"কিন্তু, থলের বাইরে আসবে কী করে শুনি ?"

প্রফেসর বললেন. "আমি তো বলব, সেইটাই হল এই আবিষ্কারের সবচেয়ে মজার ব্যাপার। স. স্না-র ভেতর দিকে গা-বরাবর বুড়ো আঙুলে ভর দেবার মতো সব ফাঁস লাগান আছে ; কাজেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মতই হল ব্যাপারটা, তবে অতটা অনায়াস অবশ্য নয় ; আর কে. প.-র মাথাটা ছাড়া বাদবাকিটা যেই থলের বাইরে বেরিয়ে আসবে, কোনো-না-কোনো দিকে তাকে উল্টে পড়ে যেতেই হবে— মাধ্যাকর্ষণের দৌলতে আপনা থেকেই তা হতেই হবে। কাজেই, আবার সে যে-মাটিতে, সেই মাটিতে !"

"একটু যা ছড়ে-টড়ে যাবে বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ, তা একটু যাবে, তবে 'ডুবগেলা-চান' তো হল ; সেটাই বড়ো কথা।"

সাব-ওয়ার্ডেন বিড়্বিড়্ করে বললেন, "অদ্ভুত ! অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।" কথাটা প্রফেসর তারিফ বলেই ধরে নিলেন, কৃতার্থ হয়ে হেসে মাথা নোয়ালেন।

দেবী বললেন, "খুবই অবিশ্বাস্য।" তার মানে আরো তারিফ। প্রফেসর আবার মাথা নোয়ালেন, তবে এবার আর হাসলেন না।

প্রফেসর খুব আন্তরিকভাবে বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন, এই চানের সরঞ্জামটা তৈরি হয়ে থাকলে, রোজ সকালে নিশ্চয়ই আমি তাতে চান করেছি। তৈরি করতে ফরমায়েশ দিয়েছিলাম ঠিকই—বেশ মনে আছে—একটা শুধু খট্‌কা লাগছে, মিস্ত্রিটা শেষ অবধি বানিয়েছিল কি-না। কত বছর আগেকার কথা, মনে পড়া তো সহজ নয়—"

ঠিক এই সময়ে খুব আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে যেতে লাগল, পরিচিত পায়ের আওয়াজ় পেয়ে সিল্‌ভি আর ব্রুনো দৌড় দিল দরজার দিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মদিনের উপহার

সাব-ওয়ার্ডেন খুব সন্ত্রস্তভাবে লর্ড চ্যান্সেলরকে সতর্ক করে দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "আমার ভাই আসছে! তাড়াতাড়ি সেই কথাগুলো বলতে শুরু করে দাও!"

ছোটো ছেলেরা যেমন করে পড়া বলে, তেমনি একটানা সুরে চ্যান্সেলর বলতে শুরু করলেন, "যে কথা বলছিলাম, ছোটো-হুজুর, এই অলুক্ষুনে আন্দোলনটা—"

উত্তেজনার চোটে সাব-ওয়ার্ডেন গলাটাকে আর ফিস্‌ফিসে রাখতে পারলেন না, বললেন, "বড্ডো আগে আরম্ভ করে ফেললে, শুনতেই পেল না। আবার শুরু কর!"

বাধ্য ছেলের মতো চ্যান্সেলর আবার পাখি-পড়ার মতো করে বলতে লাগলেন, "যা বলছিলাম, ছোটো-হুজুর, এই অলুক্ষুনে আন্দোলনটা এর মধ্যেই বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছে!"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ওয়ার্ডেন বললেন, "আর, বিদ্রোহের আকারটা ঠিক কীরকম হয়?" তাঁর হাত ধরে সিল্‌ভিও এসেছে, আর ব্রুনো বেশ জুৎ করে বসে রয়েছে তাঁর কাঁধে। খুব নরম আর অমায়িক সুরেই বললেন কথাটা, তবে তাইতেই চ্যান্সেলরমশাই ফ্যাকাসে মেরে

গিয়ে কোনোরকমে বললেন, "আকার হুজুর বাহাদুর ? আমার—আমার—ঠিক মাথায় আসছে না !"

একটু অবজ্ঞা-মেশান হাসি হেসে ওয়ার্ডেন বললেন, "উচ্চতা, প্রস্থ আর বেধ বললে যদি সুবিধে হয়, ভেবে দেখুন !"

লর্ড চ্যান্সেলর অনেক চেষ্টা করে একটু সামলে নিয়ে খোলা জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "হুজুর বাহাদুর যদি ঐ বিক্ষুব্ধ জনতার চীৎকার কান পেতে শোনেন—" (সাব-ওয়ার্ডেন গলায় জোর দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করে শোনালেন, "বিক্ষুব্ধ জনতার চীৎকার !" কারণ ঘাবড়ে গিয়ে চ্যান্সেলরের গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজই বেরচ্ছিল না) "—তা হলে বুঝতে পারবেন, ওরা কী চায় ।"

ঠিক সেই সময়ে ফাটা-গলার সমবেত কলরোলের শব্দ যেন আছড়ে এসে পড়ল ঘরের মধ্যে, তার মধ্যে থেকে যেটুকু বোঝা গেল, তা হচ্ছে 'কম—রুটি—বেশি—ট্যাক্স।' ওয়ার্ডেন হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চ্যান্সেলর তার আগেই "একটু ভুল হয়ে গেছে !" বলে বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে জানলার দিকে দৌড়লেন, তার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। যাত্রার ঢঙে হাত তুলে তিনি বললেন, "এবার শুনুন।" এবার ঘড়ির টক্‌টক্‌ শব্দের মতো নিয়মিত ছন্দে পরিষ্কার শোনা গেল, 'আরো—রুটি—কম—ট্যাক্স !'

অবাক হয়ে ওয়ার্ডেন বললেন, "আরো রুটি ! এই তো গত সপ্তাহে নতুন সরকারী রুটির কারখানা খোলা হল, বর্তমান অনটনের দিনে আমি লাভ না-রেখে শুধু তৈরি-খরচের দামে রুটি বিক্রি করবার হুকুম দিয়েছি ! আর কী চাইবার আছে ওদের ?"

আগের চেয়ে অনেক জোরে আর পরিষ্কার গলায় চ্যান্সেলর বললেন, "রুটির কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে !" কিছু প্রমাণপত্র এবার দেখাতে পারবেন, তাই চ্যান্সেলরমশাইয়ের একটু সাহস দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা ছাপা বিজ্ঞপ্তি রাখাই ছিল, সেগুলো তুলে ওয়ার্ডেনের হাতে দিলেন।

ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে ওয়ার্ডেন নিচু গলায় বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো দেখছি ! হুকুমটা বাতিল করেছে আমার ভাই, অথচ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, যেন আমিই করেছি ! চমৎকার চালাকি !"

তার পর সবাইকে শুনিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। আমার সই যখন রয়েছে, তখন, আমিই এর দায়িত্ব নিচ্ছি। কিন্তু, 'কম ট্যাক্স' মানে কী? মাসখানেক আগে তো শেষ ট্যাক্স-ও রদ করেছি। আর কম কী করে হবে?"

"সে-ট্যাক্স আবার চালু করা হয়েছে, আপনারই হুকুমে!" আরো কয়েকটা ছাপা বিজ্ঞপ্তি তাঁকে দেখতে দেওয়া হল।

সেই-সব কাগজের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে ওয়ার্ডেন দু-একবার সাব-ওয়ার্ডেনের দিকে তাকালেন; সাব-ওয়ার্ডেন তখন টেবিলে বসে বসে একমনে হিসাবের খাতায় যোগ-বিয়োগ করছিলেন। কিন্তু ওয়ার্ডেন শুধু বললেন, "ঠিক আছে। এ-সব আমিই করেছি বলে মেনে নিলাম।"

চ্যান্সেলর সন্ত্রস্ত গলায় বলতে লাগলেন—তখন তাঁকে দেশের সরকারী কর্মচারীর মতো মোটেই দেখাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন দাগী চোর—"তা ছাড়া ওরা বলছে যে, সাব-ওয়ার্ডেনকে লোপ করে দিয়ে সরকারী ব্যবস্থায় বদল"—ওয়ার্ডেনের মুখে অবাক হবার ভাব দেখে তাড়াতাড়ি সামনে নিলেন "—মানে, সাব-ওয়ার্ডেনের দফতর লোপ করে দিয়ে বর্তমান সাব-ওয়ার্ডেনকে ওয়ার্ডেনের অনুপস্থিতিতে ভাইস-ওয়ার্ডেন হিসেবে কাজ করবার ক্ষমতা দেওয়া হোক, তাতেই—"

এবার সেই দেবী মুখ খুললেন; তাঁকে বরাবরই একটু অতিকায় মনে হয়েছে, তবে এখন যেই চোখ পাকিয়ে বুকের ওপর হাত মুড়ে কথা বলতে লাগলেন, তখন তাঁকে আরো বিরাট দেখাতে লাগল, ভাবতে ইচ্ছে হল, একটা খড়ের গাদা রেগে গেলে কী রকম দেখতে হয়, কে-জানে। তিনি বললেন, "আজ পনেরো বচ্ছর ধরে আমার স্বামী সাব-ওয়ার্ডেনের কাজ করছেন। অনেক দিন হয়ে গেল, বড্ডো বেশি দিন হয়ে গেল!"

ওয়ার্ডেন নরম সুরে জিগেস করলেন, "কী করা উচিত বলে তোমার মনে হচ্ছে?"

অসভ্যের মতো মাটিতে পা ঠুকে, ফোঁস্ করে তিনি বলে উঠলেন, "এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়!"

ওয়ার্ডেন বললেন, "ভাইয়ের সঙ্গেই কথা বলি, শোন ভাই!"

সাব-ওয়ার্ডেন তখন বলে চলেছেন "—সাত যোগ দিলে হল গিয়ে

চুয়ানব্বই, তার মানে হল ষোলো শিলিং দু পেন্স। তা হলে, দু পেন্স রইল, বাকি ষোলো শিলিং গেল তোমার—"

প্রশংসায় অভিভূত হয়ে পড়ে হাত তুলে, ভুরু উঁচিয়ে চ্যান্সেলর বলে উঠলেন, "ওঃ, কী কাজের মানুষ!"

এবার একটু গলা ছেড়ে ওয়ার্ডেন বললেন, "আমার পড়ার ঘরে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা যেতে পারে?" সাব-ওয়ার্ডেন ঝট্‌পট্‌ উঠে পড়লেন, দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

প্রফেসর এতক্ষণ একটা পাত্রের ঢাকা খুলে পকেট-থার্মোমিটার দিয়ে তার ভেতরকার তাপমাত্রা মাপছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে ফিরে এমন জোরে 'প্রফেসর' বলে হাঁক পাড়লেন যে, আংগাগ্‌ চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেও নাক-ডাকা বন্ধ করে একটা চোখ পিটপিট করতে লাগল। থার্মোমিটার পকেটে ভরে, হাত দুটো জড়ো করে নিয়ে, একদিকে ঘাড় কাৎ করে হাসিমুখে প্রফেসর তাঁর দিকে তাকালেন।

উদ্ধত ভঙ্গিতে দেবী বললেন, "প্রাতরাশের আগে আপনি তো আমার ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন? ওর বুদ্ধিসুদ্ধির বহর দেখে আপনি চমকে গেছেন তো?"

অজান্তে কানে হাত বোলাতে বোলাতে প্রফেসর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ওঃ, নিশ্চয়ই, খুবই চমক লেগেছে।" তার পর একটা কী যেন মনে পড়ে যেতে আবার বললেন, "ওর কীর্তিকলাপের দৌলতে বেশ জোরেই লেগেছে আমার; না-লাগলে শুনছে কে!"

"ভারি চমৎকার ছেলে! ওর নাক-ডাকার আওয়াজটা পর্যন্ত অন্য ছেলেদের চেয়ে কত সুরেলা!"

প্রফেসর মনে মনে ভাবলেন যে, তাই যদি হয়, তা হলে অন্য ছেলেদের নাক-ডাকার শব্দ শুনলে তো কানে হাত চাপা দিতে হবে! তবে তিনি সাবধানী লোক, তাই মুখে কিছু বললেন না।

"—আর কী বুদ্ধিমান ছেলে আমার! আপনার লেকচার শুনে ও যতটা তারিফ করতে পারবে, তেমনটি আর কেউ নয়—ভালো কথা, লেকচারের দিন-ক্ষণ ঠিক করেছেন কিছু? এখনো একবারও লেকচার দেন নি, অথচ সেই কত বছর ধরে কথা দিয়ে রেখেছেন, সে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে! ধরুন আসছে মঙ্গলবার—বা পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার—"

দেবী বললেন, "সেই বেশ হবে। তবে আর-একজন যে প্রফেসর এসেছেন, তাঁকেও লেকচার দিতে দেবেন তো?"

একটু ইতস্তত করে প্রফেসর বললেন, "বোধ হয় না; ব্যাপার হচ্ছে কি, উনি সব সময়ে লোকেদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ান। কবিতা-টবিতা আবৃত্তির পক্ষে চলে যায়, কিন্তু লেকচার দিতে গেলে -"

দেবী বললেন, "ঠিক বলেছেন। তা ছাড়া এখন ভেবে দেখছি, একটার বেশি লেকচার হবার সময়ও থাকবে না। আর, গোড়ার দিকে একটু খাওয়া-দাওয়ার উৎসব বা খুশিমতো মজার মজার পোশাক পরে বল-নাচের ব্যবস্থা করতে পারলে ব্যাপারটা জমবে বেশি।"

প্রফেসর উৎসাহে ফেটে পড়লেন, "নিশ্চয়ই, একেবারে জমে যাবে!"

দেবী বেশ শান্তভাবেই বলে চললেন, "আমি গঙ্গাফড়িং সেজে আসব। আপনি কী রকম করে আসবেন, প্রফেসর?"

ঠোঁটে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে প্রফেসর উত্তর দিলেন, "আমি, আমি– তাড়াতাড়ি করে আসব, যত তাড়াতাড়ি পারি।"

"দরজা খোলার আগে যেন এসে পড়বেন না।"

প্রফেসর বললেন, "না তা তো পারবই না। মাপ করবেন, আজ লেডি সিল্‌ভির জন্মদিন তো, তাই আমি ওকে—" বলতে বলতে তিনি হুড়মুড় করে ঘর থেকে চলে গেলেন।

ব্রুনো তার পকেট হাতড়াতে লাগল; যতই হাতড়ায়, ততই মুখখানা ভারি হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল পুরে কী ভাবলে, তার পর চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্রুনো যেতে-না-যেতেই প্রফেসর ফিরে এলেন, বেশ হাঁফাচ্ছেন। সিল্‌ভির দিকে চেয়ে বললেন, "আজকের দিনটি বার বার তোমার জীবনে ফিরে আসুক, এই কামনা করছি, মা!" সিল্‌ভির মুখে মিষ্টি হাসি, সে দৌড়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। "তোমাকে জন্মদিনের একটা উপহার দেব; আলপিন গেঁথে রাখবার পুরনো একটা পিন-কুশন। মাত্র সাড়ে চার পয়সা দাম!"

উপহারের বদলে বৃদ্ধ প্রফেসরকে আদর করে একটা চুমু খেয়ে সিল্‌ভি বললে, "খুব সুন্দর দেখতে! আপনাকে ধন্যবাদ!"

প্রফেসর খুশিতে ডগমগ হয়ে বলতে লাগলেন, "আল্‌পিনগুলো

অমনিতেই দিয়ে দিলে! পনেরোটা আল্‌পিন, তার মধ্যে একটা কেবল বাঁকা!"

সিল্‌ভি বললে, "বাঁকা পিন্‌টাকে বঁড়শির মতো করে নেব, পড়তে পড়তে ব্রুনো যখন পিট্টান দেবে, তখন ঐটা দিয়ে ওকে পাকড়ে ফেলব!"

হঠাৎ আগ্‌গাগ্‌ বলে উঠল, "আমি যে তোমায় কী উপহার দেব, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!" টেবিল থেকে মাখনের পাত্রটা নিয়ে কখন যেন সিল্‌ভির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে, মুখে-চোখে দুষ্টুমি ফুটে বেরুচ্ছে।

প্রফেসরের দেওয়া পিন্‌-কুশনটা তখনো খুঁটিয়ে দেখছিল সিল্‌ভি, তাই চোখ না-তুলেই জবাব দিলে, "না আন্দাজ করতে পারছি না।"

উল্লাসে ফেটে পড়ে, মাখনের পাত্রটা সিল্‌ভির গায়ে উপুড় করে দিয়ে ছোঁড়া বললে, "এই হল আমার উপহার!" তার পর নিজের বাহাদুরির গৌরবে একগাল হাসি নিয়ে বাহবা পাবার আশায় চারিদিকে তাকাতে লাগল।

ফ্রক ঝাড়তে ঝাড়তে সিল্‌ভি রাগে লাল হয়ে উঠেছে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিলে, আর তার পর মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্যে সোজা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আগ্‌গাগের এই বিজয়োল্লাস অবশ্য বেশিক্ষণ টিকল না, কারণ সাব-ওয়ার্ডেন ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেই ছেলের কীর্তিটি দেখে ফেলেছেন; কাজেই, পরমুহূর্তেই কানে একটি মোক্ষম মোচড় খেয়ে আগ্‌গাগের মুখে হাসির বদলে ফুটে উঠল যন্ত্রণার আর্তনাদ।

তার মা গোদাগোদা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "জাদু আমার! কে শুধুশুধু এমন করে কান মলে দিলে রে! বাছা রে!"

বাপ চটে উঠে বললেন, "শুধুশুধু নয়! বাঁধা আয়ের পয়সা থেকে সংসার খরচ মেটাতে হয় আমাকেই, বুঝেছ? ঐ অতখানি মাখন যে বরবাদ হল, সেটা আমারই লোকসান! আমার কথা কানে গেছে?" "মুখ সামলে কথা বল!" খুব শান্তস্বরে—প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কথাগুলো বললেও মহিলার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যাতে সাব-ওয়ার্ডেন আর কথা বলতে সাহস পেলেন না। "দেখছ না, এটা ঠাট্টা! আর, কেমন মজার ঠাট্টা! ও বোঝাতে চেয়েছে যে,

সিল্‌ভিকে ছাড়া আর কাউকে ও ভালোবাসে না! কোথায় খুশি হবে, তা নয়, ঝগড়ুটে মেয়েটা কি-না তেজ দেখিয়ে চলে গেল!"

চট করে অন্য কথা পাড়তে সাব-ওয়ার্ডেনের জুড়ি নেই। জানলার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, "আরে, তোমাদের ফুলগাছের কেয়ারির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওটা একটা শুয়োর না?"

"শুয়োর!" বলে চীৎকার করে উঠে তাঁর স্ত্রী-রত্নটি পাগলের মতো জানলার কাছে ছুটে গিয়ে, স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে দেখতে দেখতে বললেন, "কাদের শুয়োর? কী করে ঢুকল? মালিটা গেল কোন্ চুলোয়?"

এই সময়ে ব্রুনো আবার ঘরে এসে ঢুকল। আগ্‌গাগ্ সবাইকার নজরে পড়বার জন্যে প্রাণপণে কেঁদে চলেছে; এমনভাবে তার পাশ কাটিয়ে ব্রুনো এল, যেন এ-সব দেখে দেখে ওর চোখ পচে গেছে। দৌড়ে সিল্‌ভির কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার পর করুণ মুখ করে বললে, "আমার পুতুলের আলমারিটায় দেখতে গিয়েছিলুম তোমায় উপহার দেবার মতো যদি কিছু পাওয়া যায়। দেখলুম কিছু নেই! সব ভাঙা, একটাও আস্ত নেই! আমার কাছে আর পয়সাও নেই, যে তোমার জন্মদিনের উপহার কিনি। তাই, এইটা ছাড়া তোমায় আর অন্য কিছু দিতে পারলুম না!" ('এইটা' হচ্ছে জড়িয়ে ধরে খুব আদরের একটা চুমু।)

সিল্‌ভি বলে উঠল, "ওহ, অনেক অনেক ধন্যবাদ, সোনা-ভাই। তোমার উপহারটাই সবচেয়ে ভালো!"

সাব-ওয়ার্ডেন ওদের দিকে ফিরে সিড়িঙ্গে হাতে ওদের মাথা থাবড়ে বললেন, "এবার তোমরা যাও তো বাছা; আমাদের একটু কাজের কথা আছে!"

হাত ধরাধরি করে সিল্‌ভি আর ব্রুনো চলে গেল; কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে সিল্‌ভি আবার ফিরে এল; সসঙ্কোচে আগ্‌গাগের কাছে গিয়ে বললে, "মাখন ফেলার জন্যে আমি কিছু মনে করি নি। আর—আর তোমার বাবার কাছে—তোমার লেগেছে বলে আমি দুঃখ পেয়েছি।" বদমায়েসটার সঙ্গে হাতে-হাত মেলাবার জন্যে চেষ্টা করলে সিল্‌ভি; কিন্তু আগ্‌গাগ্ তার বদলে আকাশ-পাতাল হাঁ করে আরো জোরে ককিয়ে উঠল, কিছুতেই ভাব করলে না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিল্‌ভি বেরিয়ে গেল।

সাব-ওয়ার্ডেন এবার কট্‌মট্‌ করে ছেলের দিকে চাইলেন। তার পর যতটা সাহসে কুলল, চীৎকার করে বললেন, "সিরা, ঘর থেকে চলে যাও।" সিরা, অর্থাৎ চ্যান্সেলর। তাঁর স্ত্রী তখনো জানলায় ঝুঁকে পড়ে দেখছেন আর বলছেন, "শুয়োরটাকে দেখতে পাচ্ছি না তো! কোথায় গেল?"

জানলার উল্টো দিকে মুখ করে বসেছিলেন সাব-ওয়ার্ডেন, তবু সেই অবস্থাতেই বলতে লাগলেন, "ঐ ডানদিকে গেছে, এইবার একটু বাঁদিকে ফিরল—" আর, সেই সঙ্গে, আগ্‌গাগ্‌ আর দরজার দিকে দেখিয়ে মাথা নেড়ে, চোখ মট্‌কে চ্যান্সেলরকে নানারকম ইশারা করতে লাগলেন।

চ্যান্সেলর শেষপর্যন্ত ইশারার মানেটা ধরতে পারলেন; সোজা আগ্‌গাগের কাছে এসে তার কানটি পাকড়ালেন—পরমুহূর্তেই দেখা গেল, দুজনেই ঘরের বাইরে। তবে, তার আগে কান-ফাটানো যে চীৎকারটি শোনা গেল, মমতাময়ী জননীকে সচকিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট।

হতভম্ব স্বামীর দিকে ফিরে তিনি কড়া গলায় বললেন, "কী বিদিকিচ্ছিরি চীৎকার! কিসের বল তো?"

সাব-ওয়ার্ডেন বললেন, "হায়না-টায়না হবে।" বলবার সময়ে এমন শূন্য দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলেন, যেন ওখানেই সাধারণত হায়না দেখতে পাওয়া যায়। তার পর আবার বললেন, "এবার কাজের কথায় আসা যাক। ওয়ার্ডেন আসছেন।" এই বলে মেঝেতে পড়ে-থাকা একটা লেখা কাগজ তুলে নিলেন; দেখতে পেলুম তাতে লেখা রয়েছে, 'সেই নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হবার পর, সিবিমেট এবং তাঁর স্ত্রী, টাবিকট্‌ তাঁদের ইচ্ছামতো সার্বভৌম—' কিন্তু, আর কিছু চোখে পড়বার আগে সাব-ওয়ার্ডেন হাতের মুঠোয় কাগজটাকে দলা পাকিয়ে ফেললেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শয়তানী ষড়যন্ত্র

এই সময়ে ওয়ার্ডেন ঘরে এসে ঢুকলেন; আর তাঁর পিছন-পিছন এলেন লর্ড চ্যান্সেলর, হাঁস্‌ফাঁস্‌ করছেন, মাথার পরচুলটা ঠিক করে বাগিয়ে নিচ্ছেন—কে যেন টান মেরে সেটা এলোমেলো করে দিয়েছে মনে হল।

হিসাবের খাতা আর নানান কাগজপত্রে ভরা একটা টেবিল ঘিরে সবাই বসতে না বসতেই দেবী চীৎকার করে উঠলেন, "কিন্তু, আমার সোনার চাঁদ ছেলে কোথায় গেল?"

সাব-ওয়ার্ডেন অল্প কথায় সেরে দিলেন, "একটু আগেই তো লর্ড চ্যান্সেলরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।"

বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে ওয়ার্ডেন জানালেন, "সব ঠিক হয়ে গেছে! সাব-ওয়ার্ডেন বলে আর কিছু রইল না; আর আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই ভাইস-ওয়ার্ডেন হিসেবে কাজ করবে। আমি তো দিনকয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, কাজেই, এখন থেকেই ও কাজের দায়িত্ব নেবে। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছে—" বলে বিরাট একটা পাকান কাগজ খুলে সোজা করতে করতে বললেন, "—গরিবদের ওপর দরদ দেখাতে হবে।"

চ্যান্সেলর এতক্ষণ ধরে আরো অনেক পাকান কাগজ নিয়ে

নাড়াচাড়া করছিলেন, একবার এটা খুলছেন, একবার ওটা পাকাচ্ছেন; ওয়ার্ডেন যে কাগজ থেকে পড়লেন, টেবিলের ওপর সেটাকে রাখবার জন্যে অন্য-সব কাগজপত্র সরিয়ে-টরিয়ে জায়গা করতে লাগলেন। এইভাবে হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে তিনি বললেন, "এগুলো সব এমনি লেখা, মানে অনেক কাটাকুটি আছে। আসলটায় একটু-আধটু শুধরে নিলেই—মানে কোথাও এক-আধটা সেমিকোলন দিতে হয়তো ভুল হয়ে গেছে—সেগুলো বসিয়ে নিলেই—" বলতে বলতে তিনি সেই কাগজটার এখানে-ওখানে কলম দাগাতে লাগলেন, সেই-সব জায়গার ওপর বুটিং-কাগজ থাবড়াতে লাগলেন "—আপনার সই করবার পক্ষে আর কোনো বাধা থাকবে না।"

দেবী জিগেস করলেন, "তার আগে একবার পড়া হবে না?"

সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে-ফুঁড়ে সাব-ওয়ার্ডেন আর চ্যান্সেলর সমস্বরে বলে উঠলেন, "কোনো দরকার নেই, কোনো দরকার নেই!"

ওয়ার্ডেন শান্তস্বরে সায় দিলেন, "কোনোই দরকার নেই। তোমার স্বামী আর আমি দুজনে মিলে পুরোটা দেখে নিয়েছি। ওতে ব্যবস্থা হয়েছে যে ওয়ার্ডেনের পুরো ক্ষমতা তার ওপর বর্তাবে এবং যে-সব রাজস্ব ওয়ার্ডেনের এক্তিয়ারে আসে, তা খরচ করবার অধিকার তার থাকবে—অবশ্য আমি ফিরে আসার আগে পর্যন্ত, কিম্বা যদি আমি ফিরে না-আসি, তাহলে ব্রুনো সাবালক হবার আগে পর্যন্ত। তখন, অর্থাৎ আমি ফিরে এলে বা ব্রুনো সাবালক হলে, যারই হাতে হোক, সে রাজস্বের উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দেবে, আর, রাজকোষের সমস্ত অর্থও ফেরত দেবে। এই রাজকোষের অর্থ তার তত্ত্বাবধানে থাকবে শুধু, তা থেকে খরচ করা চলবে না।"

এতক্ষণ কিন্তু সাব-ওয়ার্ডেন আর চ্যান্সেলরে মিলে কাগজপত্রগুলো পাশের দিকে সরিয়ে সরিয়ে কেবলই ওয়ার্ডেনকে সইয়ের জায়গাটা দেখাচ্ছেন। ওয়ার্ডেনের সইয়ের পর সাব-ওয়ার্ডেন নিজে সই করলেন, তার পর সাক্ষী হিসেবে সই করলেন দেবী এবং চ্যান্সেলর।

ওয়ার্ডেন বললেন, "অল্প দিনের বিচ্ছেদই সবচেয়ে ভালো। আমার সব তৈরি। ছেলেমেয়েরা আমায় বিদায় দেবে বলে নীচে অপেক্ষা করে আছে।" সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

গাড়ির চাকার শব্দে যেই বোঝা গেল যে, ওয়ার্ডেনের কান এখন পাল্লার বাইরে, তখন ওরা তিনজনে মিলে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল ; দমকে দমকে সে কী তুমুল হাসি, আমি তো দেখে অবাক !

চ্যান্সেলর বললেন, "কী রগড়টাই না হল, ওঃ কী রগড় !" ভাইস-ওয়ার্ডেনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দুজনে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগলেন। দেবীর নাচতে সম্ভ্রমে বাধল, তাই তিনি ঘোড়ার ডাকের মতো শব্দ করে লুটোপাটি খেয়ে হাসতে লাগলেন আর মাথার ওপর রুমালটা ঘোরাতে লাগলেন ; মাথায় ঘিলু কম হলেও এটা তিনি ধরতে পেরেছেন যে, একটা খুব চালাকি খেলা হয়েছে, তবে সেটা যে ঠিক কী, তা এখনো ধরতে পারেন নি।

কথা বলার মতো ফাঁক পেয়েই তিনি বললেন, "বলেছিলে যে ওয়ার্ডেন চলে গেলেই আমায় সব বলবে ?"

ব্লটিং কাগজটা সরিয়ে, তার তলায় পাশাপাশি রাখা দুটো একই রকম দলিলের কাগজ দেখিয়ে তাঁর স্বামীটি বললেন, "বলব না তো কী ! এই দেখ, এইটা ও পড়েছে, কিন্তু সই করে নি ; আর, এইটায় ও সই করেছে, কিন্তু পড়ে দেখে নি ! এই দেখ-না, শুধু সই করবার জায়গাটা ছাড়া, আর সমস্তটা ঢাকা দেওয়া ছিল !"

"তাইতো, তাইতো !" বলে তাঁর স্ত্রী দুটো দলিল নিয়ে মেলাতে বসলেন। "—'ওয়ার্ডেনের অনুপস্থিতিতে তিনি ওয়ার্ডেনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।' আরে, তার বদলে লেখা হয়েছে দেখছি, 'জনসাধারণ যদি তাঁকে নির্বাচিত করে তা হলে তিনি সারাজীবন নিরঙ্কুশভাবে শাসনকর্তা হয়ে থাকবেন এবং সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হবেন।' তার মানে ! তুমি কী সম্রাট হয়ে গেলে নাকি গো ?"

ভাইস-ওয়ার্ডেন উত্তরে বললেন, "এখনো নয়, এখনো নয়। এখনো এ দলিল কাউকে দেখান ঠিক হবে না। ঠিক সুযোগমতো সব হবে।"

দেবী-সাহেবা ঘাড় নেড়ে আবার পড়তে লাগলেন, " 'গরিবদের ওপর দরদ দেখাতে হবে'—এ কথাটা তো একদম উড়িয়েই দেওয়া হয়েছে, দেখছি !"

স্বামী বললেন, "অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ও হতভাগাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে আমাদের বয়েই গেছে !"

"এই তো চাই," বলে তাঁর গিন্নী-সাহেবা আবার পড়লেন। " 'রাজ-কোষের সব ধনসম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে' কথাটার বদলে লেখা হয়েছে দেখছি—'সম্পূর্ণ ভাইস-ওয়ার্ডেনের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা চলবে!' ওঃ, সিবি! (সাব-ওয়ার্ডেনের নাম সিবিমেট) চালাকি একটা দেখালে বটে! কত সব জড়োয়া গয়না, ভাব তো! এখুনি গিয়ে সব পরব ?"

স্বামীরত্ন একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "না, এক্ষুনি নয়, জন-সাধারণের মন এখনো ঠিক তৈরি হয় নি। খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। অবশ্য, ভালোয় ভালোয় একটা নির্বাচন সেরে ফেলতে পারলেই 'সম্রাট' উপাধিটা নিয়ে নেওয়া যাবে। তবে, ওয়ার্ডেন বেঁচে থাকতে ঐ-সব গয়না-পত্তর যদি আমরা ব্যবহার করি, সেটা ওরা সহ্য করবে না। ওয়ার্ডেন মারা গেছে, এইরকম একটা খবর রটাতে হবে। একটা ছোটোখাটো ষড়যন্ত্র—"

দেবী-সাহেবা আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র আমার সবচেয়ে ভালো লাগে! ভারি মজার ব্যাপার!"

ভাইস-ওয়ার্ডেন আর চ্যান্সেলরের মধ্যে চোখের ইশারা হয়ে গেল। ধড়িবাজ চ্যান্সেলর ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, "ওঁকেই প্রাণভরে ষড়যন্ত্র করতে দিন-না! তাতে কোনো ক্ষতি নেই!"

"তা হলে কখন ষড়যন্ত্রটা—"

"শ্‌-শ্‌" করে স্বামীপুঙ্গব তাঁকে থামিয়ে দিলেন, দেখা গেল দরজা খুলে সিল্‌ভি আর ব্রুনো ঘরে এসে ঢুকছে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে, ব্রুনো তার দিদির কাঁধে মাথা গুঁজে তখনো ফোঁপাচ্ছে। সিল্‌ভি গম্ভীর আর শান্ত, কিন্তু গাল বেয়ে জলের ধারা।

ভাইস-ওয়ার্ডেন খিঁচিয়ে উঠলেন, "অমন করে কাঁদতে হবে না!" কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ওদের একটু ভোলাও না!"

দেবী-সাহেবা চট করে মতলব ঠিক করে ফেললেন; বিড়্‌বিড়্‌ করে বললেন, "কেক।" তার পর আলমারির কাছে গিয়ে দু টুকরো কেক বার করে নিয়ে এলেন। সাদাসাপ্টা ভাষায় হুকুম দিলেন, "খাও, কেঁদো না!" বেচারা ভাই-বোনে পাশাপাশি বসে পড়ল, কিন্তু তখন তাদের খাবার রুচি নেই।

আবার দরজা খুলল—বরং বলা যায় হড়াম করে দরজার পাল্লা-দুটো হাট হয়ে গেল, আর আগ্‌গাগ্‌ ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে চ্যাচাতে লাগল, "সেই বুড়ো ভিখিরিটা আবার এসেছে গো !"

ভাইস-ওয়ার্ডেন সবে বলতে শুরু করেছেন, "খাবার-টাবার কিচ্ছু পাবে না—" চ্যান্সেলর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, চাকরদের বলা আছে কী করতে হবে।"

জানলার কাছে গিয়ে নীচের চত্বরের দিকে দেখতে দেখতে আগ্‌গাগ্‌ বললে, "এই যে, এইখানে রয়েছে !"
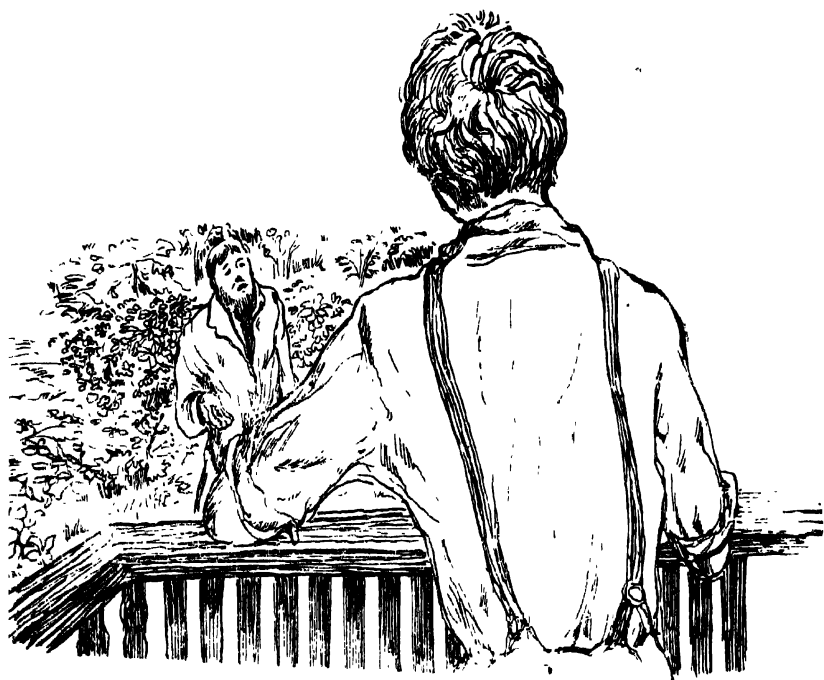
ক্ষুদে শয়তানটার গলা জড়িয়ে ধরে মমতাময়ী জননী বললেন, "কোথায়, মানিক ?" আমরা সবাই (ব্রুনো আর সিল্‌ভি বাদে, কারণ এ-সব দিকে তখন ওদের মন নেই) তাঁর পেছন পেছন জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। বুড়ো ভিখিরি মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইলে, উপোসী চোখ। করুণস্বরে বললে, "একটুকরো রুটি, হজুর-

বাহাদুর !” বৃদ্ধটির চেহারা বেশ ভদ্র, তবে খুব কাহিল আর জীর্ণ। আবার বললে, “একটুকরো রুটি কেবল ভিক্ষে চাইছি, আর, একটু জল !”

আগ্গাগ্ বাজখাঁই গলায় বললে, “এই নাও, জল দিচ্ছি, খাও !” বলেই এক জাগ জল তার মাথায় ঢেলে দিলে।

ভাইস-ওয়ার্ডেন বলে উঠলেন, “সাবাস বেটা ! এমনি করেই এদের ব্যবস্থা করতে হয় !”

ওয়ার্ডেন-পত্নী পোঁ ধরলেন, “ছেলের আমার কী বুদ্ধি !”

ভিখিরি তখন তার শতছিন্ন পোশাক থেকে জল ঝাড়তে ঝাড়তে আবার কাতর চোখে ওপর দিকে চাইছিল, ভাইস-ওয়ার্ডেন চীৎকার করে বললেন, “একটা লাঠি নিয়ে এস তো কেউ !”

দেবী-সাহেবা আবার পোঁ ধরলেন, “গন্‌গনে লাল একটা লোহার শিক আনুক-না !”

হাতের কাছে গন্‌গনে লাল শিক পাওয়া গেল না বোধ হয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো লাঠি এসে হাজির হল, আর তার সঙ্গে ভিখিরির চারিধার ঘিরে অনেকগুলো ভয়ংকর মুখ। শান্তভাবে তাদের হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে সে জানাল, “আমার এই বুড়ো হাড় কখানা আর ভেঙে কী হবে, আমি চলে যাচ্ছি। একটুকরো রুটিও জুটল না !”

আমার পাশ থেকে কান্না-ভেজা কচি গলার আওয়াজ শোনা গেল, “আহা, বুড়ো বেচারি !” ব্রুনো তার কেকের টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সিল্‌ভি তাকে ধরে রেখেছে।

সিল্‌ভির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে রাগে ছট্‌ফট্ করতে করতে ব্রুনো বলছে, “আমার কেকটা দেবই ওকে !”

সিল্‌ভি মোলায়েম গলায় বললে, “নিশ্চয়ই দেবে সোনা ! কিন্তু অমন করে ছুঁড়ে দিও না ! দেখছ না, ও চলে গেছে ? চল, ওকে ধরি গিয়ে।” বলে, ব্রুনোর হাত ধরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের কেউ তাদের লক্ষ্য করলে না, সবাই বুড়োকে দেখতেই ব্যস্ত।

তার পর তিন ফন্দিবাজ যে যার জায়গায় এসে বসে চাপা গলায় কথাবার্তা চালাতে লাগলেন, যাতে আগ্গাগ্ শুনতে না পায়। সে তখনো জানলায় দাঁড়িয়ে।

দেবী-সাহেবা বললেন, "ভালো কথা, ওয়ার্ডেন হিসেবে ব্রুনোর উত্তরাধিকার নিয়ে কী যেন একটা কথা ছিল। নতুন দলিলে সেটার কী গতি হয়েছে?"

মুখ টিপে হেসে চ্যান্সেলর বললেন, "প্রতিটি অক্ষর একইরকম রাখা হয়েছে, শুধু একটি বাদে, দেবী-সাহেবা। ব্রুনোর নামের বদলে আমি নিজে থেকেই বসিয়ে দিয়েছি—" গলাটা একটু নামিয়ে কথাটা শেষ করলেন—"আগগাগের নামটা, বুঝলেন কি-না।"

রাগে আর ঘেন্নায় থাকতে না পেরে আমি বলে উঠলুম, "আগগাগ্, বটে!" ঐ একটা কথা মুখ দিয়ে বার করতেই যেন আমার দম বেরিয়ে গেল; তবে যেই কথাটা চীৎকার করে বলে ফেললুম, সঙ্গে সঙ্গে একটা দম্‌কা হাওয়ায় সব কিছু যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল, আর আমি দেখলুম রেলের কামরায় বসে আমার সামনের বেঞ্চির কোণে-বসা সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে রয়েছি। মেয়েটির মুখের ওপর এখন আর ওড়নার আবরণ নেই, সকৌতুক বিস্ময়ে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভিখারির প্রাসাদে

ঘুমের চটকা ভাঙবার সময়ে কিছু একটা যে বলেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, নিজের হেঁড়ে গলার চাপা চীৎকার তখনো আমার কানে বাজছে, মেয়েটির অবাক চাউনির প্রমাণটা নাহয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু, এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার জন্যে কী বলে ক্ষমা চাই ?

শেষ অবধি আমতা আমতা করে বললুম, "আপনাকে চমকে দিই নি তো ? কী যে বলেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না, স্বপ্ন দেখছিলাম।"

তিনি বললেন, "আপনি বলেছিলেন, 'আগ্গাগ্, বটে !' " বলতে-বলতে কাঁপা ঠোঁটদুটোকে সামলাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে মুচকি হাসিটা চাপা পড়ল না। "তবে, আপনি 'বলেছিলেন' বললে ঠিক বলা হয় না, আপনি 'চেঁচিয়ে' উঠেছিলেন !"

"আমি খুব দুঃখিত," এইটুকুই শুধু বলতে পারলুম ; খুব অনুতাপ আর অসহায় বোধ হতে লাগল। মনে মনে বললাম, 'ঠিক সিল্ভির মতো ওর চোখদুটো !' ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কেটেছে কি-না, তখনো খট্কা রয়ে গেছে। 'আর, সরল বিস্ময়ভরা ঐ যে চাউনি, সেও তো সিল্ভির। কিন্তু সিল্ভির মুখে তো অমন অটল সঙ্কল্পের ছাপ নেই—

আর, বেদনার স্বপ্নমাখা অমন দূরে-ভেসে-যাওয়া চোখের দৃষ্টি,

এও তো সিল্‌ভির নয়; অনেক দিন আগেকার কোনো গভীর বেদনা যেন মাখান রয়েছে চোখে--' কল্পনার জোয়ারে মেয়েটির পরের কথাগুলো ভালো করে কানে আসছিল না।

মেয়েটি বলতে লাগল, "আপনার হাতে যদি সস্তা দামের কোনো লোমহর্ষক বই থাকত—ভূত-পেত্নীর গল্প, বা নিশুতি রাতে খুনোখুনির গল্প তা হলেও নাহয় বোঝা যেত; যতই সস্তা হোক, ভয়ের স্বপ্নই যদি না দেখা যায়, সেটুকু দামও তো উঠবে না। কিন্তু, কী বলব ডাক্তারির বই নিয়ে কি-না—" বলে সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার বইটার দিকে তাকাল; সেই বইটা পড়তে পড়তেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তার এই আলাপীভাব আর খোলাখুলি কথাবার্তায় প্রথমে আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু মেয়েটির—মেয়েটিরই বলব, কারণ দেখলে কুড়ি পার হয়েছে বলে মনে হয় না—ব্যবহারের মধ্যে কোথাও প্রগল্‌ভতা নেই বা ধৃষ্টতা নেই। কোনো দেবদূত হঠাৎ পৃথিবীতে এসে পড়লে এখানকার সমাজের বাঁধাধরা আচার-ব্যবহার বা বর্বর আচার-ব্যবহারের সঙ্গে যেমন খাপ খায় না, এ যেন ঠিক তেমনি; সব কিছুই তার নিষ্পাপ সরলতায় ভরা। মনে মনে ভাবলাম, 'আর দশ বছর বাদে সিল্‌ভিকেও এইরকম দেখাবে, সিল্‌ভির কথাও এইরকম শোনাবে।'

বললাম, "খুব একটা ভয়ংকর না হলে ভূতে তোমার রুচি নেই, বল?"

"ঠিক তাই। রেলের ভূত--মানে রেলগাড়িতে পড়বার জন্যে ইস্টিশানে যে-সব সস্তার ভৌতিক কাহিনী পাওয়া যায়, সেই-সব ভূতেরা একেবারে কোনো কম্মের নয়।"

এই সময়ে কামরার দরজা খুলে ধরে গার্ড-সাহেব বললেন, "ফেফিল্ড জংশন এসে গেছে, এল্‌ভেস্টন-এর জন্যে গাড়ি বদল করতে হবে!" মালপত্তর নিয়ে আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম।

এই জংশন ইস্টিশানে যাত্রীদের অপেক্ষা করবার জন্যে জায়গাই নেই বলতে গেলে—একটিমাত্র কাঠের বেঞ্চি, তাতে তিনজন বসতে পারে; তাও পুরোটা খালি নয়। একজন অতিবৃদ্ধ লোক ঢিলে আলখাল্লার মতো পোশাক পরে সেই বেঞ্চির একধারে বসে আছেন;

লাঠিটার মাথায় দুটি হাত জড়ো করে তার ওপর থুতনির ভর রেখেছেন, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখে ক্লান্তির ছাপ।

স্টেশনমাস্টার বুড়ো লোকটির কাছে গিয়ে রুক্ষভাবে বললেন, "ওহে, এখান থেকে ওঠ তো, এঁদের জন্যে জায়গা করে দাও!" তার পর একেবারে অন্য গলায় বললেন, "এই যে, এ দিকে আসুন। দয়া করে যদি একটু বসেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেন এসে পড়বে!" স্টেশন-মাস্টারের এই বশম্বদ ভৃত্যের মতো ব্যবহারের কারণটা বুঝতে দেরি হল না, মালপত্তরের গায়ে-আঁটা লেবেলের ওপর মালিকের নাম লেখা রয়েছে: 'লেডি মুরিয়েল অর্ম, ফেফিল্ড জংশন হয়ে এল্‌ভেস্টন যাবেন।' বৃদ্ধ লোকটি আস্তে-আস্তে উঠে কাঁপা-কাঁপা পায়ে প্ল্যাটফর্মের একদিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু এ-সব কিছুই মেয়েটির চোখে পড়ে নি। লাঠিতে ভর দিয়ে খেদিয়ে-দেওয়া বুড়োটি কোনোরকমে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকে একবার তাকিয়ে সে বেঞ্চিতে এসে বসল, আমায় বসতে জায়গা দিলে।

দু-একটা কথাবার্তা বলতে না-বলতেই আমাদের ট্রেন এসে লাগল প্ল্যাটফর্মে। কুলিরা ব্যস্ত হয়ে কামরার দরজা খুলে ধরল, তার মধ্যে একজন আবার সেই বুড়ো মানুষটিকে ধরে ধরে একটা থার্ডক্লাশ কামরায় তুলে দিলে, আর একজন খুব খাতির করে আমাদের নিয়ে গেল ফার্স্টক্লাশ কামরায়—যেন আমাদের খাস-চাকর।

যাবার আগে মেয়েটি অন্যান্য যাত্রীদের দেখছিল, বুড়োর দিকে চোখ পড়তেই বললে, "আহা রে, বুড়ো মানুষ! মনে হচ্ছে খুব অসুস্থ আর দুর্বল! ওভাবে ওকে তাড়িয়ে দেওয়াটা বড়ো গর্হিত কাজ হয়েছে। খুব খারাপ লাগছে আমার—" বুঝলুম, কথাগুলো আমায় বলা হচ্ছে না, নিজের মনেই বলছে সে। কামরার সামনে এসে আগে ওকে উঠতে দিয়ে তার পর নিজে উঠলুম। তার পর বসে বসে আবার কথাবার্তা হতে লাগল।

মেয়েটি বললে, "রেলগাড়ির দৌলতে আর কিছু হোক না-হোক, একটা জিনিস হয়েছে—নতুন একধরনের সাহিত্য গজিয়ে উঠেছে। এই যে সব পাতলা পাতলা বই, ভয়ানক লোমহর্ষক সব গল্প, যার পনেরোর পাতায় খুন, আর চল্লিশের পাতায় বিয়ে—এ-সবই কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে এই বাষ্পে-চলা রেলগাড়ির দৌলতে।"

"আর, তোমার এই সিদ্ধান্তের জের টানতে যদি আপত্তি না-থাকে তো বলি, যখন বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেনের যুগ আসবে, তখন পাতলা বইয়ের বদলে পাওয়া যাবে আরো চটি দু-চার পাতার পুঁথি, তাতে খুন আর বিয়ে থাকবে একই পাতায়।"

সে বললে, "একেবারে ডারুইনের মতো বললেন যে! তবে, জেরটা উল্টো দিকে টানা হয়ে গেল, এই যা; ইঁদুর থেকে হাতিতে না গিয়ে, আপনি হাতি থেকে ইঁদুরে এলেন!"

এই সময়ে ট্রেনটা একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল, আর, আমি চোখ বুজিয়ে, পেছনে মাথা হেলিয়ে হালে-দেখা একটা স্বপ্নের টুকরো টুকরো কয়েকটা ঘটনার কথা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

তন্দ্রার ঘোরে বিড়্‌বিড়্ করে বলতে লাগলুম—"মোর মনে হয় দেখতে পেলুম-·" তার পর কথাগুলো আপনা থেকেই যেন ধাতুরূপের মতো পাল্টে যেতে লাগল—"তার মনে হয় দেখতে পেল—তোর মনে হয় দেখতে পেলি—" আর, তার পর হঠাৎ সব মিলিয়ে একটা গান হয়ে গেল:

'তার মনে হয়, দেখছে সে এক হাতি
বাঁশি নিয়ে দিচ্ছে কেবল সিটি;
আবার দেখে টের পেল, তা নয়,
বৌ লিখেছে লম্বা সে এক চিঠি।
বললে, "এতক্ষণে পেলুম টের
জীবন-ভরা কেবল খিটিমিটি"।'

এইরকম খ্যাপাটে গান গাইছে কে? দেখে মনে হয় একজন মালি—তবে, হাতের রেকটা নিয়ে যেরকম তলোয়ারের মতো ঘোরাচ্ছে, মনে হয় একটু খ্যাপাটে—ঘনঘন যেরকম নেচেকুঁদে লম্ফঝম্প করছে, মনে হয় পাগল—গানের শেষটা যেরকম চিল-চীৎকার করে গাইলে, মনে হয়·বদ্ধ উন্মাদ।

পা দুটো তার নিজের বর্ণনা মতোই বটে, হাতির মতো; কিন্তু দেহের বাকিটা অস্থিচর্মসার; আর তার চারিধারে যে-সব আল্গা খড়ের রাশ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, আসলে খড় ভরেই ওকে তৈরি করা হয়েছিল, তবে প্রায় সবটাই বেরিয়ে গেছে।

সিল্‌ভি আর ব্রুনো গানের প্রথম কলিটা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শেষ হতে সিল্‌ভি একাই এগিয়ে গিয়ে (ব্রুনো নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল, হঠাৎ কিসের লজ্জা, কে-জানে) ভয়ে ভয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, "একটু শুনবেন দয়া করে—আমার নাম 'সিল্‌ভি'।"

মালি বললে, "ঐ বস্তুটি কে?"

চারদিকে চোখ বুলিয়ে সিল্‌ভি বললে, "কোন বস্তু?—ওঃ, ও আমার ভাই, ব্রুনো।"

খুব উৎসুকভাবে মালি শুধোলে, "গতকাল কি ও তোমার ভাই ছিল?"

"নিশ্চয়ই ছিলাম!" ইতিমধ্যে ব্রুনো কখন গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে, তাকে বাদ দিয়ে দিব্যি কথাবার্তা চলছে, এটা তার পছন্দ হয় নি।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ধাঁচের আওয়াজ করে মালি বললে, "যাক, ভালো কথা। এখানে সবকিছু এমন পাল্টে যায়। যখনই দ্বিতীয়বার কোনো দিকে তাকাই, দেখি বিলকুল অন্য হয়ে গেছে! তা সত্ত্বেও, আমার কাজ আমি ঠিকই করে যাই! পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সেই কেঁচো-জাগা ভোরে রোজ উঠি—"

ব্রুনো বললে, "আমি হলে, অত সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠতাম না।" তার পর সিল্‌ভির দিকে চেয়ে বললে, "তার মানে তো কেঁচো বনে যাওয়া, কী বিচ্ছিরি!"

সিল্‌ভি বললে, "কিন্তু সকালবেলা কুঁড়েমি করতে নেই, জান তো ব্রুনো। মনে রেখ, ভোরের পাখিরাই কেঁচো ধরতে পারে।"

ছোট্টো একটা হাই তুলে ব্রুনো বললে, "তা ধরে, ধরুক! আমি বাবা কেঁচো খেতে চাই না, একটুও না। ভোরের পাখিরা সব কেঁচোদের সাফ করে দিলে, তবে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি!"

মালি বলে উঠল, "বাজে কথা বলতে মুখে একটুও আটকায় না দেখছি!"

ব্রুনো চট করে উত্তর দিলে, "বাজে কথা বলতে মুখ লাগে না-কি? ঠোঁট হলেই তো হয়।"

সিল্‌ভি বুদ্ধি করে অন্য কথা পাড়লে, "এই-সব ফুলগাছ কি তোমার পোঁতা না-কি? কী সুন্দর বাগান করেছ! ইচ্ছে করে এখানেই বরাবর থেকে যাই, জান!"

মালি বলতে শুরু করলে, "কিন্তু শীতকালের রাত্তির বেলা—"

সিল্‌ভি বাধা দিয়ে বললে, "কিন্তু, যেজন্যে এলুম, সেটাই বলা হল না। একজন খুব গরিব ভিখিরি এইমাত্র বেরিয়ে গেল—তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে—ব্রুনো তাকে ওর কেকটা দিতে চায়, বুঝলে।"

পকেট থেকে চাবি বার করে বাগানের পাঁচিলের গায়ে লাগান দরজাটা খুলে দিতে দিতে মালি বললে, "তাড়াতাড়ি ফিরে এস কিন্তু!" ওরা দরজা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল, আর, মালি দরজাটা বন্ধ করে ফেলবার আগেই, আমিও ওদের পিছু নিলাম।

রাস্তায় পড়ে হন্ হন্ করে খানিকটা এগোতেই সিকি মাইলটাক দূরে সেই বুড়ো ভিখিরিকে দেখতে পাওয়া গেল, আর, সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো আর সিল্‌ভি তাকে ধরবার জন্যে দৌড় লাগাল। খুব তাড়াতাড়ি আর স্বচ্ছন্দে পথটুকু পার হল তারা, আর, আমিও কী করে যে এত সহজে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিলুম, বুঝলুম না। অন্য সময়ে হলে এই নিয়ে হয়তো ভাবতে বসে যেতুম, কিন্তু এখন মন আমার অন্য দিকে।

বুড়ো ভিখিরিটা নিশ্চয় বদ্ধ কালা, কারণ ব্রুনো যে অত চীৎকার করছে, কিছুই তার কানে গেল না, থামল না, পা টেনে টেনে ক্লান্তিভরে চলতেই লাগল; ব্রুনো তার সামনে গিয়ে কেকের টুকরোটা বাড়িয়ে ধরতে, তবে থামল। কচি ছেলেটা হাঁপিয়ে সারা, ভালো করে কথা বলতে পারছে না, কোনোরকমে বললে, "কেক!"

বুড়ো লোকটি ব্রুনোর হাত থেকে কেকের টুকরোটা ছিনিয়ে ক্ষুধিত জানোয়ারের মতো গোগ্রাসে গিলতে লাগল, কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে একটা কথাও বললে না তার উপকারী ছোট্টো বন্ধুটিকে, জ্বলজ্বলে চোখে সন্ত্রস্ত ভাই-বোনের দিকে চেয়ে শুধু বলতে লাগল, "আরো, আরো দাও!"

সিল্‌ভির চোখে জল এসে গেছে, বললে, "আর তো নেই। আমারটা আমি খেয়ে ফেলেছি। তোমাকে অমন করে তাড়িয়ে দেওয়া হল, অথচ কিছুই করতে পারলাম না, কী লজ্জা! আমি খুবই দুঃখিত—"

বাকিটা আমার কানে গেল না, কারণ বিস্ময়ের চমকে আমার মাথায় তখন 'লেডি মুরিয়েল অর্ম'-এর সেই কথাগুলো গুনগুন করে উঠছে—সিল্‌ভির মুখের ঠিক এই কথাগুলোই যেন তার মুখে শুনেছি,—হ্যাঁ, ঠিক, সিল্‌ভির গলাতেই শুনেছি, ঠিক সিল্‌ভির মতো কাকুতিভরা কোমল দৃষ্টি দেখেছি তার চোখে!

ঠিক তক্ষুনি সেই বৃদ্ধের গলা কানে এল, "আমার সঙ্গে এস!" রাস্তার ধারের একটা ঝোপের দিকে এমন এক রাজকীয় ভঙ্গিতে হাত নাড়লে সে, যেটা তার জীর্ণ পোশাকের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।
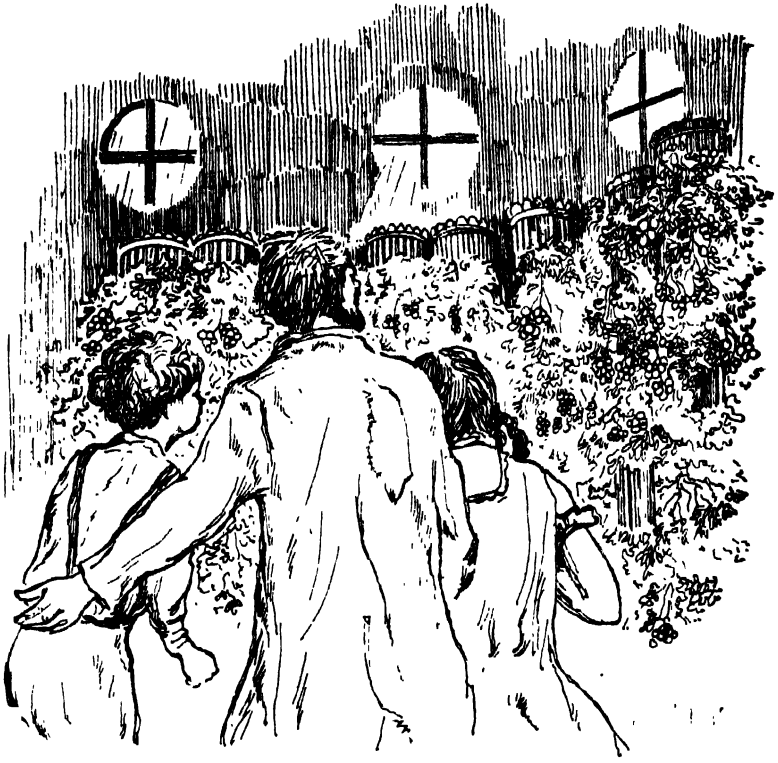
আর, হাতের সেই ইশারার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঝোপটা মাটির নীচে বসে যেতে লাগল। অন্য সময়ে হলে নিজের চোখকেও হয়তো বিশ্বাস করতাম না, অন্তত আশ্চর্য বোধ করতাম, কিন্তু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমার সমস্ত মন তখন পরের ঘটনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

পুরো ঝোপটা যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন দেখতে পেলুম শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নীচে অন্ধকারের মধ্যে নেমে গেছে। বৃদ্ধ আগে আগে চললেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করলুম।

সিঁড়িটা এত অন্ধকার যে, প্রথমে খুব আবছা মতন দেখলুম যে, বৃদ্ধের পেছন পেছন ওরা ভাই-বোনে জড়াজড়ি করে নামছে ; তার পর একটা রুপোলি আলোর আভায় অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে লাগল। কোথাও কোনো বাতি দেখা গেল না, আলোটা শূন্য থেকেই আসছে মনে হল। শেষপর্যন্ত যখন একেবারে নীচের তলার ঘরে এসে পৌঁছলুম, তখন সবকিছু একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

ঘরের আটটা দেওয়াল, প্রত্যেক কোণে সরু একটা করে থাম, তা থেকে সিল্কের পর্দা ঝুলছে। থামের মাঝখানকার দেওয়ালগুলোর প্রায় ছ-সাত ফুট উঁচু পর্যন্ত লতানে গাছে ছেয়ে রয়েছে, পাকা ফল আর রঙ্‌বাহারী ফুলে পাতা প্রায় দেখাই যায় না। অন্য কোনো জায়গায় হয়তো ফুল আর ফল একসঙ্গে দেখে অবাক লাগত, কিন্তু এখানে অবাক লাগল এই দেখে যে, ফুল বা ফল কোনোটাই আমার চেনা নয়। প্রত্যেক দেওয়ালের মাথায় রঙিন কাঁচ-লাগান একটা করে গোল জানলা ; আর একেবারে মাথায় গম্বুজের মতো ছাদ, সমস্তটা যেন মণিমুক্তো দিয়ে সাজান।

অবাক বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ভাবতে লাগলুম, এ কোন্ জগতে এসে পড়েছি ; কোনো দিকে তো দরজা দেখা যাচ্ছে না, দেওয়ালগুলোও সব লতানে গাছে ঢাকা।

সিল্‌ভির কাঁধে একটা হাত রেখে, তাকে চুমু খাবার জন্যে নিচু হয়ে বৃদ্ধ বললেন, "এখানে আর আমাদের কোনো ভয় নেই!" সিল্‌ভি বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল ; কিন্তু পর মুহূর্তেই আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠল, "আরে, এযে বাবা!" দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাতের মধ্যে ধরা দিলে।

ব্রুনোও "বাবা! বাবা!" বলে চেঁচাতে লাগল ; আর, ওদের যখন বুকে জড়িয়ে ধরা আর চুমু খাওয়ার পালা চলেছে, আমি তখন চোখ রগড়ে রগড়ে ভাবছি, সেই ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকটা গেল কোথায়? কারণ সেই বৃদ্ধের পরনে এখন মণিমুক্তো-বসান জরির কাজ-করা রাজার পোশাক, আর মাথার চারদিক ঘিরে একটা সোনার বেড় পরান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জাদু-লকেট

সেই বৃদ্ধের গলা জাপ্টে ধরে, তাঁর গালের ওপর নিজের গোলাপি গালটা ঠেকিয়ে সিল্‌ভি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "এ আমরা কোথায় এলাম, বাবা ?"

"এল্‌ফ্‌ল্যাণ্ড, মা-মণি। ক্ষুদে পরীদের দেশে। পরীর দেশেরই একটা প্রদেশ এটা।"

"কিন্তু আমার ধারণা ছিল, ক্ষুদে পরীদের দেশ অচিন দেশ থেকে অনেক দূরে ; অথচ আমরা তো একটুখানি এলুম !"

"তোমরা যে রাজার রাস্তায় এসেছ। রাজবংশের রক্ত গায়ে না থাকলে ও রাস্তায় কেউ পা ফেলতে পারে না। আমি ক্ষুদে পরীদের দেশের রাজা হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা রাজবংশের ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছ—মাসখানেক হল আমি এখানকার রাজা হয়েছি। আমাকে এখানকার রাজা হবার জন্যে নেমন্তন্ন করে পাঠাবার সময়ে খবরটা যাতে নির্ঘাৎ আমার কাছে পৌঁছোয়, তার জন্যে ওরা দুজন দূতকে পাঠিয়েছিল। একজন ছিল রাজপুত্র, তাই রাজার রাস্তা দিয়েই সে আসতে পেরেছিল আর আমি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতেও পায় নি, অদৃশ্য হয়ে ছিল। অন্য দূতটি ছিল একজন ব্যারন—জমিদার ; কাজেই তাকে সাধারণ রাস্তায় যেতে হয়েছে, আর, আমি নির্ঘাৎ জানি, সে এখনো পৌঁছতেই পারে নি।"

সিল্‌ভি জানতে চাইলে, "তা হলে কত দূর আমরা এসেছি ?"

"মালি দরজা খুলে দেবার পর ঠিক এক হাজার মাইল এসেছ তোমরা !"

ব্রুনো বললে, "এক হাজার মাইল একটা খাব ?"

"মাইল খাবি কী, রাক্কস কোথাকার !"

ব্রুনো বললে, "না না, আমি বলছি, ঐ ফল একটা খাব ?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ খাও, বুঝবে, আনন্দ কাকে বলে—যে আনন্দ পাবার জন্যে আমরা পাগল হয়ে ফিরি অথচ কী শোচনীয়ভাবে তা ভোগ করি।"

ব্রুনো সাত-তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কাছে গিয়ে একটা ফল পেড়ে নিল, তার আকারটা কলার মতন, কিন্তু রঙটা স্ট্রবেরির মতো লালচে। উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে খেতে শুরু করল, খেতে খেতে ক্রমশই মুখটা ভার হয়ে আসতে লাগল, খাওয়া শেষ যখন, তখন বেশ ব্যাজার। বললে, "একদম জলসা, কোনো স্বাদ-ই নেই। মুখে কিছু দিয়েছি বলেই টের পেলুম না !"

সিল্‌ভি বললে, "সব ফল ঐরকম না-কি, বাবা ?"

"তোমরা তো এখনো ক্ষুদে-পরীদের দেশের লোক নও, তাই তোমাদের কাছে সব একরকমই লাগবে, কিন্তু আমি একদম সত্যিকারের ফলের মতোই স্বাদ পাই।"

রাজার হাঁটুর ওপর থেকে ঝট করে নেমে পড়ে ব্রুনো বললে, "অন্য —রকম একটা ফল খেয়ে দেখি তো ! ঐ তো, রামধনুর মতো ডোরা-কাটা একটা ফল রয়েছে !" বলেই সে দৌড় দিল।

পরীর দেশের রাজা আর সিল্‌ভি চাপা গলায় কী সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন, কানে এল না, তাই ব্রুনোর পিছু নিলাম। স্বাদ পাবার আশায় বৃথাই সে নানারকম ফল পাড়ছে আর খেয়ে দেখছে। আমি নিজে দু-একটা পাড়বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বাতাস হাতড়ান ছাড়া কিছুই হাতে ঠেকল না। সিল্‌ভির কাছে ফিরে এলুম।

বৃদ্ধ বলছিলেন, "খুব ভালো করে দেখে বল তো মা, পছন্দ হয় কী-না।"

সিল্‌ভি খুশিতে ফেটে পড়ে বললে, "চমৎকার ! ব্রুনো, শিগ্‌গির দেখে যা।" তার পর, একটা হরতনের আকারের হীরের লকেট উঁচু

করে ধরল, যাতে তার মধ্যে দিয়ে আলো গিয়ে ব্রুনোর চোখে পড়ে। পুরো লকেটটা একটা পাথর থেকে তৈরি, ঘোর নীল তার রঙ, সরু চেনের সঙ্গে লাগান।

ব্রুনো বেশ গম্ভীরভাবে বললে, "ভালোই, সুন্দর ; বলে, লকেটটার গায়ে খোদাই-করা কথাগুলো বানান করে পড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত পড়লে, "সবাই—সিল্‌ভিকে—ভালোবাসবে।" তার পর সিল্‌ভির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "সবাই তো তাই করে! সবাই তো ভালোবাসে সিল্‌ভিকে!"

রাজা লকেটটা হাতে নিয়ে বললেন, "কিন্তু আমরাই তো ওকে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, তাই না ব্রুনো? এবার, এইটা দেখ তো, সিল্‌ভি।" বলে, তিনি আর-একটা লকেট হাতের চেটোয় মেলে ধরলেন ; এটার রঙ গাঢ় লাল, আগেরটার মতোই দেখতে, সরু চেনও লাগান আছে।

উচ্ছ্বাসে দুহাত জড়ো করে ধরে সিল্‌ভি বলে উঠল, "আরো চমৎকার! দেখ ব্রুনো, দেখ!"

ব্রুনো বললে, "এতেও কী সব লেখা রয়েছে—সিল্‌ভি—সবাইকে—ভালোবাসবে।"

বৃদ্ধ বললেন, "দুটোর তফাতটা ধরতে পারলে তো? রঙ আলাদা, কথা আলাদা। একটা বেছে নাও দিকি, মা-মণি। যেটা তোমার পছন্দ হবে, সেটাই দেব।"

হাসিমুখে ভাবতে ভাবতে সিল্‌ভি বার কতক কথাগুলো আওড়ালে, তার পর মনস্থির করে ফেললে, বললে, "ভালোবাসা পাওয়া তো ভালোই, তবে, অন্যকে ভালোবাসতে পারা আরো ভালো! লালটা আমায় দেবে, বাবা?"

তিনি কোনো কথা বললেন না ; কিন্তু যখন ঘাড় নিচু করে সিল্‌ভির কপালে ঠোঁট চেপে ধরে আদর করে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খাচ্ছিলেন, তখন দেখেছিলুম, তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। তার পর তিনি চেনের মুখটা খুলে সিল্‌ভিকে দেখিয়ে দিলেন যে কেমন করে সেটা গলায় পরতে হয়, কেমন করে ফ্রকের তলায় সেটাকে ঢেকে রাখতে হয়। নিচু গলায় বললেন, "এটা অন্য লোককে দেখাবার জন্যে নয়, নিজের কাছে রাখবার জন্যে। কীভাবে ব্যবহার করবে, মনে থাকবে তো?"

সিল্‌ভি বললে, “ভুলব না।”

“এবার তো তোমাদের ফিরে যাবার সময় হল, না-হলে ওরা আবার খোঁজ করবে, তখন মালি বেচারি পড়বে মুস্কিলে!”

তখন আমি আবার অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, এখান থেকে ফিরব কেমন করে—আমি তো ধরেই নিয়েছি, ওরা দুজনে যেখানে যাবে, আমিও সঙ্গে যাব। কিন্তু ওদের দেখলুম তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগল আর বলতে লাগল, “বিদায়, বাবা, চলি!” আর হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে নিশুতি রাত্তিরের মতো কালো অন্ধকারে সব ঢাকা পড়ে গেল, আর সেই জমাট আঁধারের মধ্যে থেকে ভেসে আসতে লাগল উদ্ভট একটা গান :

‘তার মনে হয়, দেখছে সে এক মোষ
ঘর-গরমের চুল্লিটার ঐ তাকে,
ফের তাকাতে বদলে গেল সব—
দেখল বোনের স্বামীর ভাইঝিটাকে ;
বললে, “তুমি এক্ষুনি না গেলে
হাঁক পাড়ব, পুলিশ কাছেই থাকে!” ’

দেখলুম, আমরা বাগানের সেই দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি! আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে মালি বললে, “সে মানে, আসলে আমি! আর, সত্যিই মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বিদেয় না হলে, আমি পুলিশই ডাকতুম, নির্ঘাৎ ডাকতুম, কোনো ভুল নেই—যেমন আলু আর মুলোয় ভুল হয় না!”

বলতে বলতে হাট করে সে দরজাটা খুলে দিলে, আর আমরা বেরিয়ে পড়লুম ; একটু চমকে গেলুম, একটু চোখ ধাঁধিয়ে গেল (অন্তত আমার তো গেল)। রেলের কামরার মিটমিটে আলো থেকে এল্‌ভেস্টন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উজ্জ্বল আলোয় সত্যিই একটু চমকে গেলুম, একটু চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

উর্দিপরা একজন আর্দালি এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালে। মেয়েটির হাত থেকে ছোটোখাটো জিনিসপত্রগুলো নিয়ে সে বললে, “গাড়ি তৈরি রয়েছে, দেবী আর লেডি মুরিয়েলও আমার সঙ্গে করমর্দন করে, বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে, মিষ্টি হেসে, তার পেছন পেছন চলে গেলেন।

যে-মালকামরা থেকে আমার জিনিসপত্র নামান হচ্ছিল, সেই দিকে যেতে যেতে আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা আর একা একা লাগতে লাগল। মালপত্র সব আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে পায়ে হেঁটেই আর্থারের বাসার দিকে রওনা দিলুম, আর সত্যি বলতে কি, আমার অনেক দিনের বন্ধু আর্থার আদর করে আমায় যখন আপ্যায়ন করলে, আর, তার ছোট্টো আলো-ঝলমলে বসবার ঘরের গরমের মধ্যে গিয়ে আরাম করে যখন বসলুম, তখন সেই একা একা ভাবটা কোথায় উবে গেল।

আর্থারকে কথায় কথায় লেডি মুরিয়েলের কথা বললুম, দেখলুম সে তাকে চেনে, আলাপও আছে। আর্থার যেভাবে তার সুখ্যাতি করতে শুরু করল, বুঝলুম তাকে সে পছন্দও করে খুব।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম, আর্থার আর মুরিয়েল হাত ধরাধরি করে বাগানের পথ দিয়ে বেড়াচ্ছে, দুপাশের গাছের সারি মাথার ওপর একাকার হয়ে গিয়ে খিলেনের মতো হয়ে আছে। ওরা যেন দিন কয়েকের জন্যে বাইরে কোথায় গিয়েছিল, এই ফিরল। বাগানের মালিটা তাই হাসিমুখে ওদের এগিয়ে নিতে এসেছে।

যেমন ভালো মালিক, তেমনি ভালো মালিকের বউ। তারা বাড়ি ফিরে এলে, মালি যে আহ্লাদে আটখানা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কী অদ্ভুত! ওদের দুজনকে কেমন ছোটো ছেলেমেয়ের মতো দেখতে লাগছে! সিল্‌ভি আর ব্রুনো বলে দিব্যি মনে করে নেওয়া যায়। কিন্তু মনের আনন্দ প্রকাশ করবার জন্যে মালির পক্ষে অমন খ্যাপার মতো নাচা আর উদ্ভট গান গাওয়াটা কিন্তু একটু অস্বাভাবিক বলেই মনে হল।

'তার মনে হয়, দেখল সে এক সাপ
সংস্কৃত বলছে দ্বিধাহীন;
ফের তাকাতে, বোঝা গেল, সেটা
আসছে মাসের মাঝামাঝি দিন;
বললে, "জানি, মাসগুলো সব বোবা,
কইবে কথা, এমন আশাই ক্ষীণ!" '

—আর, তার চেয়েও অস্বাভাবিক লাগল, যখন দেখলুম, ভাইস-

ওয়ার্ডেন আর দেবী-সাহেবা আমার একেবারে পাশেই প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! প্রফেসর একটা চিঠি তাঁদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে কয়েক হাত তফাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, আর এরা দুজনে চিঠিটা খুলে পড়ে তাই নিয়ে আলোচনা করছেন।

সিল্‌ভি আর ব্রুনো ভদ্রতা করে মালির গান শুনছিল, কট্‌মট্‌ করে তাদের দিকে তাকিয়ে ভাইস-ওয়ার্ডেনকে বলতে শুনলুম, "ঐ বিচ্ছুদুটোর জন্যেই যত মুস্কিল, নইলে কোনো গণ্ডগোল থাকত না।"

তাঁর গিন্নী বললেন, "চিঠির সেই জায়গাটা আর একবার পড় তো?" ভাইস-ওয়ার্ডেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন:

"—এল্‌ফ্‌ল্যাণ্ডের পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে রাজা হিসাবে মনোনীত করায় আমরা আপনাকে রাজ্যেশ্বরের ক্ষমতা গ্রহণ করিবার জন্যে সম্মানপূর্বক সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি; এবং আপনার পুত্র, ব্রুনো—যাহার সদ্গুণ, বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্যের খ্যাতি আমরা অবগত হইয়াছি—তাহাকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, আপনার অনুমোদন কামনা করি।"

দেবী-সাহেবা বললেন, "কিন্তু, গণ্ডগোলটা কোথায়?"

"কেন, বুঝতে পারছ না? যে-দূত চিঠিটা এনেছে, সে প্রাসাদে অপেক্ষা করে রয়েছে; সিল্‌ভি আর ব্রুনো তার চোখে পড়বেই; তার পর যখন সে আগ্‌গাগ্‌কে দেখবে, আর 'সদ্গুণ, বুদ্ধিমত্তা আর সৌন্দর্য'-এর কথাগুলো তার মনে পড়বে, তখন কি আর—"

দেবী-সাহেবা খিঁচিয়ে উঠলেন, "আগ্‌গাগের চেয়ে ভালো, চালাক বা সুন্দর ছেলে তুমি কোথায় পাবে বল তো?"

শুনে, ভাইস-ওয়ার্ডেন শুধু বললেন, "হাঁসের মতো বাজে প্যাঁকপ্যাঁক কর না! ছোঁড়া-ছুঁড়ি দুটোকে আড়ালে রাখতে পারলে যদি কাজ হয়, সেই-ই একমাত্র ভরসা। সেটা যদি করতে পার, বাকিটা আমি সামলাব। বুদ্ধিটুদ্ধি সব কিছুর দিক দিয়ে আগ্‌গাগ্‌ যে একেবারে গুণের গুণনিধি, দূতমশাইয়ের যাতে সেইরকম ধারণা হয়, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি।"

দেবী-সাহেবা বললেন, "ওর আসল নামটা বদলে ব্রুনো নাম দিতে হবে তো?"

ভাইস-ওয়ার্ডেন থুতনিতে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললেন, "হুম্‌!

না!" কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন, "ফল হবে না। ছেলেটা এমন হাঁদা, মানাতে পারবে না।"

দেবী-সাহেবা চীৎকার করে উঠলেন, "হাঁদা, বটে! বড়ো জোর আমারই মতো হাঁদা, তার বেশি নিশ্চয়ই নয়!"

ভাইস-ওয়ার্ডেন মোলায়েম গলায় বললেন, "ঠিক বলেছ গো! তোমার চেয়ে বেশি কিছুতেই নয়!"

দেবী-সাহেবা নরম হলেন, বললেন, "চল, দূতমশাইকে আদর আপ্যায়ন জানাই গিয়ে।" তার পর প্রফেসরকে হাঁক পেড়ে বললেন, "কোন ঘরে বসিয়েছেন তাঁকে?"

"লাইব্রেরিতে ঠাকরুন।"

ভাইস-ওয়ার্ডেন জিগেস করলেন, "নামটা যেন কী বললেন?"

হাতের কার্ডটার দিকে দেখে নিয়ে প্রফেসর বললেন, "ব্যারন ডোপ্পেলজিস্ট, মহামেদার্ণব-বাহাদুর।"

দেবী-সাহেবা বললেন, "তুমি ওঁকে আপ্যায়ন জানাও গিয়ে, আমি বরং বাচ্ছাদের দেখি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্যারনের দূতিয়ালী

ভাইস-ওয়ার্ডেনের পেছন পেছন যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, বরং দেখি, ব্রুনো আর সিল্‌ভিকে আড়ালে রাখবার জন্যে দেবী-সাহেবা কী করেন ; তাই শেষপর্যন্ত তাঁর সন্ধানেই গেলাম।

দেখতে পেলাম, এক হাতে সিল্‌ভির হাত ধরে আর-এক হাতে ঠিক মায়ের মতো করে ব্রুনোর মাথা চাপড়াচ্ছেন ; আর, ওরা দুজনেই কেমন হতভম্ব মেরে গিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেবী-সাহেবা বলছেন, "ওরে আমার পেটের বাছারা, তোদের জন্যে আমি একটা খুব মজার ব্যাপার ঠিক করে রেখেছি! আজ বিকেলের পর, প্রফেসর তোদের ঐ বনের মধ্যে অনেক দূরে বেড়াতে নিয়ে যাবেন ; তোদের সঙ্গে ঝুড়ি করে খাবার দেব, নদীর ধারে বেশ চড়ুইভাতি করবি!"

ব্রুনো লাফিয়ে উঠে হাততালি দিতে দিতে বললে, "ভারি মজা! তাই না সিল্‌ভি!"

সিল্‌ভির হতভম্ব ভাব তখনো পুরোটা কাটে নি, তবে মন থেকেই বললে, "অনেক ধন্যবাদ।"

দেবী-সাহেবার চাকা-পানা মুখে কেল্লা মাৎ-করা একগাল হাসি ছড়িয়ে পড়ল, যেন পুকুরের জলে ঢেউ খেলে গেল ; সেটা লুকোবার

জন্যে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বাড়ির দিকে যেতে যেতে বিড়্‌বিড়্‌ করে বললেন, "একেবারে বুদ্ধু!" আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম।

লাইব্রেরিতে ঢুকতেই শুনতে পেলুম, ব্যারন বলছেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্ত পদাতিক সৈন্য ছিল আমারই তাঁবে।" দেবী-সাহেবাকে তাঁর পরিচয় দেওয়া হল।

দেবী-সাহেবা বললেন, "তার মানে, যুদ্ধের মহারথী?" হোঁৎকা ভদ্রলোক বিনয়ে গলে পড়ে মাটির দিকে চেয়ে বললেন, "তা, বলতে পারেন, আমার পূর্বপুরুষের সবাই যুদ্ধের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন।"

অনুগ্রহের হাসি হেসে দেবী-সাহেবা বললেন, "প্রায়ই দেখা যায় লড়াই করার ক্ষমতাটা রক্তের সঙ্গে থাকে, যেমন মিষ্টি খাবার লোভ।" ব্যারনমশাই যেন একটু অপমানিত বোধ করলেন, ভাইস-ওয়ার্ডেন সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি করে প্রসঙ্গটা পাল্টে দিয়ে বললেন, "একটু পরেই খাবার তৈরি হয়ে যাবে। মহামেদার্ণব, আপনাকে কি আমাদের অতিথি-কক্ষে নিয়ে যেতে পারি?"

ব্যারন সোৎসাহে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই একশোবার! পাত ফেলে রেখে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না!" ভাইস-ওয়ার্ডেনের পিছু পিছু প্রায় লাফাতে লাফাতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ভাইস-ওয়ার্ডেন ফিরে এসে দেবী-সাহেবাকে সবে বুঝিয়ে বলতে শুরু করেছেন যে, মিষ্টি খাবার লোভের প্রসঙ্গটা তোলা খুব ভালো কাজ হয় নি; বলছেন, "একটু চোখ খোলা রাখলেই টের পেতে যে, মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারে উনি বেশ পোক্ত। যুদ্ধের মহারথী! ফুঃ!"— বলতে না-বলতেই ব্যারনমশাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে বললেন, "খাবার দেওয়া হয়ে গেছে?"

ভাইস-ওয়ার্ডেন বললেন, "এই হল বলে। চলুন ততক্ষণ একটু বাগানে পাক খেয়ে আসা যাক। তখন সেই কী একটা যুদ্ধের কথা বলছিলেন না? সেই যে যুদ্ধে আপনি পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন—" বলতে বলতে তিনজনে বাড়ি থেকে বাগানে গিয়ে পড়লেন।

ব্যারন বললেন, "হ্যাঁ, সত্যিই তাই; শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিল আমাদের চেয়ে অনেক বেশি; তবু, আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে সোজা তাদের মাঝখানে—ওটা কী?" শঙ্কিতভাবে চীৎকার করে আমাদের যুদ্ধের মহারথীটি ভাইস-ওয়ার্ডেনের পেছনে এসে আড়াল

খুঁজতে লাগলেন। দেখা গেল, কিম্ভুত ধরনের একজন লোক একটা কোদাল হাতে করে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে হুড়মুড় করে সামনে এসে পড়েছে।

ভাইস-ওয়ার্ডেন সাহস দিয়ে বললেন, "ও তো আমাদের বাগানের মালি! খুব নিরীহ, বিশ্বাস করুন। শুনুন, কেমন গান গাইছে! গান গাইতে ভারি ভালোবাসে।"

আবার সেই চাঁচা গলার বেসুরো আওয়াজ শোনা গেল :

'দেখল, যেন মহাজনের মুনশি
নামল এসে দোতলা বাস থেকে
ভুল ভাঙল দ্বিতীয়বার চেয়ে
বিরাটবপু জলহস্তি দেখে ;
বললে, "যদি খাবার পাতে বসে,
মিলবে নাকো দেখতে কিছুই চেখে!" '

কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ সে তুড়ি দিতে দিতে উদ্দাম নাচ জুড়ে দিলে, আর বার বার গাইতে লাগল :

'মিলবে নাকো দেখতে কিছুই চেখে!
মিলবে নাকো দেখতে কিছুই চেখে!'

ব্যারনমশাইকে আবার একটু অপ্রসন্ন দেখাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাইস-ওয়ার্ডেন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, এই গানে তাঁর প্রতি কোনো কটাক্ষ করা হয় নি, আসলে গানটার কোনো মানেই নেই। মালির দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তো তুমি গানটা গাও নি, তাই না?" মালি তখন গান শেষ করে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল হাঁ করে ওদের দিকে দেখছিল। বললে, "আমার কোনো কথারই কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।" এই সময়ে আগ্‌গাগ্‌ এসে পড়তেই কথা-বার্তার মোড় ঘুরে গেল।

ভাইস-ওয়ার্ডেন বলে উঠলেন, "আমার ছেলেকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি দিন।" তার পর একটু চাপা গলায় বললেন, "এমন ভালো আর বুদ্ধিমান ছেলে ত্রিভুবনে নেই! ও যে কী চৌখশ, আপনাকে তার প্রমাণ দেখাবার ব্যবস্থা করছি, তখন দেখবেন।

অন্য সব ছেলেপুলেরা যা যা জানে না, সেই সেইগুলো সমস্ত ও জানে ; আর কী তীর ছোঁড়ায়, কী মাছ ধরায়, কী ছবি আঁকায় বা গান-বাজনায় ; ওর ক্ষমতা যে—থাক, নিজের চোখে দেখেই বিচার করবেন। ঐযে ওখানে ঐ নিশানাটা দেখছেন ? ও ঠিক তাগ করে তীর ছুঁড়বে।" তার পর গলা ছেড়ে বললেন, "খোকন-সোনা, মহামেদার্ণব দেখতে চান তুমি কেমন তীর ছুঁড়তে পার। কে আছিস, ছোটো-বাহাদুরের তীর-ধনুক নিয়ে আয় !"

গোমড়া মুখে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে আগ্গাগ্ তীর ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হল। ধনুক থেকে তীরটা ছোটবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইস-ওয়ার্ডেন ব্যারনের পায়ের ওপর এমন জোরে মাড়িয়ে দিলেন যে, ব্যারনমশাই যন্ত্রণায় হাঁউমাউ করে উঠলেন।

ভাইস-ওয়ার্ডেন শশব্যস্তে বলে উঠলেন, "দশহাজার বার ক্ষমা চাইছি ! উত্তেজনার ঘোরে পিছু হটে গিয়েছিলুম। দেখেছেন ! চাঁদমারির একেবারে ঠিক মাঝখানটায় বিঁধেছে !"

ব্যারন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বিড়্‌বিড়্ করে বললেন, "যে-রকম আনাড়ির মতো তীর-ধনুক ধরেছিল, দেখে মনে হয়েছিল অসম্ভব !" কিন্তু সন্দেহের অবকাশ নেই। চোখের সামনে চাঁদমারির ঠিক মাঝখানটাতে তীরটা বিঁধে রয়েছে !

ভাইস-ওয়ার্ডেন বললেন, "কাছেই হ্রদ আছে। ওরে, কে আছিস, ছোটো-বাহাদুরের ছিপটা নিয়ে আয় !" খুব ব্যাজার হয়ে ছিপ বাগিয়ে আগ্গাগ্ সুতো ফেলল জলে।

দেবী-সাহেবা হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন, "আরে, আপনার হাতে একটা পোকা !" তার পর বেচারি ব্যারনের হাতে এমন একটা রাম-চিমটি কাটলেন যে, দশটা কাঁকড়া একসঙ্গে দাড়া দিয়ে চেপে ধরলেও অত লাগে না। "বড়ো বিষাক্ত পোকা। কিন্তু কী কপাল আপনার ! মাছটাকে কেমন গেঁথে তুলল, সেইটাই দেখতে পেলেন না !"

হ্রদের পাড়ে বিরাট একটা মরা কড়্‌মাছ পড়ে আছে, মুখে বঁড়শি বেঁধান।

ব্যারনমশাই তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "আমার বরাবর ধারণা ছিল, কড্ হচ্ছে সুমুদ্দুরের মাছ !"

ভাইস-ওয়ার্ডেন বললেন, "এ অঞ্চলে ঠিক তা নয়। এবার ভেতরে

যাওয়া যাক, কী বলেন? যেতে যেতে ইচ্ছে হলে আমার ছেলেকে প্রশ্ন জিগেস করতে পারেন—যে কোনো প্রশ্ন!" হাঁড়িমুখো ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ব্যারনের সামনে এগিয়ে দেওয়া হল।

ব্যারনমশাই খুব সতর্ক হয়ে প্রশ্ন শুরু করলেন, "বলুন তো ছোটো-বাহাদুর, সাত-নাম কত হয়?"

হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে এসে ভাইস-ওয়ার্ডেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "এবার বাঁদিকে!" এমন হুড়মুড় করে এলেন যে, তাঁর ধাক্কার চোটে অতিথিমশাই মুখ থুবড়ে কুপোকাৎ।

দেবী-সাহেবা বলে উঠলেন, "আহা, ভারি দুঃখ পেলাম!" তার পর কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে তাঁকে টেনে তুলে বললেন, "আপনি যখন পড়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়টিতে আমার ছেলে বলতে যাচ্ছিল, "তেষট্টি!"

ব্যারনমশাই কোনো কথা বললেন না। তাঁর সর্বাঙ্গে ধুলো; দেহে এবং সেই সঙ্গে মনেও খুব চোট পেয়েছেন মনে হল। যাই হোক, বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে তাঁকে সাফ-সুৎরো করে দেবার পর, ব্যাপারটা সামলে গেল।

যথাসময়ে খাওয়া শুরু হল, আর নতুন নতুন পদ পাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারনের মেজাজটাও ভালো হতে লাগল: তবে আগ্‌গাগের বাহাদুরি সম্পর্কে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বার করা গেল না। শেষপর্যন্ত আগ্‌গাগ্ ঘর থেকে চলে গেল। জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল, একটা ঝুড়ি নিয়ে সে বাগানে ঘুরঘুর করছে, আর কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে ঝুড়িতে বোঝাই করছে।

পুত্র-অন্ত-প্রাণ জননী বললেন, "প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে ছেলের আমার ভারি ঝোঁক! আমার ছেলেকে কেমন দেখলেন, বলুন তো ব্যারনমশাই!"

ব্যারন বড়ো সাবধানী মানুষ; বললেন, "রেখে-ঢেকে বলব না, আরো কিছু প্রমাণ পাওয়া দরকার। আপনি যেন বলছিলেন, ও আরো কি কি সব—"

ভাইস-ওয়ার্ডেন বললেন, "গান-বাজনা? একেবারে আশ্চর্য প্রতিভা! ওর পিয়ানো বাজনা শুনুন না।" জানলার কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লেন, "আগ—মানে, খোকন-সোনা! একমিনিট একটু ভেতরে এস তো, আর

বাজনার মাস্টারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে এস।" তার পর কৈফিয়ত হিসেবে বললেন, "স্বরলিপির পাতা উল্টে দেবে, সেইজন্যে আর কি।"

কোল্লাব্যাঙে ঝুড়ি ভরে গেছে, কাজেই হুকুম তামিল করতে আগাগের আর আপত্তি দেখা গেল না; খানিক বাদেই ঘরে এসে ঢুকল, পেছনে একজন হিংস্র গোছের বেঁটেখাটো লোক। সে ভাইস-ওয়ার্ডেনকে জিগেস করলে, "কোন সুরটা সুনব্যান?"

ভাইস-ওয়ার্ডেন বললেন, "ছোটো-বাহাদুর যেটা সবচেয়ে ভালো বাজাতে পারেন।"

মাস্টারমশাই বলতে গেলেন, "বাহাদুরমশাই তো কিস্‌সুই—" তাকে দাবড়ানি দিয়ে ভাইস-ওয়ার্ডেন বলে উঠলেন, "থামুন তো মশাই, গিয়ে ছোটো-বাহাদুরের জন্যে স্বরলিপির পাতা ওল্টান।" তার পর গিন্নীকে, "ওঠ তো গো, ওকে দেখিয়ে দাও তো, কী করতে হবে।" তার পর ব্যারনকে, "ততক্ষণ আসুন ব্যারনমশাই, আমাদের একটা খুব ভালো ম্যাপ আছে, আপনাকে দেখাই—তাতে অচিন দেশ আছে, পরীর দেশ আছে, এই-সব নানান দেশ আছে।"

মাস্টারমশাইকে কী করতে হবে না-হবে বুঝিয়ে দিয়ে দেবী-সাহেবা যখন ফিরে এলেন, ততক্ষণে ম্যাপ টাঙিয়ে ফেলা হয়ে গেছে; এবং ম্যাপের এক-একটা জায়গা দেখিয়ে অনবরত অন্য অন্য জায়গার নাম বলতে ভাইস-ওয়ার্ডেনের একবারও ভুল হচ্ছে না দেখে, ব্যারন-মশাই বেশ হতভম্ব হয়ে গেছেন।

দেবী-সাহেবা এসে আরো নতুন নতুন জায়গা আর আরো অন্য অন্য নাম বলতে শুরু করার ফলে ব্যাপারটা আরো ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল; অতিষ্ঠ হয়ে ব্যারন নিজেই শেষকালে ম্যাপের গায়ে জায়গা খুঁজে বার করতে লাগলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "এঁই হলদে জায়গাটাই কি পরীর দেশ?"

"হ্যাঁ, ওটাই পরীর দেশ" বলে ভাইস-ওয়ার্ডেন দেবী-সাহেবাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জানালেন, "ওঁকে একটু ঠারে-ঠোরে জানিয়ে দাও-না, যাতে কালকেই চলে যান। ব্যাটা হাঙরের মতো গেলে। আমি কথাটা পাড়লে কোনো লাভ হবে না।"

গিন্নী চট করে মতলবটা বুঝে নিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কী সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েই না ব্যারনকে তাঁদের মনের ইচ্ছেটা জানালেন। "ফিরে

যাওয়ার পক্ষে পরীর দেশটা কত কাছে দেখছেন? অত কথা কী, কাল সক্কালবেলা যদি বেরিয়ে পড়েন, পৌঁছতে এক সপ্তাহের চেয়ে বড়ো জোর দু-এক দিন বেশি লাগবে!"

ব্যারন তো হতভম্ব। বললেন, "এখানে পৌঁছতে আমার পুরো একটি মাস লেগে গেছে!"

"কিন্তু, জানেন তো ঘর-মুখো রাস্তা অনেক ছোটো হয়ে যায়!"

ব্যারন করুণ নয়নে ভাইস-ওয়ার্ডেনের দিকে চাইলেন; তিনি সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরলেন, "এখানে আসতে আপনার যে সময় লেগেছে, তার মধ্যে আপনি একবার কেন, পাঁচবার ফিরে যেতে পারেন—যদি অবশ্য কাল সক্কালেই বেরিয়ে পড়েন!"

সারাক্ষণই পিয়ানো বেজে চলেছে। ব্যারন মনে মনে স্বীকার না করে পারছেন না যে, বাজনা হচ্ছে অতি চমৎকার; কিন্তু শত চেষ্টা করেও বাজান অবস্থায় তিনি ছেলেটিকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছেন না। যতবারই তাকে দেখতে পাব-পাব হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হয় ভাইস-ওয়ার্ডেন আর নাহয় দেবী-সাহেবা ম্যাপের গায়ে নতুন কোনো জায়গা দেখাবার অছিলায় সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন নাম বলে তাঁর কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছেন।

শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে, সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই অতিথিবৎসল ভাইস-ওয়ার্ডেন এবং দেবী-সাহেবা সফলতার আনন্দে চোখে চোখে ইশারা হানলেন।

ভাইস-ওয়ার্ডেন বললেন, "খুব চাল চেলেছ! কী ফন্দিই এঁটেছ! কিন্তু, সিঁড়িতে অত ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ কিসের?" দরজার পাল্লাদুটো সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললেন, "ব্যারনের মালপত্র সব নামিয়ে আনা হচ্ছে যে!"

দেবী-সাহেবা বলে উঠলেন, "আর, গাড়ির চাকার গড়্‌গড়্ শব্দেরই বা মানে কী?" জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বললেন, "ব্যারনের গাড়িটা যে ফিরে এল!"

ঠিক এই সময়ে ঘরের দরজাটা খুলে গেল; রাগে ফেটে-পড়া গোব্দা একখানা মুখ উঁকি মারল; উত্তেজনায় চিড়-খাওয়া গলায় বাজ-পড়ার মতো আওয়াজ বেরল সেই মুখ থেকে, "আমার ঘরময় ব্যাঙ—আমি চললুম!" দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পিয়ানোর মিষ্টি সুর তখনো সারা ঘরের বাতাসে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সে হল আর্থারের বাজনার গুণে। বাজনার শেষ পর্দার সুরটি যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, তখন পরিশ্রান্ত অথচ প্রফুল্ল মনে আর্থারকে কোনোরকমে 'শুভরাত্রি' টুকু বলে আমি বিছানার খোঁজে চললাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিংহের পিঠে সওয়ার

পরের দিন সকালের দিকটা বেশ কেটে গেল। নতুন বাসায় সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিলুম, আর্থারের কাছে হদিশ নিয়ে কাছাকাছি ঘুরে-ফিরে এল্‌ভেস্টন আর তার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আন্দাজ পাবার চেষ্টা করলুম। যখন পাঁচটা বাজল, তখন আর্থার 'দি হল্‌' বলে বাড়িটাতে আমায় নিয়ে যাবার কথা বললে; আর্ল অব্‌ এইন্‌স্লাই এই মরশুমের জন্যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবে, আর তাঁর মেয়ে লেডি মুরিয়েলের সঙ্গে আলাপটা ঝালিয়েও নেওয়া যাবে!

ভদ্র, রাশভারী অথচ সদালাপী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রথম আলাপে ভালোই লাগল আমার; আর, আমায় দেখে তাঁর মেয়ে যখন বললে, "আরে, এ সৌভাগ্য ভাবতেই পারি নি!" তখন তার মুখে যে খুশির তৃপ্তি দেখতে পেয়েছিলুম, তাইতে এই দীর্ঘ জীবনের বিফলতায় হতাশায় আর নিষ্ঠুর সংসারের তাড়নায় যেটুকু অহমিকা তখনো অবশিষ্ট ছিল, তাতে যেন শান্তির স্পর্শ পেলাম।

আর্থারের সঙ্গে যে মুরিয়েলের খুব ভাব, তা ওদের কথাবার্তার ধরন দেখেই বোঝা যায়। মুরিয়েল তার বাবাকে দেবার জন্যে চা নিয়ে আসছিল, আমি উঠে গিয়ে দরজার কাছ থেকে ওর হয়ে সেটা বয়ে এনে দিয়েছি; তারই জের টেনে মুরিয়েল বললে, "চায়ের কাপের

কোনো ওজন না থাকলে কত সুবিধে হত! তখন মেয়েরা মাঝে-সাঝে কাছাকাছি চা বয়ে নিয়ে গেলে কারও আর তেমন আপত্তি হত না!"

আর্থার বললে, "নিজের নিজের ওজন থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে কোনো জিনিস ভারি মনে হবে না, এরকম একটা অবস্থা কিন্তু খুব সহজেই কল্পনা করা যায়।"

আর্ল বললেন, "ভয়ানক উল্টোপাল্টা ব্যাপার। বুঝিয়ে বল তো দেখি, আমাদের মাথায় আসবে না।"

"মনে করুন এই বাড়িটা ঠিক এই অবস্থায় একটা গ্রহের কোটি কোটি মাইল ওপরে রাখা হল; কাছাকাছি কোনো কিছু নেই। নিশ্চয়ই সেটা গ্রহের মাটিতে এসে পড়বে?"

আর্ল ঘাড় নেড়ে বললেন, "নিশ্চয়ই—তবে হয়তো কয়েকশো বছর লাগবে পড়তে।"

মুরিয়েল বললে, "আর ঐ ততদিন ধরে বিকেলের চা খাওয়া চলতেই থাকবে না কী?"

"সেই কথায় আসছি। বাড়ির বাসিন্দাদের বয়েস বাড়বে, বড়ো হবে, মারা যাবে, তবু বাড়িটা তখনো পড়েই চলেছে, পড়েই চলেছে! আচ্ছা, এবার বস্তুর আপেক্ষিক ওজন বা ভারের কথা। কোনো জিনিস যখন পড়তে চায়, অথচ তাকে বাধা দেওয়া হয়, তখনই সেটা ভারী লাগে। এটা মানেন তো সবাই?"

সবাই মেনে নিলাম।

"বেশ, এখন যদি আমি এই বইটা তুলে নিয়ে হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখি, তাহলে নিশ্চয়ই বইটার ভার আছে বলে টের পাব। কারণ বইটা পড়ে যেতে চাইছে, আমি তাকে আটকে রেখেছি। যদি ছেড়ে দিই, মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা সব্বাই একসঙ্গে পড়তে থাকি, তা হলে বইটা তো আর আমাদের চেয়ে আগে পড়বে না, বুঝলেন তো? কারণ, আমি যদি বইটা ছেড়ে দিই, তা হলে সেটা পড়ে যাবে, এই তো? কিন্তু, আমার হাতটাও তো সেই একই গতিতে নীচে নামছে, কাজেই বইটা হাত থেকে যাবে কোথায়? আমার হাতের চেয়ে তো আর, তাড়াতাড়ি নামবে না বইটা। আর, তাছাড়া ঘরের মেঝের চেয়ে জোরে তো আর, নামতে পারছে না!"

মুরিয়েল বললে, "বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। কিন্তু এ-সব ভাবলে যেন মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে! এমনটা ঘটান যাবে কী করে?"

আমি বললাম, "আরো মজার ব্যাপার আছে। ধরুন, বাড়ির তলায় একটা দড়ি বাঁধা আছে, আর কেউ একজন সেই দড়ি ধরে নীচের দিকে টানছে। তখন নিশ্চয়ই বাড়িটা অন্য সব কিছুর চেয়ে আরো তাড়াতাড়ি পড়তে থাকবে, তার নীচে নামার বেগ বেড়ে যাবে; কিন্তু এই-সব আসবাবপত্র, আমরা, সেই আগেকার বেগেই নীচে নামতে থাকব, কাজেই পিছিয়ে পড়ব।"

আর্ল বললেন, "আসলে, আমরা ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকব, আর তার অনিবার্য পরিণাম হবে—মাথার ঘিলু চল্‌কে যাবে।"

আর্থার বললে, "সেটা এড়াতে হলে আসবাবপত্র সব মেঝের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হোক, আর তার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখা হোক। তা হলে বিকেলের চা খাওয়াটা নির্ঝঞ্ঝাটে চলতে পারবে।"

মুরিয়েল মজা করে বললে, "একটা অসুবিধে রয়ে গেল। চায়ের কাপগুলো নাহয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামতে থাকল, কিন্তু চায়ের কী হবে?"

আর্থার বললে, "চায়ের কথাটা মাথায় আসে নি। চা নির্ঘাৎ ঘরের ছাদে গিয়ে উঠবে!'

আর্ল বললেন, "আর সেটা খুবই বদখৎ ব্যাপার হবে!- হ্যাঁ, বলুন তো মশাই, লণ্ডনের নতুন কী খবর আছে, বলুন।"

মামুলি কথাবার্তা চলতে লাগল। খানিক বাদে আর্থার ইশারা করলে, এবার উঠতে হবে। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়ায় সমুদ্রের তীর ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম। চারিদিক শান্ত, মাঝে মাঝে কেবল ঢেউয়ের কলরোল আর দূর থেকে জেলেদের গান কানে আসছে।

ছোট্টো একটা ডোবার ধারে নুড়ির ওপর বসলাম। নানারকম প্রাণী আর ছোটো-ছোটো গাছপালায় ডোবাটা ভরা; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে এত ভালো লাগল যে, আর্থার বাসায় ফেরার কথা বলতে ওকে একাই ফিরে যেতে বললুম; বললুম, খানিক্ষণ একা একা এই-সব দেখতে ভালো লাগছে।

নৌকোগুলো তীরের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে, আর জেলেদের গান আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওরা নৌকো থেকে এবার মাছ

নামাবে। হয়তো তাই দেখতে যেতাম, কিন্তু আমার পায়ের কাছের ডোবার ধারের ঐ ছোট্টো জগৎটার আকর্ষণ তখন আমার কাছে অনেক বেশি।

একটা তেকেলে কাঁকড়া অনেকক্ষণ থেকেই ডোবাটার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত নড়বড় করে বেড়াচ্ছিল, খুব মন দিয়ে তার দিকেই দেখছিলাম। তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ধরন-ধারনে কেমন একটা উদ্দেশ্যহীন হিংস্র ভাব; আপনা থেকেই সেই মালির কথা মনে পড়ে যায়—সিল্‌ভি আর ব্রুনোর বন্ধু, সেই মালি। চেয়ে থাকতে থাকতে তার উদ্ভট গানের শেষ রেশটুকু আমার কানে বাজতে লাগল।

তার পর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তার পর যা শুনলুম, সেটা সিল্‌ভির মিষ্টি গলা, "দয়া করে আমাদের রাস্তায় যেতে দাও-না!"

"কী! আবার সেই বুড়ো ভিখিরির কাছে যাওয়া?" ধমকে উঠে মালি গাইতে শুরু করলে:

'তার মনে হয় দেখল, ক্যাঙারুটা
ভান্‌ছে কফি পেষাই-কলে ভরি;
ফের তাকিয়ে দেখল, তা তো নয়—
একটা শুধু শাক-সব্জির বড়ি।
বললে, "যদি আমায় খেতে হয়,
তবে নির্ঘাৎ কঠিন রোগে পড়ি!" '

সিল্‌ভি বোঝালে, "আমরা তাঁকে কিচ্ছু খেতে বলব না। তাঁর তো খিদেই পায় নি। আমরা শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তাই বলছি, দয়া করে—"

মালি সগর্বে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই! আমি সব সময়ে দয়া করি। কাউকে দুঃখ দিই না। এই নাও!" বলে সে দরজাটা খুলে দিলে, আর আমরা সেই মাটির রাস্তায় এসে পড়লুম।

খানিক বাদেই পথ চিনে সেই ঝোপটার কাছে পৌঁছে গেলুম। সিল্‌ভি ঢাকার নীচে থেকে লকেটটা বার করে উল্টেপাল্টে কী ভাবলে, তার পর ব্রুনোকে বললে, "এই লকেটাকে কী যেন করতে হয় রে, ব্রুনো? আমার তো মাথায় একদম আসছে না!"

কোনো সন্দেহ বা গোলমাল হলেই, ব্রুনোর যে মোক্ষম এবং একমাত্র দাওয়াই জানা আছে, তাই-ই বললে সে, "চুমু খাও!" সিল্‌ভি তাই করলে, কিন্তু কোনো ফল হল না।

ব্রুনো আর-একটা মতলব দিলে, "উল্‌তো ঘষো!"

সিল্‌ভি বুঝতে না-পেরে বললে, "উল্টো মানে কোন্‌ দিক থেকে কোন্‌ দিকে?" কাজেই, একমাত্র উপায় হল উল্টো, সোজা দুরকম ভাবেই ঘষা।

ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘষে কোনো ফল হল না।

এবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘষতেই ব্রুনো চেঁচিয়ে উঠল, "থামো, থামো সিল্‌ভি! কী ব্যাপার হচ্ছে, চেয়ে দেখ!"

দেখা গেল আশপাশের পাহাড়ি ঢালু জমির গাছগুলো সব সার বেঁধে ওপর দিকে চলতে শুরু করেছে; আর, আমাদের পায়ের কাছে ছোট্টো একটা জলের ধারা কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছিল, সেটা ফেনিয়ে উঠে হস্‌-হস্‌ করে পাক খেতে খেতে ফুলে ফেঁপে উঠছে—দেখলে ভয় করে।

ব্রুনো আবার চেঁচিয়ে উঠে বললে, "অন্যরকম করে ঘষো! ওপর থেকে নীচের দিকে! শিগ্‌গির!"

মতলবটা ভালোই। ওপর থেকে নীচের দিকে ঘষতেই কাজ হল; আশপাশের গাছপালা, মাটি-পাথর, খাল-বিলের মধ্যে যে খ্যাপামি দেখা যাচ্ছিল, সেটা থেমে গিয়ে, আবার সব স্বাভাবিক দেখাতে লাগল। শুধু একটা পাঁশুটে রঙের ইঁদুর সিংহের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তেড়িয়া হয়ে ছুটোছুটি করছিল, সে তখনো থামল না।

সিল্‌ভি বললে, "চল, ওর পিছু ধাওয়া করি।" এ-মতলবটাও কাজে এল। ইঁদুরটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি থামিয়ে দুলকি চালে হাঁটতে লাগল, আমাদেরও পাল্লা দিতে অসুবিধা হল না। কেবল একটা ব্যাপার দেখে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল—ছোট্টো ইঁদুরটা হু হু করে কেমন যেন বড়ো হয়ে যেতে লাগল, প্রতি মুহূর্তেই একটু একটু করে সত্যিকারের সিংহের মতো দেখাতে লাগল।

দেখতে না-দেখতে ইঁদুরের চেহারাটা পুরোপুরি পাল্টে গেল; দেখা গেল, বেশ শান্ত-শিষ্ট একটা সিংহ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ওদের কোনো ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল না, পোষা কুকুরের মতন ওরা সিংহটার গা থাবড়ে আদর করতে লাগল।

ব্রুনো বলে উঠল, "আমায় চড়িয়ে দাও!" সিল্‌ভি তাকে সিংহটার চওড়া পিঠের ওপর চাপিয়ে নিজে তার পেছনে চেপে বসল। দুহাতে মুঠো করে সিংহের কেশরের গোছা বাগিয়ে ধরে ব্রুনো যেন ঘোড়া চালাতে বসেছে! 'হ্যাট হ্যাট' করে আওয়াজ করতেই সিংহটা হেলে-দুলে এগোতে লাগল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে গেছি। 'আমরা' বললুম, তার কারণ আমি তো

ওদের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি—তবে কী করে সিংহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এলুম, তা বলার আমার সাধ্যি নেই। একজন বৃদ্ধ কাঠুরে কাঠ কাটছিল, সিংহটা তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে মাথা নোয়ালে, আর সিল্‌ভি আর ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠ থেকে নেমে তাদের বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওরা তাঁকে সেই দূতমশাইয়ের খবর দিলে ; খুব সঠিক খবর দিতে পারলে না, কারণ নিজেরা তো কিছু দেখেও নি, শোনেও নি, সবটাই অন্যের কাছ থেকে খবর পাওয়া। শুনে তিনি বললেন, "ক্রমশই আরো খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে! এটাই ওদের নিয়তি। সব বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছু করার নেই। একজন নীচমনা ফন্দিবাজ মানুষের স্বার্থপরতা--একজন লোভী আর মূর্খ রমনীর স্বার্থপরতা—একটা হিংসুটে আর দয়া-মায়াহীন শিশুর স্বার্থপরতা--এ-সমস্তই একই রাস্তায় গিয়ে মেশে, খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে! আর, মানিক আমার, তোমাদেরও আরো কিছুদিন এই দুর্ভোগ সইতে হবে, উপায় নেই। তবু, অবস্থা যখন খুব খারাপ মনে হবে, আমার কাছে আসতে পার। এখনো আমার কিছুই করবার নেই—"

একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে বাতাসে ছিটিয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো করে তিনি কী সব বললেন, অবাক বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে সিল্‌ভি আর ব্রুনো সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ধুলোর মেঘ বাতাসে ভেসে ভেসে ক্রমশই বড়ো হতে লাগল ; জীবন্ত একটা কিছুর মতো বারবার আকার বদল হতে লাগল তার—কতরকম অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা দেখা যেতে লাগল তার মধ্যে থেকে।

একটু ভয়ে ভয়ে সিল্‌ভিকে আঁকড়ে ধরে ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "লেখার মতো দেখাচ্ছে! কথা তৈরি হচ্ছে! কিন্তু, আমি যে পড়তে পারছি না! তুমি পড়ে দাও-না সিল্‌ভি!"

সিল্‌ভি গম্ভীরভাবে বললে, "চেষ্টা করে দেখি যদি কোনো কথা চোখে পড়ে—"

একটা বেয়াড়া গলার চীৎকার কানে এল, "তবে নির্ঘাৎ কঠিন রোগে পড়ি!"

> 'বললে, "যদি আমায় খেতে হয়,
> তবে নির্ঘাৎ কঠিন রোগে পড়ি!" '

নবম পরিচ্ছেদ

সঙ আর ভাল্লুক

হ্যাঁ, আবার আমরা বাগানে এসে গেছি। ঐ বেসুরো চীৎকারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে লাইব্রেরিতে এসে পড়েছি। সেখানে আগগাগ্ ফোঁৎ ফোঁৎ করে ফোঁপাচ্ছে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে প্রফেসর একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন, আর দেবী-সাহেবা ছেলের গলা জড়িয়ে বার বার কেবল বলে যাচ্ছেন, "আমার বাছাকে কে এমন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি পড়া দিয়েছে গো? সোনার চাঁদ কোলের বাছা রে আমার!"

ঘরে ঢুকে ভাইস-ওয়ার্ডেন খিঁচিয়ে উঠলেন, "এত গোলমাল কিসের?" ব্রুনো ঘরের মাঝ-মধ্যিখানে দাঁড়িয়েছিল, তারই মাথায় নিজের টুপিটা গলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "টুপি রাখার আলনাটা আবার এখানে রাখলে কে?" টুপিতে ব্রুনোর গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে, হতভম্ব হয়ে সেটা খোলবার কথাও ভুলে গেল সে!

প্রফেসর খুব নম্রভাবে জানালেন যে, ছোটো-হুজুর দয়া করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি পড়বেন না।

ভাইস-ওয়ার্ডেন বাজের মতো গর্জে উঠলেন, "এক্ষুনি পড়তে বস, পাজি ছুঁচো কোথাকার! আর সেইসঙ্গে এই নে-" বলেই রেগে এমন একটি চড় কষালেন যে, তার চোটে প্রফেসর বেচারির মাথা বোঁ বোঁ করতে লাগল।

ভাইস-ওয়ার্ডেন এদিকে আগ্গাগ্‌কে বাগে পেয়ে তার মাথায় ছাতার বাড়ি দমাদ্দম পেটাতে শুরু-করে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে বলে চলেছেন, "ঘরের মেঝেতে এই পেরেকটা এমন আল্লাভাবে রেখে গেল কে? পুঁতে দে, শিগ্‌গির পুঁতে দে!" আগ্গাগ্‌ টাল খাচ্ছে, আর তার ওপর ধুপ্‌ধাপ্‌ ছাতার বাড়ি পড়ছে; হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে যখন মাটিতে শুয়ে পড়ল, তখন প্যাঁদানি থামল।

এর পরে কী ঘটল, তা দেখবার জন্যে আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। ব্রুনো ইতিমধ্যে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলে দরজার দিকে ছুটেছে, পেছনে সিল্‌ভি। এই-সব পাগলদের পাল্লায় একা একা পড়ে থাকতে ভরসা পাই নি, তাই আমিও ওদের পিছু নিলাম।

হাঁফাতে হাঁফাতে সিল্‌ভি বললে, "বাবার কাছে যাওয়া দরকার। অবস্থা একেবারে যদ্দূর খারাপ হতে পারে, তদ্দূর পৌঁছে গেছে। মালিকে বলব, যেন আবার আমাদের বাইরে যেতে দেয়!"

ব্রুনো কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, "কিন্তু, অতখানি পথ হাঁটব কী করে? ওঃ, কাকার মতো একটা চার-ঘোড়ার গাড়ি থাকলে কত ভালো হত!"

এই সময়ে আবার সেই পরিচিত খ্যানখ্যানে গলার বিদঘুটে সুর ভেসে এল:

'তার মনে হয়, দেখল ঘোড়ার গাড়ি
দাঁড়িয়ে আছে তার বিছানার ধারে,
আবার দেখে বুঝল সেটা ভুল,
ভালুক সেটা, মুণ্ডুটা নেই ঘাড়ে।
বললে, "আহা! ভাবলে মায়া হয়,
মুখিয়ে ছিল, কখন খাবার বাড়ে!" '

ব্রুনো আর সিল্‌ভি কোনো কথা বলবার আগেই মালি বললে, "না, ফের আমি তোমাদের যেতে দিতে পারব না। এর আগের বার তোমাদের যেতে দিয়েছিলুম বলে ভাইস-ওয়ার্ডেন আমার ওপর যা চোট ঝেড়েছেন! কাজেই, কেটে পড়!" তার পর ওদের কাছ থেকে সরে গিয়ে খোয়া-ফেলা পথের মাঝ-বরাবর ঝাপাঝপ্‌ কোদাল চালাতে লাগল, আর ফিরে ফিরে চাইতে লাগল:

'বললে, "আহা, ভাবলে মায়া হয়
মুখিয়ে ছিল, কখন খাবার বাড়ে !" '

তবে, শুরুতে যেমন কর্কশ গলায় গাইছিল, এখন তার চেয়ে অনেকটা সুরেলা।

ক্রমশই প্রতিক্ষণে গানটা আরো ভরাট, আরো জমজমাট হয়ে উঠতে লাগল ; আরো অনেক মানুষের তেজী গলার স্বর এসে মিলতে লাগল সেই গানে। একটু পরেই একটা ধাক্কা খাওয়ার শব্দ কানে আসতে বুঝলাম, নৌকো পাড়ে লেগেছে, নুড়ির ওপর ঘষড়ানির শব্দ শুনে বুঝলাম, মাঝিরা নৌকোটাকে চড়ায় টেনে তুলছে। উঠে দাঁড়ালাম, নৌকোটাকে ঢালু তীরের ওপর টেনে তুলতে ওদের সাহায্য করলাম, তার পর ওরা যখন নৌকো থেকে তাদের মাছের বোঝা খালাস করতে লাগল, দেখবার জন্যে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

তার পর যখন বাসায় ফিরলাম, তখন বেশ ক্লান্ত আর ঘুমঘুম লাগল, আরাম-কেদারায় বসে বেশ তৃপ্তি পেলাম, আর্থার খাবারের আলমারি থেকে আমার জন্যে কেক আর কিছু পানীয় আনতে গেল, বললে যে, ডাক্তার হিসেবে ঐ-সব না-খেয়ে আমাকে ঘুমোতে দিতে সে রাজি নয়।

কিন্তু আলমারির পাল্লাটা কী রকম ক্যাঁচকোঁচ করছে! বার বার পাল্লা খুলছে আর বন্ধ করছে, ছটফটিয়ে কেবল এদিক-সেদিক করে বেড়াচ্ছে, আর যাত্রার দুঃখী রানীর মতো আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করে বকে যাচ্ছে—এ তো আর্থার হতে পারে না!

না, গলাটা পুরুষের নয়। আলমারির পাল্লায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়লেও, যাকে দেখা যাচ্ছে, তার চেহারাটাও পুরুষের নয়—বেশ মোটা, পরনে ঝলঝলে পোশাক। এই বাসার মালিক যিনি, সেই মহিলা না-কি ? দরজা খুলে গেল, অদ্ভুত-মার্কা একটি লোক ঢুকল।

চমক খেয়ে দরজার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে লোকটি নিজের মনেই বললে, "গাধাটা আবার ওখানে কী করছে ?"

এমন অপমানের ভাষায় যাঁর কথা উল্লেখ করা হল, তিনি হলেন এঁর পত্নী। ইতিমধ্যে একটা আলমারি খুলে, লোকটির দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাকের ওপর একটা মোড়কের কাগজ

রেখে সেটাকে চোস্ত করছিলেন, আর ফিস্‌ফিস্ করে বলছিলেন, "কী চালাকি! কী চমৎকার ফন্দি করেই-না কাজ হাসিল করেছি!"

স্বামীপুঙ্গব পা টিপেটিপে তাঁর পেছনে এসে তাঁর কাঁধে টোকা মারতেই মহিলাটি তাঁকে দেখতে পেয়েই যাত্রার ঢঙে দু হাত দুমড়ে বলে উঠলেন, "সব ফাঁস্ হয়ে গেল! না, তা কেন হবে, ও তো আমাদেরই লোক! প্রকাশ কোর না গো, প্রকাশ কোর না! কাজটা শেষ হতে দাও!"

খিঁচিয়ে উঠে স্বামী বললেন, "কী প্রকাশ করব না?" তার পর মোড়কের কাগজটা টেনে বার করে বললেন, "কী লুকিয়ে রাখছ বল তো? বলতেই হবে তোমায়!"

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে অতি মৃদু গলায় দেবী-সাহেবা বললেন, "ঠাট্টা করবে না তো বেঞ্জামিন! ওটা—ওটা—বুঝতে পারছ না? ওটা একটা ছোরা!"

মুখভঙ্গি করে হুজুর-বাহাদুর বললেন, "ছোরা কী হবে? লোকেরা যাতে ভাবে যে সে মরেছে, সেই ব্যবস্থা করলেই তো হল! ওকে সত্যি সত্যি মারতে হবে কেন? আর, তা ছাড়া, এটা তো টিনের তৈরি দেখছি!" বলে অবজ্ঞাভরে তিনি ছোরার ফলাটা গোল করে বুড়ো আঙুলের গায়ে পেঁচিয়ে দিলেন। "এখন বল তো ঠাকরুন, আমায় সব খুলে বল তো। প্রথমে বল, আমাকে বেঞ্জামিন বলে ডাকলে কেন?"

"ওটা ষড়যন্ত্রেরই একটা অঙ্গ গো! একটা ছদ্মনাম থাকা দরকার।"

"ও, ছদ্মনাম, তাই বুঝি? আচ্ছা! এবার বল, ছোরাটা কত দিয়ে কিনেছ? বল, বল, না-বলে পার পাবে না! আমায় ঠকান তোমার কম্ম নয়!"

"আমি ওটা কিনেছি—কিনেছি—" ধরা-পড়ে-যাওয়া ষড়যন্ত্রীর মতো আমতা আমতা করতে করতে তিনি মুখে-চোখে একটা খুনী-খুনী-ভাব আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকবার মহড়া দেওয়াও হয়ে গেছে।

"কত দিয়ে?"

"যদি নেহাৎ-ই শুনতে চাও তো শোন, আমি ওটা কিনেছি আঠারো পেন্স-এ গো! আঠারো পেন্স-এই পেয়েছি, এই নিজের গা ছুঁয়ে—"

কর্তা বললেন, "থাক, গা ছুঁয়ে কথা বলতে হবে না! তোমার গা আর কথা, দুটো জড়িয়েও দামের আদ্দেক উশুল হবে না!"

দেবী-সাহেবা ভয়ে ভয়ে বললেন, "আমার জন্মদিনে, একটা ছুরি তো চাই-ই। না-হলে—"

ছোরাটা আলমারির ভেতর ছুঁড়ে ফেলে কর্তা খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "তুমি আর ষড়যন্ত্রের কথা উচ্চারণ কোর না! ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তোমার যা জ্ঞান-গম্যি দেখলুম, মুরগির ছানাতে আর তোমাতে কোনো তফাত নেই। আরে, প্রথম দরকার হল—ছদ্মবেশ। আচ্ছা, এবার দেখ দিকিনি।"

এই বলে তিনি বেশ গর্বভরে মাথায় ঘণ্টা-লাগানো টুপি আঁটলেন আর গায়ে চড়ালেন ক্লাউনের পোশাক। তার পর চোখের ভঙ্গি করে জিভের ঠ্যালা মেরে একটা গাল উঁচু করে বললেন, "কী, ঠিক এই-রকম না?"

দেবী-সাহেবার মুখে-চোখে তখন ঠিক ষড়যন্ত্রীর মতো উত্তেজনা। উৎসাহে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন, "একেবারে হুবহু! তোমাকে একেবারে খাঁটি সঙ-এর মতো দেখাচ্ছে গো!"

ভাইস-ওয়ার্ডেন একটু সঙ্কোচের সঙ্গে হাসলেন। এরকম সোজা-সুজি 'সঙ' বলাটা ঠিক তারিফের মতো শোনায় কি-না, ঠিক বুঝতে পারলেন না। "মানে তুমি বিদূষক বলতে চাও তো? হ্যাঁ, আমি বিদূষকই সাজতে চাই। আর তোমার কী ছদ্মবেশ হবে, আন্দাজ করতে পার?" তিনি একটা মোড়ক খুলতে লাগলেন, আর দেবী-সাহেবা আহ্লাদে আটখানা হয়ে দেখতে লাগলেন।

ছদ্মবেশ বেরল। দেখে তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন, "ওহ, কী চমৎকার! কী অপূর্ব ছদ্মবেশ! এস্কিমো চাষী-বৌ।"

"এস্কিমো চাষীই বটে! পোশাকটা পরে একবার আয়নায় দেখ দিকিনি। আরে বাবা, এটা একটা ভাল্লুক, চোখে দেখতেও পাও না না-কি?" সেই সময়ে একটা কর্কশ গলার আওয়াজ শোনা যেতেই তিনি সামলে নিলেন। শোনা গেল:

'আবার দেখে বুঝল সেটা ভুল,
ভালুক সেটা, মুণ্ডুটা নেই ঘাড়ে।'

মালিটা খোলা জানলার তলায় দাঁড়িয়ে গাইছিল। ভাইস-ওয়ার্ডেন পা টিপেটিপে নিঃশব্দে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললেন, "হ্যাঁ, এটা ভাল্লুকের পোশাক, তবে মুণ্ডুটাও বাদ যায় নি। তুমি ভাল্লুক, আমি ভাল্লুকওলা। যদি কেউ ধরতে পারে, বুঝতে হবে তার খুব চোখের জোর, এই যা!"

ভাল্লুকের হাঁ-মুখের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেবী-সাহেবা বললেন, "চলনটা অব্যেস করে নিতে হবে। প্রথম প্রথম মানুষের মতো হয়ে যাবেই, বুঝতে পারছ। তুমি বলবে তো 'আয় তো আমার ফুল-কুমারী!' বলবে তো?"

ভাল্লুকের গলায়-বাঁধা শেকলটা এক হাতে ধরে আর-এক হাতে একটা চাবুক ঘুরিয়ে ভাল্লুকওলা বললে, "তা তো বলবই। নাও, এবার নাচের ভঙ্গিতে ঘরময় ঘোর তো। বাঃ, বেশ হচ্ছে, চমৎকার। আয় তো আমার ফুলকুমারী! আয় বলছি!"

শেষ কথাটা কড়া গলায় বলা হল আগ্‌গাগ্‌কে উদ্দেশ্য করে। ঘরে ঢোকার মুখেই ছেলেটা দুই হাত ছড়িয়ে ড্যাবা ড্যাবা চোখে আকাশ-পাতাল হাঁ করে হাঁদার মতো অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। "আই ব্বাস!" ছাড়া তার মুখ থেকে আর কিছু বেরল না।

ভাল্লুকের গলার বকলসটা ঠিক করার ছুতোয় ভাল্লুকওলা আগ্‌গাগের কান এড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "আমারই ভুল, দরজাটায় খিল দেওয়া হয় নি। ও যদি টের পেয়ে যায়, আমাদের চক্রান্ত একেবারে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আরো দু-এক মিনিট চালিয়ে যাও। তেড়ে ওঠ!" তার পর শেকল ধরে ভাল্লুকটাকে টেনে ধরে রাখবার ভান করলেও, আসলে তাকে আটকালেন না। দেবী-সাহেবাও উপস্থিতবুদ্ধির দৌলতে মুখ দিয়ে হিংস্র গর্জনের মতো আওয়াজ ছাড়তে লাগলেন, যদিও সেটা বেড়ালের গর্‌গরানির মতো শোনাল; তিনি আগ্‌গাগের দিকে এগোতে লাগলেন, আর ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে পিছু হটে ঘর থেকে বেরতে গিয়ে আগ্‌গাগ্ পা-পোষে হোঁচট খেলে, ঘরের বাইরে থেকে তার দড়াম্ করে আছাড় খাওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল—কিন্তু পুত্র-অন্ত-প্রাণ জননীও তাতে কর্ণপাত করলেন না, উত্তেজনায় তিনি এমনই মশগুল।

ভাইস-ওয়ার্ডেন দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন। হাঁফাতে

হাঁফাতে বললেন, "ছদ্মবেশ খুলে ফেল। এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। ও-ব্যাটা নিশ্চয়ই, প্রফেসরকে নিয়ে আসবে, তাকে তো আর এ-সবের মধ্যে টানা চলে না!" যে যার ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন, ঝট্‌পট্ সেগুলো আলমারির মধ্যে পাচার করা হল। দরজার খিল খুলে দেওয়া হল, আর, দুই ষড়যন্ত্রী সোফায় গিয়ে ভারি মাখামাখি করে পায়ে

গায়ে ঘেঁষে বসে একটা বই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। বসবার সময়ে টেবিলের ওপর থেকে ধাঁ করে বইটা তুলে নিয়েছিলেন ভাইস-ওয়ার্ডেন ; সেটা অচিন দেশের রাজধানীর তথ্যপঞ্জী, যাতে শহরের রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির কথা লেখা থাকে।

খুব আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে যেতে লাগল, প্রফেসর উঁকি মারলেন, তাঁর পেছনে আগ্গাগের বুদ্ধুমার্কা মুখটা দেখা যাচ্ছে।

ভাইস-ওয়ার্ডেন তখন জমিয়ে বলছেন, "কী সুন্দর ব্যবস্থা! লক্ষ্য করেছ, ওয়েস্ট স্ট্রিটে পৌঁছবার আগে গ্রীন স্ট্রিটে পনেরোটা বাড়ি রয়েছে।"

দেবী-সাহেবা বললেন, "পনেরোটা বাড়ি? তা কি সম্ভব? আমার মনে হচ্ছে চোদ্দোটা!" এই অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক বিষয় নিয়ে আলোচনায় দুজনে এমনই গভীরভাবে নিবিষ্ট যে, আগ্গাগের হাত ধরে প্রফেসর তাঁদের একেবারে সামনে এসে না-দাঁড়ান পর্যন্ত ওঁদের দিকে তাঁদের চোখই পড়ে নি।

দেবী-সাহেবাই তাঁদের প্রথম দেখলেন। "আরে, প্রফেসর যে!" অতি শান্ত-মধুর গলায় তিনি বললেন, "আমার মানিক-সোনাও যে এসেছে দেখছি! পড়া শেষ হল?"

কাঁপা গলায় প্রফেসর বলতে শুরু করলেন, "একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে! ছোটো-বাহাদুর আমায় বললেন যে, একটু আগেই তিনি না-কি, এই ঘরের মধ্যে একটা ভাল্লুক আর একজন বিদূষককে দেখেছেন—এই ঘরে। ভাল্লুকটা নাচছিল—এই ঘরে!"

ভাইস-ওয়ার্ডেন এবং তাঁর স্ত্রী চমৎকার অভিনয় করে হেসে উঠলেন, যেন কী মজার ব্যাপার।

ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "এ-ঘরে কী করে হবে, সোনা! একঘণ্টারও ওপর হবে আমরা তো ইয়ে পড়ছি—" কোলের ওপর-রাখা বইটা দেখে নিয়ে বললেন, "শহরের তথ্যপঞ্জীটা পড়ছি।"

বাবা খুব চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, "তোমার নাড়িটা একবার দেখি তো, বাবা! এবার জিভটা বার কর। এই তো, ঠিক ধরেছি! ওর একটু জ্বর-জ্বর ভাব রয়েছে, প্রফেসর, আর কিছু খারাপ স্বপ্ন দেখেছে নিশ্চয়ই। এক্ষুনি শুইয়ে দিন আর যাতে শরীর ঠাণ্ডা হয়, এমন কিছু শরবৎ-টরবৎ খাইয়ে দিন ওকে।"

প্রফেসর যখন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন যেতে যেতে আংগাগ্ শুধু বললে, "আমি মোটেই স্বপ্ন দেখেছি না!"

বাবা একটু কড়া গলায় বলে উঠলেন, "ব্যাকরণটা মোটেই শুদ্ধ হল না হে! ওর জ্বর-জ্বর ভাবটা ঠিক হয়ে গেলেই ওর ঐ ছোটো-খাটো ভুলগুলোর দিকে একটু নজর দেবেন, প্রফেসর! হ্যাঁ, ভালো কথা প্রফেসর! (দরজার গোড়ায় অমূল্য ছাত্ররত্নটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সন্ত্রস্তভাবে প্রফেসর আবার ফিরে এলেন।) একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে, জনসাধারণ একজন ইয়ে নির্বাচন করতে চাইছে. ইয়ে আর কি—বুঝতেই পারছেন, মানে আমি বলছি—"

শঙ্কিত হয়ে বেচারি বৃদ্ধ বলে উঠলেন, "আর একজন প্রফেসর নয় তো!"

ভাইস-ওয়ার্ডেন সাগ্রহে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "না, নিশ্চয়ই না! ওরা নির্বাচন করতে চাইছে, বিশেষ কিছুই নয়, সামান্য একজন সম্রাট, বুঝতে পারছেন তো।"

"সম্রাট!" বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে দুহাতে প্রফেসর তাঁর মাথাটা চেপে ধরলেন, না হলে ঐ আকস্মিক চমকে যেন সেটা ফেটে পড়বে। "ওয়ার্ডেন তা হলে—"

দেবী-সাহেবা জবাব দিলেন, "আরে, সম্ভবত ওয়ার্ডেনই তো সম্রাট হবেন। ওয়ার্ডেনের চেয়ে যোগ্য লোক আর পাচ্ছি কোথায় আমরা। অবশ্য এক যদি—" তিনি তাঁর স্বামীর দিকে চাইলেন।

ইঙ্গিতটা ধরতে না পেরে প্রফেসর সোৎসাহে সায় দিয়ে বললেন, "সত্যিই তো, কোথায়-ই বা পাচ্ছি!"

ভাইস-ওয়ার্ডেন পুরনো কথার জের টেনে বললেন, "আপনার কাছে কথাটা পাড়বার কারণ হল, আপনি যদি দয়া করে নির্বাচনের কর্তৃত্ব নেন, সেই অনুরোধ করা। বুঝলেন না, তাতে ব্যাপারটার মর্যাদা বাড়বে, কোনোরকম জাল-জচ্চুরির সন্দেহ করার উপায় থাকবে না—"

বৃদ্ধ প্রফেসর তোতলাতে লাগলেন, "আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, হুজুর-বাহাদুর! ওয়ার্ডেন তা হলে—"

ভাইস-ওয়ার্ডেন মাঝপথে বলে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক! দরবারের প্রফেসর হিসেবে আপনার পক্ষে সেটা ভালো দেখাবে না, আমিও স্বীকার করি। ঠিক আছে! আপনাকে ছাড়াই নির্বাচন হবে তা হলে।"

থতমত খেয়ে প্রফেসর বিড়্বিড়্ করে বললেন, "হ্যাঁ, আমাকে রেখে করার চেয়ে ছেড়ে করাই ভালো!" নিজেও ঠিক বুঝলেন না, কথাটার মানে কী দাঁড়াল। "শুইয়ে দিতে বললেন আর শরবৎ-টরবৎ কিছু খাওয়াতে বললেন, তাই তো?" তার পর যেন স্বপ্নের ঘোরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন, সেখানে গোমড়ামুখে আগ্‌গাগ্ অপেক্ষা করে আছে।

আমি ওদের পিছু নিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আগ্‌গাগের হাত ধরে প্রফেসর দালান দিয়ে যেতে যেতে দুর্বল স্মৃতিকে চাগিয়ে রাখবার জন্যে বিড়্বিড়্ করে আওড়াতে লাগলেন, "শ, শ, শ; শয়ন, শরবৎ আর শুদ্ধ ব্যাকরণ।" এমনিভাবে যেতে যেতে হঠাৎ সিল্‌ভি আর ব্রুনোর সামনে পড়ে গিয়ে এমন চমকে উঠলেন যে, তাঁর হাত আল্গা হয়ে গেল, আর আগ্‌গাগ্ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দে চম্পট।

দশম পরিচ্ছেদ

অন্য প্রফেসর

প্রফেসরকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে সিল্‌ভি বললে, "আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনাকে আমাদের কী ভয়ানক দরকার, কল্পনাও করতে পারবেন না!"

প্রফেসর বললেন, "কী ব্যাপার মা?" এমন উদ্ভাসিত চোখে তাদের দিকে চাইলেন, আগ্গাগের দিকে কখনো সেভাবে তাকান না।

তাঁর হাত ধরে ওরা হল-ঘরটা পার হতে লাগল, সিল্‌ভি বললে, "মালিকে আমাদের হয়ে একটু বলে দিন-না।"

ব্রুনো দুঃখ করে বললে, "খুব খারাপ ব্যাভার করে। বাবা চলে যাবার পর থেকে সকলেই খারাপ ব্যাভার করছে। সেই সিংহটা বরং অনেক ভালো ছিল!"

প্রফেসর বেশ ভাবনায় পড়লেন, বললেন, "কিন্তু, আমায় বুঝিয়ে বলতে তো হবে, কে সিংহ, কে মালি। এই দুটি প্রাণী যাতে একসঙ্গে গুলিয়ে না যায়, সেটা দেখা খুব দরকার। এবং একাকার হয়ে যাওয়াটা খুব বিচিত্রও নয়—দুজনেরই মুখ রয়েছে তো, বুঝলে কি-না—"

ব্রুনো বললে, "আপনি কি সর্বদাই দুটো জিনিসে গুলিয়ে ফেলেন না-কি?"

পরিষ্কার স্বীকার করলেন প্রফেসর, "তা, সত্যি কথা বলতে কি,

প্রায়ই গুলিয়ে ফেলি।" আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে খরগোসের খাঁচা আর মাটিতে বসান বড়ো বাক্স-ঘড়িটা—কেমন যেন গুলিয়ে যায়; দুটোরই পাল্লা আছে তো। এই তো, গতকাল—বিশ্বাস করবে?—আমি ঘড়ির তলাকার পাল্লাটা খুলে তার ভেতর শাক-পাতা দিলুম, আর খরগোসটাকে গেলুম দম দিতে!"

ব্রুনো বললে, "দম দেবার পর খরগোসটা চলল?"

হাতদুটো মাথার ওপর তুলে একসঙ্গে জড়ো করে প্রফেসর বললেন, "চলল মানে? চললে তো বাঁচতুম! শুধু চলল নয়, একেবারে চলে গেল! কোথায় যে গেল, কিছুতেই তার সন্ধান পেলুম না! আপ্রাণ চেষ্টা করেছি—বড়ো অভিধানটায় 'খরগোস' সম্বন্ধে যা যা লেখা আছে সব তন্নতন্ন করে পড়েছি!—কে? ভেতরে আসুন।"

দরজার বাইরে থেকে সন্ত্রস্ত গলায় কে যেন বললে, "আমি দর্জি, স্যার; আপনার সেই বিলটা—"

প্রফেসর ওদের দিকে চেয়ে বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমি ব্যাপারটা চুকিয়ে দিই। এ-বছর তা হলে কত দাঁড়িয়েছে হে?" দর্জি ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছে।

দর্জি একটু কড়া গলায় জবাব দিলে, "বছরের পর বছর ধরে কেবলই তো ডবল হয়ে যাচ্ছে, ট্যাকাটা আর আমি ফেলে রাখতে পারবু নি, বলে দিচ্ছি। দু হাজার পাউণ্ড হয়েছেন, খাঁটি কথা!"

"ও, এ তো সামান্য ব্যাপার!" আলটপকা কথাটা বলে প্রফেসর পকেট হাতড়াতে লাগলেন, যেন সচরাচর হাজার দুয়েক পাউণ্ড তাঁর কাছেই থাকে। "কিন্তু, আর এক বছর দেরি করে একেবারে চার-হাজার পাউণ্ড নেবার ইচ্ছে হয় না তোমার? কত বড়লোক হয়ে যাবে, ভেবে দেখ তো একবার! ইচ্ছে করলে রাজা বনে যেতে পার!"

দর্জি চিন্তিত ,গলায় বললে, "রাজা-গজা হতে শখ হবে কি-না জানি নি বাপু তবে কথা হচ্ছেন, ট্যাকার কথাটা শুনে চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি! তাই হোক, অপিক্ষেই করব—"

প্রফেসর বললেন, "নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। তোমার তো বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে হে, দেখছি। আচ্ছা, তা হলে এস।"

দর্জি বেরিয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ হতেই সিল্‌ভি বললে, "ঐ চার হাজার পাউণ্ড সত্যিই কি আপনাকে কোনোদিন শোধ করতে হবে?"

প্রফেসর অটল বিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন, "জীবনে নয়, বাছা! যত দিন বাঁচবে, টাকাটা ও ডবল করে যাবে। দুগুণ টাকা পাবার

আশায় একটা বছর অপেক্ষা করায় ফায়দা আছে! আচ্ছা এবার তোমরা কী করবে? অন্য যে আর-একজন প্রফেসর আছেন, তাঁর

কাছে নিয়ে যাব, যাবে ?" তার পর হাতঘড়ির তাকিয়ে আপন মনে বললেন, 'দেখা করার পক্ষে খুবই ভালো মওকা এখন, এইরকম সময়ে উনি একটু বিশ্রাম নেন—সাড়ে চোদ্দো মিনিট বিশ্রাম নেন।'

প্রফেসরকে পাক মেরে ওপাশে সিল্‌ভির কাছে গিয়ে তার হাতের মধ্যে নিজের হাতটা গছিয়ে দিয়ে ব্রুনো বললে, "গেলে তো ভালোই হয়, কিন্তু সবাই একসঙ্গে যাই, চলুন। একটু সাবধানে থাকা ভালো, বুঝলেন ?"

প্রফেসর বলে উঠলেন, "আরে, সিল্‌ভির মতো কথা বলছ যে !"

ব্রুনো কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "তা ঠিক, ভুলে ভুলে সিল্‌ভির মতো কথা বলে ফেলেছি। আসলে, ভয় হচ্ছে, যদি উনি খুব তিলিক্কি মেজাজের লোক হন ?"

প্রফেসর হো হো করে হেসে উঠলেন, "না, না, উনি খুবই শান্ত-শিষ্ট মানুষ ! আঁচড়ে-কামড়ে দেবেন না। তবে, একটু যা ভাবুক গোছের, বুঝলে।" এই বলে ব্রুনোর খোলা হাতটা ধরে একটা দালান দিয়ে তিনি ওদের নিয়ে চললেন ; এই দালানটা আগে দেখি নি। অবশ্য দালানে অদ্ভুত কিছু যে ছিল, তাও নয়। এই প্রাসাদে নতুন নতুন ঘর আর দর-দালান হামেশাই চোখে পড়েছে ; আর যেটা একবার দেখেছি, বেশির ভাগ সময়েই সেটা আর খুঁজে পাই নি।

দালানের শেষ মাথায় এসে দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রফেসর বললেন, "এই ঘরটা।"

ব্রুনো বললে, "দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে যাব কী করে ?"

দেওয়ালটার কোথাও কোনো ফাঁক-ফোকর আছে কি-না পরীক্ষা করছিল সিল্‌ভি, তাই কোনো কথা বলে নি। দেখে-শুনে নিয়ে হেসে উঠে বললে, "আমাদের সঙ্গে চালাকি হচ্ছে, মশাই ! এখানে দরজাই নেই।"

প্রফেসর বললেন, "এ ঘরেরই কোনো দরজা নেই। জানলা টপকে ঢুকতে হয়।"

কাজেই বাগানে যেতে হল। সেখানে অন্য প্রফেসরের ঘরের জানলা খুঁজে বার করা হল। একতলার জানলা, হাট করে খোলা ; প্রফেসর ওদের দুজনকে আগে তুলে দিয়ে নিজে ঢুকলেন, পেছনে আমি।

অন্য প্রফেসরটি টেবিলের সামনে বসে রয়েছেন। বিরাট একটা বই তাঁর সামনে খোলা পড়ে আছে। হাত দিয়ে বইটাকে জড়িয়ে ধরে, খোলাপাতার ওপর মাথা রেখে তিনি নাক ডাকাচ্ছেন। প্রফেসর বললেন, "খুব আগ্রহোদ্দীপক কিছু পেলে, উনি ঐরকম করেই পড়েন, আর, তখন ওঁর সাড়া পাওয়া ভয়ানক শক্ত।"

দেখা গেল, ঠিক সেইরকম অবস্থা ঘটেছে এখন ; প্রফেসর তাঁকে দু-একবার টেবিল থেকে তুলে ধরলেন, জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন, কিন্তু ছেড়ে দিতেই তাঁর মাথাটা আবার সেই বইয়ের পাতার ওপরেই ঠাঁই নিতে লাগল। আর, তাঁর লম্বা লম্বা গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন দেখে বোঝা গেল, বইটা সম্বন্ধে তার আগ্রহ সেই আগের মতোই রয়ে গেছে।

প্রফেসর বললেন, "কী রকম ঘোরের মধ্যে রয়েছেন দেখেছ? বইয়ের ঐ জায়গাটা নিশ্চয়ই খুবই আগ্রহোদ্দীপক!" অন্য প্রফেসরের পিঠের ওপর দমাদম কিল মারতে মারতে "হেই! হেই!" বলে হাঁক পাড়তে লাগলেন। তার পর ব্রুনোকে বললেন, "উনি যে এইরকম ঘোরের মধ্যে পড়ে থাকেন, স্বপ্নাবেশে মগ্ন হয়ে থাকেন—কী অদ্ভুত বল তো!"

ব্রুনো বললে, "সব সময়ে এরকম ঘুমে ঢলে পড়লে স্বপ্ন তো দেখতেই হবে!"

প্রফেসর বললেন, "কিন্তু, কী করা যায় এখন? দেখছ তো, মুখ জুবড়ে বই পড়ছেন একেবারে!"

ব্রুনো মতলব দিলে, "ধরুন, বইটা যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়?"

প্রফেসর খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক বাতলেছ! নির্ঘাৎ কাজ হবে তাতে!" বলে, এমন তড়বড় করে বইটা মুড়তে গেলেন, যে অন্য প্রফেসরের নাকটা পাতার ফাঁকে পড়ে চিপটে গেল।

অন্য প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে সটান দাঁড়িয়ে উঠলেন, বইটা তুলে নিয়ে ঘরের ও-মুড়োয় গিয়ে, বইয়ের তাকে ঠিক জায়গাটিতে বইটিকে ঢুকিয়ে রাখলেন। বললেন, "আঠারো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পড়ছি, এবার সাড়ে চোদ্দো মিনিট বিশ্রাম করব। বক্তৃতাটা তৈরি হয়ে গেছে?"

প্রফেসর খুব বিনীত হয়ে বললেন, "প্রায়। কয়েকটা জায়গায় ঠেকে গেছি, আপনার কাছে একটু দেখে নিতে হবে।"

"আর, খানা-পিনার কথাও বলছিলে না?"

"সে তো আছেই! প্রথমেই খানা-পিনা। জানেনই তো খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করলে লোকে কি আর বিজ্ঞানের কথা শুনতে চাইবে। তার পর যেমন-খুশি পোশাক পরে বল-নাচের ব্যবস্থা আছে। ওঃ, খুব ফুর্তির ব্যাপার হবে!"

অন্য প্রফেসর বললেন, "বল-নাচটা হচ্ছে কখন?"

"আমার মনে হয়, খানা-পিনার আগে হলেই ভালো, তাতে লোক-জনেরা সব কেমন চমৎকার এক জায়গায় এসে মিলিত হবার সুযোগ পাবে।"

"হাঁ, সেইভাবে হওয়াই ঠিক। প্রথমে মিলন, তার পর গেলন,

তার পর আপনার বলুন!" অন্য প্রফেসরটি সারাক্ষণই আমাদের দিকে পিছন ফিরে কথা বলে যাচ্ছেন, আর তাক থেকে একটা একটা করে বই বার করে, সেগুলোকে উল্টো করে সাজিয়ে রাখছেন, আর পায়ার ওপর একটা ব্ল্যাকবোর্ড খাড়া করা ছিল, বই উল্টোবার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে খড়ি দিয়ে একটা একটা করে দাগ কেটে যাচ্ছেন।

প্রফেসর থুতনিতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, "আর সেই 'শুয়োরের কাহিনী'—আপনি দয়া করে শোনাবেন, কথা দিয়েছেন—সেটা খানা-পিনার পরে হলেই ভালো হয়; লোকেরা চুপচাপ বসে শুনতে পারে।"

অন্য প্রফেসর বললেন, "ওটা গেয়ে শোনাব?"

প্রফেসর সতর্ক হয়ে উঠলেন, বললেন, "দেখুন, যদি পারেন।"

পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে অন্য প্রফেসর বললেন, "পরখ করে দেখা যাক। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে, স্বরগ্রামের এই পর্দা থেকে গানটার আরম্ভ।" বলে পিয়ানোর সেই চাবিটা টিপলেন তিনি। "লা, লা, লা! সাত-আটটা পর্দার বেশি তফাত হয় নি, মনে হচ্ছে!" ব্রুনো তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আবার একবার সেই চাবিতে আঙুলের টোকা মেরে তিনি তাকে বললেন, "আমার গলা দিয়ে কি এই সুরটাই বেরিয়েছিল, খোকা?"

ব্রুনো নির্দ্বিধায় বললে, "না, বেরোয় নি; আপনার গলার আওয়াজটা বরং হাঁসের ডাকের মতো শোনাল।"

অন্য প্রফেসর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "শুধু ফাঁকা একটা পর্দা গলা দিয়ে বার করলে ঐরকমই শোনায়। পুরোটা গেয়ে বরং দেখি—

একটা শুয়োর বসেছিল ভাঙা পাথরের চত্বরে—
নাচের জুতোটি ছিঁড়ে গড়াগড়ি যায়।
দিনরাত শুধু কাতরকণ্ঠে করুণ বিলাপ করে;
শুনে সুকঠিন পাথরের বুকে অশ্রুর ধারা ঝরে—
খুর মোচড়ায়, আর কাৎরায় আকাশ-বাতাস ভরে,
কারণ বেচারি লাফাতে পারে নি, হায়!

এটা গানের মতো হল কি, প্রফেসর?"

প্রফেসর একটু ভেবে নিলেন, বললেন, "দেখুন, গোটাকতক পর্দা

একইরকম, কোনো হেরফের নেই—কয়েকটা পর্দা একটু অন্যরকম—কিন্তু ঠিক 'সুর' বলা যায় না।"

অন্য প্রফেসর বললেন, "একটু নিজে নিজে করে দেখি," বলে পিয়ানোর এখানে-ওখানে চাবি টিপতে লাগলেন আর গুনগুন করতে লাগলেন।

প্রফেসর নিচু গলায় ওদের জিগেস করলেন, "ওঁর গান কেমন লাগল?"

সিল্‌ভি ইতস্তত করে বললে, "খুব একটা ভালো নয়।"

ব্রুনো সোজাসুজি বলে ফেলল, "খুব বেশি বিদিকিচ্ছিরি!"

প্রফেসর বললেন, "কোনো জিনিসেরই খুব বেশি হওয়াটা ভালো নয়।"

অন্য প্রফেসর ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রফেসরকে বললেন, "বাচ্চাদের এক মুহূর্তের মধ্যেই শুতে যাওয়া উচিত।"

প্রফেসর বললেন, "এক মুহূর্তের মধ্যে কেন?"

অন্য প্রফেসর বললেন, "দু মুহূর্তে যাওয়া সম্ভব নয় বলে।"

হাততালি দিয়ে উঠে প্রফেসর সিল্‌ভির দিকে ফিরে বললেন, "কী অদ্ভুত লোক না! এত তাড়াতাড়ি কেউ জবাব দিতে পারত? সত্যিই তো, দু মুহূর্তে যাবে কী করে ব্রুনো, তা হলে ওকে তো দুটো হতে হয়, দুভাগ হতে হয়! আর দুভাগ হতে গেলে ওর ভীষণ লাগবে!"

ব্রুনোর সত্যিই একটু ঢুল এসে গিয়েছিল, বড়ো-বড়ো চোখ করে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, "আমি মোটেই দুভাগ হতে রাজি নই!"

অন্য প্রফেসর বললেন, "ছবি এঁকে দেখাতে পারলে খুব ভালো হয়। মুস্কিল হচ্ছে, খড়িটা ভোঁতা হয়ে গেছে।" বলেই তিনি খড়িটা চেঁছে-ছুলে ঠিক করতে লেগে গেলেন।

সেই দিকে তাকিয়ে সিল্‌ভি বলে উঠল, "সাবধান! যেভাবে ছুরিটা ধরেছেন, আঙুল কেটে যেতে পারে!"

অন্য প্রফেসর বললেন, "ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তোমার গিয়ে, এই-রকম।" বলে বোর্ডের ওপর লম্বা একটা লাইন টানলেন, তার দু মাথায় লিখলেন 'ক' আর 'খ'; মাঝখানে লিখলেন 'গ'। "এবার বুঝিয়ে বলি। 'ক-খ' সরলরেখাকে যদি 'গ' বিন্দুতে বিভক্ত করতে হয়—"

ব্রুনো বলে উঠল, "পড়ে যাবে।"

অন্য প্রফেসর থতমত খেয়ে বললেন, "কে পড়ে যাবে?"

ব্রুনো বললেন, "গ পড়ে যাবে, আর দুটো টুকরো গ-এর ঘাড়ে হুড়্মুড়্ করে—"

অন্য প্রফেসর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন দেখে, প্রফেসর এগিয়ে এসে বললেন, "দেখুন প্রফেসর, আমি তখন যে বললুম, 'দুভাগ হতে গেলে লাগবে,' তার মানে ওর মনে লাগবে, মানে, কণ্ট অনুভব করবে আর-কি।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রফেসরের মুখ খুশিতে ভরে উঠল, বললেন, "কোনো কোনো লোকের অনুভূতি হতে বা টের পেতে ভয়ানক সময় লাগে—তাদের স্নায়ুর কাজ বড্ডো আস্তে আস্তে হয়। আমার এক বন্ধু ছিল, তার গায়ে লোহার শিক পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলে, টের পেতে অনেক বছর লেগে যেত।"

ব্রুনো বললে, "আর এমনি একটু চিমটি কাটলে?"

"তা হলে তো আরো অনেক বেশি সময় লাগত। সত্যি কথা বলতে কি, ও নিজে আদৌ কোনোদিন টের পেত কি-না সন্দেহ। ওর নাতি-নাতনিরা পেত হয়তো।"

ব্রুনো ফিস্ফিসিয়ে বললে, "চিমটি-খাওয়া দাদুর নাতি হতে চাই না, বাবা! আপনি হতে চান? বলা যায় না, যখন বেশ ফুর্তির সময়, ঠিক তৎখুনি হয়তো চিমটিটা এসে লাগল।"

ব্রুনো হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে কথাটা বললে। আমিও তাতে কিছু অবাক না হয়ে মনে মনে স্বীকার করলুম যে, অমন আচমকা অসময়ে চিম্টি লাগাটা সত্যিই খুব বদখৎ। বললুম, "তুমি সব সময়ে ফুর্তিতে থাকতে চাও, তাই-না ব্রুনো?"

ব্রুনো ভাবতে ভাবতে বললে, "সব সময়ে নয়; এক-এক সময়ে, যখন খু-ব আনন্দ লাগে, তখন এট্টু এট্টু দুঃখু পেতে ইচ্ছে করে। তখন আমি সিল্ভিকে জানাই, ও আমায় পড়া দেয়। তখন সব ঠিক হয়ে যায়।"

বললাম, "পড়তে তোমার ভালো লাগে না জেনে খুব খারাপ লাগছে। সিল্ভির মতো হও। সারাদিনই ও কেমন ব্যস্ত থাকে—যেমন বড়ো দিন, তেমন কাজের মেয়ে সিল্ভি!"

ব্রুনো বললে, "আমিও তো তাই!"

সিল্ভি প্রতিবাদ করে বললে, "মোটেই না! যেমন ছোট্টো দিন,

তেমনি কম কাজের হলি তুই !"

ব্রুনোর প্রশ্ন হল, "তপাৎটা কী? বলুন তো মশাইবাবু, একটা দিন যতখানি বড়ো, ততখানিই তো ছোটো? মানে, দিনের মাপ তো একই?"

ওভাবে কথাটা কখনো ভাবি নি, তাই প্রফেসরের কাছে সালিসী মানতে পরামর্শ দিলুম। ওরা তখখুনি প্রফেসরের দ্বারস্থ হল। প্রফেসর চশমার কাঁচ পুঁছছিলেন, ভাবতে গিয়ে হাত থামাতে হল; মিনিটখানেক পরে বললেন, "শোন বাছারা, দিনের সমান মাপের যে কোনো জিনিসের সঙ্গে দিনের মাপ এক।" বলেই আবার চশমা পুঁছতে লাগলেন।

আমাকে বলবার জন্যে ওরা দুটিতে আমার কাছে ফিরে এল। অবাক-হওয়া ফিস্‌ফিসে গলায় সিল্‌ভি বললে, "কী জ্ঞান, না? আমার অত জ্ঞান থাকলে, সারাদিন মাথা ধরে থাকত, আমি জানি, নির্ঘাৎ থাকত!"

প্রফেসর ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা দুটিতে যেন কার সঙ্গে কথা বলছ—অথচ সে এখানে নেই। কে সে?"

ব্রুনো থতমত খেয়ে গেল। বললে, কেউ না থাকলে আমি কখখনো কারও সঙ্গে কথা বলি না। বলাটা অভদ্দতা। আগে আসুক, তখন কথা বলতে হয়, তার আগে পর্যন্ত চুপ করে থাকতে হয়!"

আমি যেখানে রয়েছি, প্রফেসর সেই দিকে তাকালেন, মনে হল, আমাকে ভেদ করে তাঁর চোখ ছুটেই চলেছে, কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। "তা হলে কার সঙ্গে কথা বলছিলে? অন্য প্রফেসর ছাড়া তো এখানে কেউ নেই, আর তিনি—যাঃ, তিনিও নেই!" লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে তিনি বললেন, "খোঁজ! শিগ্‌গির খুঁজে বার কর! আবার হারিয়েছেন তিনি!"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে দুপায়ে খাড়া।

সিল্‌ভি বললে, "কোথায় খুঁজব?"

প্রফেসর তখন দারুণ উত্তেজিত। বললেন, "যেখানে খুশি, কেবল, একটু তাড়াতাড়ি কর!" ঘরময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন, চেয়ার-গুলোকে তুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখতে লাগলেন।

প্রফেসরের দেখাদেখি ব্রুনো তাক থেকে একটা ছোট্টো বই পেড়ে নিয়ে ঝেঁকে দেখতে লাগল। বললে, "এখানে নেই।"

সিল্‌ভি চট্‌ উঠে বললে, "ওর মধ্যে থাকতে পারে কেউ ?"

ব্রুনো বললে, "পারে নাই তো ! থাকলে আমার ঝাঁকুনির চোটে এতক্ষণে তো পড়েই যেতেন !"

আগুন পোহাবার চুল্লির সামনে-পাতা কম্বলটার একটা কোণ ধরে তুলে তলায় উঁকি দিতে দিতে সিল্‌ভি জিগেস করলে, "এর আগেও কি উনি হারিয়েছেন ?"

প্রফেসর বললেন, "একবার জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন।"

ব্রুনো বলে উঠল, "তার পর আর নিজেকে খুঁজে পেলেন না ? চেঁচিয়ে ডাকলেই পারতেন। নিজের ডাক নিশ্চয় শুনতে পেতেন, বেশি দূরে তো থাকা যায় না।"

প্রফেসর বললেন, "এস, হাঁক পাড়ি।"

সিল্‌ভি বললে, "কী বলে হাঁক পাড়ব ?"

তার উত্তরে প্রফেসর বললেন, "না, ফের ভেবে দেখলুম, হাঁক পাড়া হবে না। তোমাদের গলা ভাইস-ওয়ার্ডেনের কানে পৌঁছতে পারে। উনি আজকাল ভয়ানক কড়াক্কড়ি করেছেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

গান-বাগানের মালি

যেজন্যে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এই বৃদ্ধ প্রফেসরের কাছে আসা, ভাইস-ওয়ার্ডেনের নাম করতেই, এতক্ষণে সেটা মনে পড়ে গেল ওদের। ব্রুনো মাটিতে বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "উনি কী খারাপ! আগ্গাগ্ আমার সব পুতুল নিয়ে নিল, উনি কিচ্ছু বললেন না! কী জগন্য খাবার খেতে দেয়!"

প্রফেসর বললেন, "আজ কী খেতে দিয়েছিল?"

ব্রুনো করুণস্বরে বললে, "মরা কাকের একটা টুকরো।"

ব্রুনো বললে, "অ্যাপ্‌ল-পুডিং ছিল, আগ্গাগ্ সবটা খেয়ে নিলে, আমার ভাগে শুধু মাথার ছালটা! একটা কমলালেবু চাইলুম—তা—দিলে না!" বলতে বলতে বেচারি সিল্‌ভির কোলে মুখ গুঁজে ফেললে। সিল্‌ভি তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, "একটা কথাও মিথ্যে নয়, প্রফেসরমশাই! আমার ব্রুনো-সোনার সঙ্গে ওরা ভয়ানক দুর্ব্যবহার করছে! আমার সঙ্গেও মোটেই ভালো ব্যবহার করছে না।" শেষ কথাটা একটু মৃদুস্বরে বললে, যেন ব্যাপারটা তেমন কিছু জরুরি নয়।

একটা বড়ো লাল সিল্কের রুমাল বার করে প্রফেসর চোখ মুছলেন। বললেন, "যদি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারতুম গো, বাছারা! কিন্তু কী-ই বা করতে পারি আমি?"

সিল্‌ভি বললে, "বাবা যেখানে গেছেন, সেই পরীর দেশের রাস্তা আমরা জানি। কেবল মালিটা যদি একবার বাইরে যেতে দেয়!"

প্রফেসর বললেন, "কেন? দরজা খুলে দেবে না?"

সিল্‌ভি বললে, "আমাদের দেবে না। তবে, আমি নিশ্চয়ই জানি, আপনাকে দেবে। আসুন-না, প্রফেসরমশাই, চলুন-না, বলুন-না ওকে!"

প্রফেসর বললেন, "এক্ষুনি যাচ্ছি।"

ব্রুনো উঠে বসে চোখ মুছে বললে, "কী ভালো লোক, তাই না, মশাইবাবু?"

বললাম, "নিশ্চয়ই ভালো লোক।" কিন্তু আমার মন্তব্য প্রফেসরের কানেই ঢুকল না। ঘরের কোণে অন্য প্রফেসরের অনেক ছড়ি আর লাঠি রাখা ছিল, সেইখান থেকে লাঠি বাছতে লাগলেন। মাথায় ইতিমধ্যে একটা সুন্দর টুপি পরে নিয়েছেন, তাতে আবার লম্বা ঝুমকো ঝুলছে। আপন মনে বলছেন, 'হাতে একটা মোটা লাঠি থাকলে, বেশ গণ্যমান্য দেখায়।' তার পর ওদের ডাক দিলেন, "এস গো!" সবাই বাগানে গেলাম।

যেতে যেতে প্রফেসর বললেন, "আবহাওয়া নিয়ে গোটাকতক রসিকতা করে প্রথমে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ব। তার পর অন্য প্রফেসরের কথা জিগেস করব। যদি দেখে থাকে কোনদিকে গেছেন, তা হলে সেই দিকে গেলে তাঁর খোঁজ পাব, না-দেখে থাকলে, পাব না।"

মালিকে খুঁজতে হল না। গাছপালার আড়ালে থাকলেও তার বাজখাঁই গলার আওয়াজেই আমরা হদিশ পেয়ে যাচ্ছিলুম; যতই কাছে আসতে লাগলুম, তার গানের কথাগুলো ততই পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল:

'তার মনে হয়, দেখল সে গাঙচিল্ল
বাতির কাছে লাগিয়েছে পাক-খাওয়া;
আবার দেখে বুঝলে আসলে তা
ডাকের টিকিট, এক পেনিতে পাওয়া।
বললে, "রাতে বাইরে থাকিস নিকো,
বড্ডো বেশি স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া!"'

ব্রুনো বললে, "কেন? ঠাণ্ডা লাগবার ভয়?"

সিল্‌ভি বুঝিয়ে দিলে, "আবহাওয়া খুব স্যাঁতস্যাঁতে হলে, বুঝছিস না, চটচটে হয়ে কোথাও সেঁটে যেতে পারে।"

ব্রুনো সোৎসাহে বলে উঠল, "আর, যাতে সেঁটে যাবে, সে যাই-ই হোক, সেটাকে ডাকে যেতেই হবে। ধর, সেটা একটা গোরু। ডাকে আর যে-সব জিনিস যাবে, তাদের কী ভীষণ অবস্থা বল তো?"

প্রফেসর বললেন, "ওর জীবনে এই ধরনের সব ব্যাপার ঘটেছে; তাই জন্যে ওর গানটা এমন মন কেড়ে নেয়।"

সিল্‌ভি বললে, "ওর জীবনটা নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত!"

প্রফেসর সানন্দে সায় দিলেন, "তা বলতে পার!"

ব্রুনো বললে, "নিশ্চয় বলতে পার!"

ততক্ষণে আমরা মালির কাছে এসে পড়েছি। বরাবরের মতো সে একঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে একটা খালি ঝারি নিয়ে ফুলগাছে জল দিচ্ছিল।

জানান দেবার জন্যে তার জামার আস্তিন টেনে ব্রুনো বললে, "ওতে জল নেই যে!"

মালি বললে, "তাইতেই তো হাল্কা লাগছে। জল থাকলে এত ভারী হয় যে, হাত ব্যথা করে।" তার পর আবার গুনগুন করতে করতে সে কাজ করতে লাগল:

"বড্ডো বেশি স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া!"

প্রফেসর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "মাটি থেকে কিছু খুঁড়ে বার করবার সময়ে—মাঝে-সাঝে বোধ হয় কর; কোনো কিছু ডাঁই করে রাখতে রাখতে—নিশ্চয়ই প্রায়ই করতে হয়; কিম্বা পা দিয়ে কিছু সরাতে সরাতে—অনবরতই যা করে থাক; এইরকম কোনো কিছু করতে করতে অন্য একজন প্রফেসরকে চোখে পড়েছে কি?—অনেকটা আমারই মতো দেখতে হলেও, একটু অন্যরকম?"

"বিলকুল নয়! ওরকম কোনো কিছু হয়ই না!" হঠাৎ এত হুংকার দিয়ে মালি কথাগুলো বললে যে, সিঁটিয়ে গিয়ে পিছু হটে এলাম।

সিল্‌ভিদের দিকে ফিরে প্রফেসর বললেন, "বড্ডো উত্তেজিত হয়েছে; খুব হালকা কথা কিছু পাড়া যাক। তোমরা বলছিলে—"

সিল্‌ভি বললে, "আমরা ওকে বাগানের দরজাটা খুলে দিতে বলেছিলাম, যাতে বাইরে যেতে পারি। কিন্তু ও দেয় নি; আপনি বললে হয়তো দেবে।"

প্রফেসর খুব অনুনয় করে, খাতির করে কথাটা পাড়লেন মালির কাছে।

মালি বললে, "আপনাকে যেতে দিতে পারি, কিন্তু ওদের জন্যে কিছুতেই দরজা খুলতে পারব না। ভেবেছেন, আমি নিয়ম ভাঙব? দেড় শিলিঙ পেলেও নয়!"

প্রফেসর খুব সন্তর্পণে দু শিলিঙ বাড়িয়ে ধরলেন।

"এতে হবে!" বলে খালি ঝাঁঝরিটা ফুলের কেয়ারি পার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে একগোছা চাবি বার করলে, তাতে একটা বড়ো চাবি আর অনেকগুলো ছোটো চাবি।

সিল্‌ভি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "একটা কথা, প্রফেসরমশাই!" আমাদের জন্যে দরজা খোলবার কোনো দরকার নেই, আপনার সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব।"

প্রফেসর কৃতার্থ হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ, মা! দুটো শিলিঙ বেঁচে গেল!" বলেই পকেটে পুরে ফেললেন। তার পর, দরজা খুললেই যাতে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারেন, তাই জন্যে ওদের হাত ধরালেন। কিন্তু সে-সুযোগ আসবে বলে তো মনে হল না, কারণ মালি একের পর এক ছোটো চাবিগুলো লাগিয়ে লাগিয়ে যতই চেষ্টা করে, দরজা আর খোলে না।

শেষকালে প্রফেসর সাহস করে সবিনয়ে বললেন, "বড়ো চাবিটা একবার দেখলে হত না? আমি দেখেছি, যে-দরজার যে-চাবি, তাই দিয়েই বেশ সুড়ুৎ করে দরজা খুলে যায়।"

বড়ো চাবিটা লাগানমাত্রই দরজার তালা খুলে গেল, দরজা হাট করে দিয়ে মালি পয়সার জন্যে হাত বাড়ালে।

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, "নিয়ম অনুযায়ী তুমি আমার জন্যে দরজা খুলেছ। এখন দরজা খুলেছে, আর আমরাও নিয়ম মেনেই বাইরে যাচ্ছি তিনজনে—তৈরাশিকের নিয়ম।"

মালি থতমত খেয়ে আমাদের ছেড়ে দিলে; তার পর শুনতে পেলুম দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে আপন মনে সে গাইছে:

'দেখল যেন ফুলবাগানের দোর,
চাবি দিতেই ঘুচল তালার বাধা;
আবার দেখে বুঝলে, আসলে তা
আঁকের নিয়ম—ত্রৈরাশিকের ধাঁধা।
বললে, "ও-সব আমার কাছে সোজা,
দিনের আলোর মতোই সরল, সাদা!" '

খানিক দূর এগিয়ে প্রফেসর বললেন, "আমায় ফিরতেই হল। এখানে পড়াশুনার উপায় নেই, বুঝলে তো; বইপত্তর সবই তো বাড়িতে।"

ওরা তবু ওঁর হাত চেপে ধরে রইল। জল-ভরা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে সিল্‌ভি বললে, "চলেই আসুন-না আমাদের সঙ্গে!"

ভালোমানুষ বৃদ্ধ প্রফেসর বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, পরে শিগ্‌গিরই একসময়ে নাহয় আসা যাবে। এখন কিন্তু ফিরতেই হবে আমায়। লিখতে লিখতে এক জায়গায় একটা 'কমা' বসিয়ে রেখে এসেছি, বাক্যটা ঠিক কী ভাবে শেষ হবে, না-জানা পর্যন্ত বড়ো অস্বস্তি লাগে! তা-ছাড়া, আগে তোমাদের কুকুর-পাড়া দিয়ে যেতে হবে, আর আমার আবার কুকুরের ভয় আছে। তবে, পরে এক সময়ে ঠিক যাব। আচ্ছা, ভালোয় ভালোয় এস, বাছারা! বিদায়!" তার পর, আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলে উঠলেন, "বিদায়, মশাই!"

"বিদায়, প্রফেসর!" বললুম বটে, তবে আমার গলাটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, কেমন অদ্ভুত শোনাল। কিন্তু এ-সব দিকে ওদের খেয়াল নেই। বোঝাই যাচ্ছে, ওরা আমায় দেখেও নি, আমার কথা ওদের কানেও যায় নি, তাই পরম আদরে দুজনে দুজনের হাতে হাত জড়িয়ে গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে চলেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুকুর-রাজার রাজত্বে

মনে হল মাইল পঞ্চাশেক এসেছি, এমন সময়ে সিল্‌ভি বলে উঠল, "বাঁ দিকে খানিক দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে রাত্তিরে থাকবার জায়গা চাই, চল।"

আমরা বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। ব্রুনো বললে, "দেখে মনে হচ্ছে, বাড়িটায় বেশ আরাম পাওয়া যাবে। এখন কুকুরেরা একটু ভালো ব্যাভার করলে বাঁচি ; আমার হাত-পা আর চলছে না, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে!"

বিরাট একটা ম্যাসটিফ কুকুর—গলায় টকটকে লাল বক্‌লস, হাতে একটা গাদা-বন্দুক—সদরের সামনে প্রহরীর মতো পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। ওদের দেখেই সে বন্দুকের মুখটা সোজা ব্রুনোর দিকে তাগ করে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ব্রুনোর মুখ সাদা হয়ে গেল, শক্ত করে সিল্‌ভির হাত ধরে রইল, তবে নড়ল না, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রহরী গম্ভীরভাবে ঘুরে ঘুরে চারদিক থেকে ওদের দেখলে। তার পর ডাক ছাড়লে, "উবাহ্ ইয়াওয়াহ্ উবুহ্। ভৌ হৌয়া হুভৌবুহ্? ভৌ হৌ?" মনে হল, খুব তম্বি করে ব্রুনোকে কিছু জিগেস করলে।

ব্রুনোর বুঝতে কিছু অসুবিধে হল না, কারণ পরীরা সবাই

কুকুরদের ভাষা জানে। তবে তোমাদের পাছে অসুবিধে হয়, তাই ওদের কথাবার্তা সব বাঙলাতেই দিচ্ছি: "মানুষ দেখছি যে! দুটো দল-ছাড়া মানুষ! তোমরা কোন কুকুরের পোষা? কী চাও?"

ব্রুনো কুকুরের ভাষায় জবাব দিলে, "আমরা কুকুরের পোষা হতে যাব কেন?"

কথাটা শুনে পাছে ম্যাস্টিফের অপমান লাগে, তাই তাড়াতাড়ি

করে সিল্‌ভি বলে উঠল, "দেখুন, আমাদের চাট্টি খাবার আর রাত্তিরে জন্যে থাকবার জায়গা চাই—যদি বাড়িতে একটু ঠাঁই হয়" খুব বিনয় করে বললে।

প্রহরী ক্ষেপে উঠে বললে, " 'বাড়ি' ? তাই বুঝি ? 'প্রাসাদ' কাকে বলে তাও জান না, জীবনে কখনো দেখ নি ? আমার সঙ্গে এস ! মহারাজের কাছে চল, তিনিই তোমাদের যা হোক ব্যবস্থা করবেন।"

প্রহরীর পেছন পেছন বিরাট হল-ঘর পার হয়ে, একটা লম্বা চলন দিয়ে গিয়ে তারা চমৎকার একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরের চারিধারে নানান মাপের আর নানান জাতের সব কুকুর ভাগ ভাগ হয়ে বসে রয়েছে। রাজমুকুট নিয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার দুপাশে গম্ভীরমুখে
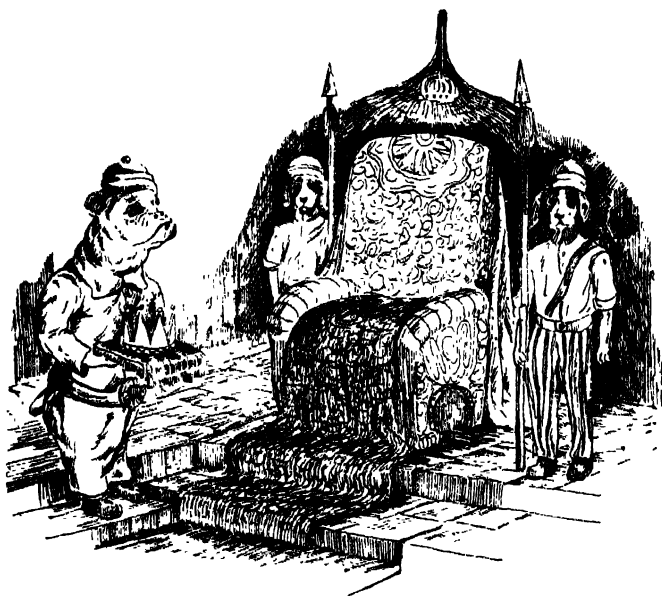
খাড়া রয়েছে দুটো চমৎকার ব্লাড-হাউণ্ড। দু-তিনটে বুল-ডগ—মনে হয় রাজার দেহরক্ষী হবে—চুপচাপ অপেক্ষা করছে। সত্যি কথা বলতে কি, চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে খুব স্পষ্ট হয়ে যা শোনা যাচ্ছে তা হল দুটি ছোট্টো কুকুরের গলার আওয়াজ ; হাতওলা বেঞ্চির ওপর বসে বসে যেভাবে তারা আলাপ করছে, তাকে ঝগড়া বলতে কোনো বাধা নেই।

আমাদের নিয়ে ঘরে ঢোকবার সময়ে প্রহরী খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললে, "এঁরা সব সভাসদ—লর্ড আর লেডি—আর রাজ-কর্মচারী।" আমার দিকে তারা কেউ চেয়েও দেখলে না, কিন্তু সিল্‌ভি আর ব্রুনোর দিকে অনেককেই উঁকি-ঝুঁকি মারতে আর তার পর কানাকানি করতে দেখা গেল। তার মধ্যে থেকে পরিষ্কার কানে এল, একটা ডাক্‌স্যাণ্ট কুকুর তার বন্ধুকে বলছে, "বাহ্ উহ্ ওয়াহ্‌য়াহ্ হুবাহ্ উবুহ্ হাহ্ বাহ ?"
("মেয়েটাকে মানুষ হিসেবে খুব খারাপ দেখতে নয়, তাই না ?")

আমাদের ঘরের মাঝখানে রেখে প্রহরী ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল ; দরজার বাইরে লেখা রয়েছে 'রাজকীয় কুক্কুরাবাস—আঁচড়াও আর চ্যাঁচাও।'

দরজা আঁচড়াবার বা ঘেউ ঘেউ করবার আগে, প্রহরী ওদের দিকে ফিরে বললে, "তোমাদের নামগুলো দাও তো ?"

"কেন দিতে যাব ?" বলে ব্রুনো সিল্‌ভিকে দরজার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনতে আনতে বললে, "নামগুলো আমাদের নিজেদেরও তো দরকার, দিলে চলবে কী করে ? চল, সিল্‌ভি, ফিরে যাই ! শিগ্‌গির যাই, চল !"

"বাজে বকিস নি !" বলে সিল্‌ভি প্রহরীকে নাম বলে দিলে।

তখন প্রহরী দরজার গায়ে নখ দিয়ে ভীষণভাবে আঁচড়াতে লাগল, আর এমন একটা ডাক ছাড়লে যে, ব্রুনোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল।

ভেতর থেকে মোটা গলার আওয়াজ এল, "হুয়াহ্ ওয়াহ্ !" (কুকুরদের ভাষায় 'ভেতরে এস !')

ম্যাস্‌টিফ চমকে গিয়ে বললে, "একেবারে খোদ রাজামশাই !! তাড়াতাড়ি মাথার পরচুলগুলো খুলে ফেল, তার পর রাজামশাইয়ের থাবার সামনে নিবেদন কর।" (আমরা যাকে বলি 'চরণে', আর-কি।)

খুব সবিনয়ে সিল্‌ভি তাকে বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছে যে, ঐ কাজটি ওদের দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ ওদের মাথার ঐ পরচুলটা কিছুতেই খোলা যায় না—এমন সময়ে রাজকীয় কুক্কুরাবাসের দরজাটি খুলে গেল, আর অতিকায় এক নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর দরজার ফাঁকে তার মাথাটি বাড়ালে। "ভৌ হৌ ?" হল তার প্রথম প্রশ্ন।
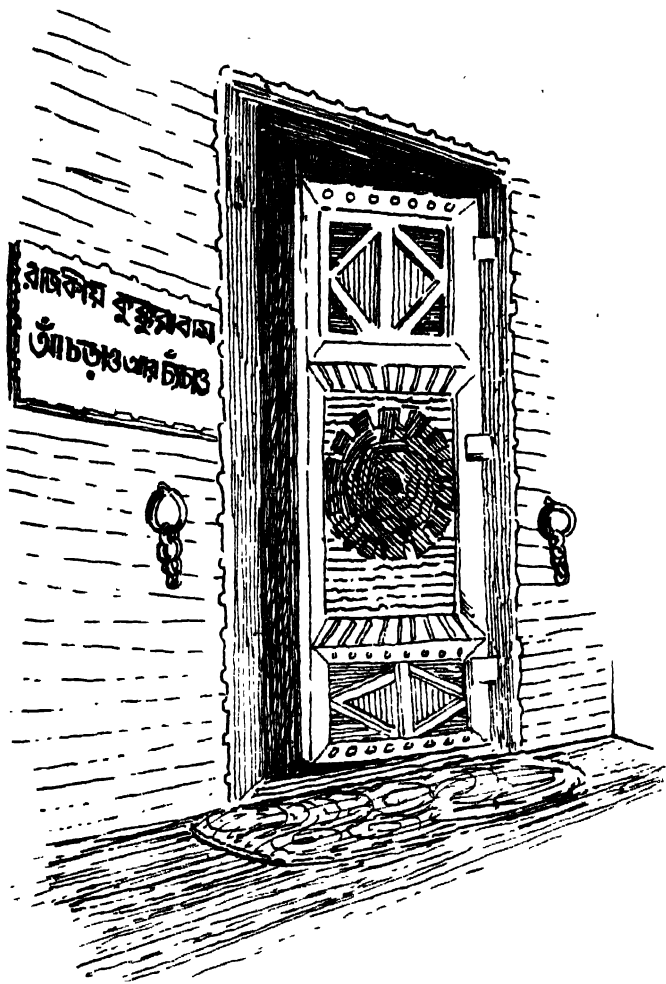
ম্যাস্‌টিফটা তাড়াতাড়ি ব্রুনোর কানে কানে বললে, "মহারাজ যখন কথা বলেন, তখন কান খাড়া করে রাখতে হয়!"

ব্রুনো ইতস্তত করে সিল্‌ভির দিকে তাকালে। বললে, "আমি পারব না, লাগবে!"

একটু বিরক্ত হয়ে প্রহরী ম্যাস্‌টিফ বললে, "একটুও লাগে না! এই দেখ! এইরকম!" বলে সে তার কানদুটোকে রেলের সিগন্যালের মতো খাড়া করে ফেললে।

সিল্ভি তাকে শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলে—"দেখুন, আমরা তো ওরকম করতে পারি না। আমার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু কী করব বলুন, কান খাড়া করতে গেলে যেমন হওয়া দরকার, আমাদের কানের—" কুকুরদের ভাষায় সে বলতে চেয়েছিল, 'যন্ত্রপাতি', কিন্তু কিছুতেই কথাটা মনে পড়ল না, যা মনে এল, সেটার মানে হয় 'রেলের ইঞ্জিন'।

প্রহরী মহারাজের কাছে সিল্ভির বক্তব্য নিবেদন করলে।

মহারাজ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "রেলের ইঞ্জিন ছাড়া কান খাড়া করতে পারে না! ভারি অদ্ভুত প্রাণী তো! একবার চোখে দেখা দরকার!" কুক্কুরাবাসের বাইরে এসে তিনি গম্ভীরভাবে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন।

তিনি কাছে আসতে সিল্ভি যখন সত্যি সত্যি মহারাজের মাথায় আদর করে চাপড় মারতে লাগল, আর ব্রুনো তাঁর লম্বা কানদুটোকে নিয়ে গলার কাছে গেঁট পাকাবার চেষ্টা করতে লাগল, তখন সভাসদদের মুখে চোখে সে কী বিস্ময়!—ভয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম!

প্রহরীটা গর্‌গর্‌ করে উঠল; একটা সুন্দর গ্রেহাউণ্ড—মহারাজের পার্শ্বচরী লেডিদের একজন—অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, আর অন্য-সব সভাসদরা তাড়াতাড়ি দশ হাত পিছিয়ে জায়গা করে দিলেন, যাতে অতিকায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর-মহারাজ ঐ দুর্বিনীত অজানা অতিথিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারেন।

কিন্তু, তিনি তা করলেন না। বরং একটু মুচকি হাসলেন—কুকুরের পক্ষে যতখানি হাসা সম্ভব—আর (অন্য কুকুররা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে সত্যি) মহারাজ ল্যাজ নাড়তে লাগলেন!

চারিদিক থেকে রব উঠল, "ইয়াহ্! হুহ্ হাঃউহ্!" (মানে 'ওফ্! এ ভাবা যায় না!')

মহারাজ কট্‌মট্ করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে সামান্য একটু হুংকার ছাড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে সব চুপচাপ হয়ে গেল। বললেন, "আমার বন্ধুদের ভোজসভার হল-ঘরে নিয়ে যাও!" বলবার সময়ে 'আমার বন্ধুদের' কথাদুটোর ওপর এমন জোর দিলেন যে, কিছু কুকুর অসহায়ভাবে চিৎপাত খেয়ে শুয়ে পড়ে ব্রুনোর পা চাটতে লাগল।

একটা শোভাযাত্রার মতো করে সবাই ওদের এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ; আমি ভোজসভার হল-ঘরের দরজা অবধি গিয়ে থেমে পড়লুম, কারণ ভেতরে একগাদা কুকুর মিলে হৈ-হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। রাজার পাশে এসে বসলুম, মনে হল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওরা রাজা-মশাইকে শুভরাত্রি জানাবার জন্যে ফিরে আসতে, তিনি উঠে ফট্‌ফট্ করে গা-ঝাড়া দিলেন।

হাই তুলতে তুলতে মহারাজ বললেন, "শুতে যাবার সময় হল! পরিচারকেরা তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে।" তার পর ওদের চুমু খাবার জন্যে খুব কেউ-কেটার মতো একটা থাবা বাড়িয়ে দিলেন।

রাজসভার কায়দা-কানুন বিশেষ জানা নেই ওদের। সিল্‌ভি থাবার ওপর ছোট্টো করে কয়েকটা চাপড় মারলে, ব্রুনো থাবাটা জড়িয়ে ধরলে ; মহারাজ বিস্ময়ে স্তম্ভিত!

এতক্ষণ ধরে জমকালো উর্দি-পরা এক দল পরিচারক-কুকুর দৌড়ো-দৌড়ি করে আলো এনে এনে টেবিলের ওপর রেখে যাচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আর-এক দল সেগুলো নিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কাজেই আমার ভাগ্যে একটাও জুটবে বলে মনে হল না। মহারাজ অনবরত আমায় কনুই দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে বলতে লাগলেন, "এখানে ঘুমতে দিচ্ছি না! এটা বিছানা নয়, বুঝলে হে! অবশ্য একটু তন্দ্রা কাটালে দোষ নেই।"

কোনোরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে পারলাম, "জানি, আমি বিছানায় শুয়ে নেই, আরাম-কেদারায় বসে আছি।"

কে যেন চলে গেল, যাবার সময়ে কী যে বলে গেল, ভালো করে শুনতে পেলুম না। পাবই-বা কী করে ; আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেই ঘাট থেকে অনেক মাইল দূরে একটা জাহাজের ধারে ঝুঁকে পড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটা দিগন্তে মিলিয়ে গেল, আর আমি আরাম-কেদারার মধ্যে লটকে পড়লুম।

যখন টের পেলুম, তখন সকাল হয়ে গেছে ; প্রাতরাশের পালা সেইমাত্র শেষ হয়েছে ; সিল্‌ভি ব্রুনোকে একটা উঁচু চেয়ার থেকে ধরে নামাচ্ছে। একটা স্প্যানিয়েল কুকুর হাসিমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল, সিল্‌ভি তাকে বললে, "ধন্যবাদ, খুব ভালো জলখাবার খাওয়া হল। তাই না ব্রুনো?"

ব্রুনো বলতে গেছে, "বড্ডো হাড়—" সিল্‌ভি ভ্রূকুটি করে তার ঠোঁটে আঙুল চেপে থামিয়ে দিলে, কারণ তখন অত্যন্ত মান্যগণ্য একজন রাজকর্মচারী তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হলেন প্রধান ভৌকারিক, ওদের বিদায় নেবার আগে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন, তার পর কুকুর-রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পেঁৗছে দেবেন। রাজা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পরম সমাদরে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন, তবে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার বদলে প্রধান ভৌকারিককে চমকে দিয়ে তিনবার ভৌ ভৌ করে হাঁক ছাড়লেন, যার অর্থ হল, তিনি নিজেই ওদের সঙ্গে করে রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পেঁৗছে দেবেন।

প্রধান ভৌকারিক মহারাজকে বোঝালেন, "এটা ভয়ানক রীতি-বহির্ভূত কাজ হবে, মহারাজ!" এইভাবে তাকে নিরস্ত করবার জন্যে ক্ষোভে তার গলা বুজে এসেছে প্রায়, কারণ বেচারি এই উপলক্ষে সবচেয়ে জমকাল দরবারি পোশাকটা গায়ে দিয়ে এসেছিল, পুরোটা বেড়ালের চামড়ায় তৈরি।

মহারাজ আবার বললেন, "আমি নিজে ওদের পেঁৗছে দেব।" মৃদু অথচ অটল ভঙ্গিতে কথাটা বলে তিনি রাজপোশাক সরিয়ে রাখলেন, রাজমুকুট খুলে রেখে ছোট্টো একটা মামুলি মুকুট পরলেন, বললেন, "তুমি প্রাসাদেই থাক।"

অন্য কেউ শুনতে না-পায়, এমনি করে সিল্‌ভির কানে কানে ব্রুনো বললে, "আমি খুব খুশি হয়েছি! উনি ভয়ানক রেগে গেছিলেন!" আনন্দের চোটে সে মহারাজের গায়ে শুধু থাবড়েই দিলে না, গলাও জড়িয়ে ধরলে।

মহারাজ অত্যন্ত শান্তভাবে তার রাজ-পুচ্ছটি নাচালেন। বললেন, "কখনো-সখনো রাজবাড়ি থেকে বেরতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি! রাজবংশের কুকুরদের জীবনটা বড়ো একঘেয়ে, জেনে রাখ! কিছু যদি মনে না-কর (এই কথাটা গলা নামিয়ে সিল্‌ভিকে বলা হল, বলতে বলতে বেশ বিব্রত আর সঙ্কুচিত হলেন) কিছু যদি মনে না-কর, ঐ লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে দেবে, আমি মুখে করে নিয়ে আসব?"

সিল্‌ভি এমন অবাক হয়ে গেল যে, খানিকক্ষণের জন্যে সে নড়তেও পারলে না। রাজা কি-না লাঠি আনতে দৌড়বে! কিন্তু ব্রুনোর তাতে কোনো হেলদোল নেই, "হে-ই, লে, লে! কুড়িয়ে নিয়ে এস তো

কুকুরমণি !" বলে লাঠিটা একটা ঝোপের ওপর ছুঁড়ে দিলে। পর মুহূর্তেই কুকুর-রাজ্যের প্রবল-পরাক্রান্ত অধিপতি সেই ঝোপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিটা মুখে করে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ওদের কাছে এসে হাজির। ব্রুনো লাঠিটা নিয়ে নিল। তার পর বললে, "লাঠিটা চাও, চেয়ে নাও !" মহারাজ কাতর চোখে লাঠিটার জন্যে সাধলেন। সিল্‌ভি বললে, "থাবা বাড়াও !" মহারাজ থাবা বাড়ালেন। মোট কথা, অতিথিদের কুকুর-রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পেঁৗছে দেবার গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানটি বেশ মজার একটা খেলা হয়ে দাঁড়াল। এই করতে করতে ওরা এগুতে লাগল।

শেষ অবধি কুকুর-রাজ বললেন, "কর্তব্য হল কর্তব্য। আমাকে এবার আমার কর্তব্য করে ফিরে যেতে হবে।" একটা গোয়েন্দা-কুকুর গলায় চেন লাগিয়ে ঝুলছিল, তার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা বললেন, "আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয়—বেড়াল দেখতে পেলেও নয় !"

মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল।

ব্রুনো বললে, "ভারি ভালো কুকুর। আমাদের কি অনেক দূর যেতে হবে, সিল্‌ভি। আমার ক্লান্ত লাগছে !"

সিল্‌ভি মিষ্টি করে বললে, "বেশি দূর নয়, সোনা ! ঐ যে গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কী একটা ঝকমক করছে ? আমার খুব মনে হচ্ছে, ওটাই পরীর দেশের সিংদরজা ! আমি জানি, দরজাটা সোনা দিয়ে তৈরি—বাবা বলেছিলেন—আর কী ঝকমকে ! কী ঝকমকে !" বার বার সে ঐ একই কথা বলতে লাগল, যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

ছোট্টো হাতে চোখ্ ঢেকে ব্রুনো বললে, "ঝলসে যাচ্ছে !" অন্য হাত দিয়ে সিল্‌ভির হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলে, মনে হল যেন সিল্‌ভির ঐরকম অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গি দেখে একটু ভয় পেয়ে গেছে।

কেননা, সত্যিই সিল্‌ভি হাঁটছে যেন ঘুমের ঘোরে, বড়ো-বড়ো দুচোখের দৃষ্টি অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, আর কোন অজানা গভীর আনন্দে ঘন ঘন নিশ্বাসে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। মনশ্চক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমার ঐ ছোট্টো মিষ্টি বন্ধুটির মধ্যে (ওকে তাই ভাবতেই ভালো লাগে আমার) বিরাট একটা বদল

হতে চলেছে—অচিন দেশের সাধারণ একজন আধা-পরী থেকে সে এখন খাঁটি পরীতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ব্রুনোর মধ্যে বদলটা এল আরো একটু পরে, তবে সেই সোনার সিংদরজার কাছে পৌঁছবার আগেই দুজনেরই বদলের পালা শেষ। আমি জানতাম দরজার ভেতরে ঢোকার সাধ্য আমার নেই। তাই দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দেখে নিলুম ওদের দুটিকে ; ছোট্টো মিষ্টি দুটি ছেলে-মেয়ে ভেতরে ঢুকে চোখের আড়াল হয়ে গেল, সশব্দে সোনার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শব্দ বলে শব্দ! আর্থার বললে, "এই আলমারির পাল্লাটা কিছুতেই অন্যগুলোর মতো সহজে বন্ধ হবে না, কব্জায় কিছু গোলমাল আছে। যাই হোক, এই নাও কেক, আর এই নাও শরবৎ। তোমার তন্দ্রা কাটান হয়ে গেছে, আর দেরি না-করে শুয়ে পড় গে, ভায়া! তোমার শরীরে আর কিছু এখন সইবে না। মনে রেখ, আমি হচ্ছি, ডাক্তার আর্থার ফরেস্টার, এম. ডি.।"

ততক্ষণে আমি পুরোপুরি জেগে গেছি। বললুম, "এখখুনি নয়! সত্যি বলছি, এখন আর ঢুলুনি আসছে না, এখনো তো বারোটা বাজে নি!"

শেষপর্যন্ত ঘুমতেই যেতে হল। পরের দিন সকালে আমার উকিলের কাছ থেকে চিঠি পেলুম যে, বিশেষ বৈষয়িক কাজে আমার লণ্ডন যাওয়া দরকার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরী-সিল্‌ভি

লণ্ডনে পুরো একটা মাস লেগে গেল। ডাক্তাররা নেহাৎ তাগাদা দিলেন, তাই কিছু কাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও আবার এল্‌ভেস্টনে ফিরে এলাম আর্থারের বাসায়।

সেদিন বিকেলে ভয়ানক গরম পড়ল—এত গরম যে, বেড়াতে বেরুন চলে না, কাজকর্মও করা চলে না—আর ঠিক এমনি গরম পড়ল বলেই ব্যাপারটা ঘটল, না হলে ঘটত না বলেই তো আমার মনে হয়।

প্রথমেই একটা কথা আমার জানা দরকার যে, পরীরাই-বা চিরকাল কেন আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবে, কেন খালি খালি ওরাই-বা আমাদের কর্তব্য করতে শেখাবে, কোনো খারাপ কাজ করলে ওরাই-বা কেন বরাবর আমাদের বড়ো-বড়ো কথা শোনাবে, আমরাই-বা কেন কক্ষখনো ওদের কিছুই শেখাব না? তুমি কি বলতে চাও যে, পরীরা কখনো হ্যাংলামি করে না, স্বার্থপরতা করে না, মেজাজ দেখায় না, ঠকায় না? একদম বাজে কথা, জেনে রাখ। বেশ, তা হলে, নিশ্চয়ই তুমি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত যে, একটু-আধটু বকুনি দিলে বা মাঝে-মাঝে শাস্তি-টাস্তি দিলে ওদের ভালো ছাড়া মন্দ হবে না।

পরীক্ষা করে দেখলেই তো হয়। কেন যে করা হয় না, তা বুঝি

না; আমি নিশ্চয় জানি যে, (দেখো, বনের মধ্যে চেঁচিয়ে এ-সব কথা বলো না যেন কখনো) একবার যদি কোনো পরীকে খপ্ করে ধরে ফেলে কোণ-ঠাসা করে ফেলে রেখে দু-একদিন রুটি আর জল ছাড়া আর কিচ্ছুটি না দেওয়া হয়, দেখবে সে অনেক শুধরে গেছে—আর কিছু না-হোক, ওর দেমাকটা একটু কমবে।

দ্বিতীয় কথা হল, পরীর দেখা পেতে হলে কোন সময়টা সবচেয়ে উপযুক্ত? আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমার জানা আছে, বলতেও পারি।

প্রথম নিয়ম হল, দিনটা খুব গরম হওয়া দরকার—এটা বিনা-তর্কে মেনে নিতে হবে—আর, তোমার সামান্য একটু ঘুমঘুম ভাব থাকা দরকার, তবে এমন ঘুম নয় যে, চোখ খোলা যাচ্ছে না বা বুদ্ধি-শুদ্ধি ভোঁতা মেরে গেছে। বেশ, এবার যেটা দরকার, সেটা হল, তোমার একটু—কী বলব, একটু জাদু-হয়ে-যাওয়া ভাব আসা দরকার, সাদা বাঙলায় বলা যেতে পারে, 'গা-ছম্‌ছম্' করা দরকার। বুঝতে পারলে তো? না পারলে উপায় নেই, এর চেয়ে ভালো করে বোঝান আমার সাধ্যে নেই; অপেক্ষা করে থাক, পরীর দেখা পেলে তখন ঠিক বুঝতে পারবে।

আর, সব শেষের নিয়মটি হল, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকলে চলবে না। ঠিক এক্ষুনি এই নিয়মটা বুঝিয়ে বলার ফুরসৎ হচ্ছে না—আপাতত বিশ্বাস করে নাও।

এই-সমস্ত কিছু যদি একসঙ্গে ঘটে, তবেই বুঝবে যে, পরী দেখতে পাবার চমৎকার মওকা এসেছে—অন্তত এ-সব না ঘটলে যা হত, তার চেয়ে ভালো মওকা।

যে-পরীর কথা তোমাদের শোনাব, সে একেবারে সত্যিকারের পরী—ছোট্টো আর দুষ্টু। আসলে দুটো পরী ছিল, একটা দুষ্টু, আর একটা ভালো; তোমরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে কে কোনটা।

এবার কিন্তু সত্যিসত্যিই গল্পটা শুরু করছি।

সেদিন। মঙ্গলবারের বিকেলবেলা, বেলা সাড়ে তিনটে হবে—তারিখ-টারিখের ব্যাপারে ভুলচুক থাকা ঠিক নয়—আমি বিলের ধারের জঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি; হাতে কোনো কাজ নেই, তা ছাড়া জায়গাটাও বেশ, আর, (প্রথমেই বলে রেখেছি) যা দারুণ গরম,

গাছের ছায়া ছাড়া আরামই-বা পাব কোথায়—এই-সমস্ত কারণে জঙ্গলের ছায়ায় ঘুরতে বেরিয়েছি।

গাছপালার মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে অলসভাবে হেঁটে চলেছি, প্রথমেই হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা বড়ো-সড়ো গোছের গুব্‌রে পোকা চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে খুব হাঁচড়-পাঁচড় করছে। আমি তক্ষুনি একহাঁটু পেতে বসে পড়ে পোকাটাকে আবার সোজা করে দিতে গেলুম। কয়েকটা ব্যাপারে আমি দেখেছি, পোকাদের কী ভালো লাগে তা বোঝা মুস্কিল ; যেমন ধর, আমি যদি আলোর পোকা হতুম, তা হলে কি আমায় মোমবাতির আলোর কাছ থেকে সরিয়ে রাখা উচিত, না সোজা গিয়ে আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরতে দেওয়া উচিত হবে—কিছুতেই ঠিক করতে পারি না। কিম্বা ধর, আমি যদি মাকড়সা হতুম, তা হলে আমার জাল ছিঁড়ে খুঁড়ে গিয়ে যদি পোকারা ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যেত, আমি কি খুশি হতুম? কাজেই পোকারা কী চায়, তা বোঝা ভারি মুস্কিল! তবে, যদ্দূর মনে হল, আমি যদি গুব্‌রে পোকা হতুম, আর চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়ে থাকতুম, তা হলে আবার সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে কারও সাহায্য পেলে যে খুশি হতুম, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

কাজেই, যা বলছিলুম, একহাঁটু গেড়ে বসে পোকাটাকে সোজা করে দেব বলে একটা ছোটো কাঠির দিকে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময়ে চোখে পড়ল—যা দেখলুম, তাতে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিয়ে নিশ্বাস চেপে চুপচাপ বসে থাকতে হল, পাছে কোনো শব্দ করে ফেলি, আর সেই ক্ষুদে প্রাণীটি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

যাকে দেখে হাত গোটালুম, সেই ছোট্টো খুকিটিকে দেখে সহজে ভয় পাবার পাত্রী বলে মনে হয় না অবশ্য ; এত ভালোমানুষ আর শান্তশিল্ট দেখতে যে, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে এমন চিন্তাও, মনে হয়, তার মাথায় আসে না। মাথায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঁচু, গায়ের পোশাক সবুজ রঙের, লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে নজরেই পড়বে না ; আর সে এমন টুস্‌টুসে আর ফুট্‌ফুটে যে, মনে হয় ওখানে ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না, সেও যেন ওখানকার আরো পাঁচটা ফুলেরই মতো। তা ছাড়া আরো বলি, ওর ডানা-ফানা কিচ্ছু নেই (ডানাওলা পরী আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না,) মাথায় এক-ঢাল

বাদামি চুলের রাশ, বড়ো-বড়ো আগ্রহভরা দুটি বাদামি রঙের চোখ— ওর বর্ণনা দেবার মতো আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

সিল্‌ভি (আরো পরে নামটা জেনেছিলুম) আমারই মতো হাঁটু-গেড়ে বসেছে গুব্‌রে পোকাটাকে উদ্ধার করবার জন্যে ; তবে পোকাটাকে পায়ের ওপর খাড়া করতে হলে ছোট্টো কাঠি দিয়ে কাজ সারা ওর পক্ষে তো সম্ভব নয়। কাজেই বেচারি দুহাত দিয়ে ঠ্যালা মেরে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সেই ভারী পোকাটাকে উল্টে সোজা করে দিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে আধা ধমক আর আধা সান্ত্বনার সুরে পোকাটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল—বাচ্চারা পড়ে গেলে নার্সরা যেমন করে আর-কি !

"হয়েছে, হয়েছে ! অত কাঁদবার কিছু হয় নি ; মরে তো যাও নি এখনো—অবশ্য মরে গেলে আর কাঁদা যেত না, জানই তো ; কাজেই বুঝতে পারছ, কাঁদা-টাঁদা একদম বারণ, চাঁদ আমার ! এমন হোঁচটই-বা খেলে কী করে ? অবশ্য বুঝতেই পারছি কী করে এমনটা হল—জিগেস করবার দরকার নেই—অব্যেসমতো নিশ্চয়ই থুতনি তুলে খানা-খন্দ-ভরা বালির ওপর হাঁটছিলে। উঁচু-নিচু বালির ওপর দিয়ে ওরকম আকাশপানে মাথা তুলে হাঁটলে হোঁচট তো খাবেই, জানা কথা ; দেখে চলতে হয় !"

পোকাটা বিড়্‌বিড়্‌ করে যা বলল, তাতে মনে হল বলছে, "দেখেছিলুম তো।" সিল্‌ভি বলতে লাগল :

"জানি দেখে চল নি ! দেখে চলা তো তোমার কুষ্ঠিতে নেই ! সব সময়ে থুতনি উঁচিয়ে চলা—এত দেমাক তোমার। দেখি, এবার কটা ঠ্যাং ভাঙল। তাই তো, একটাও ভাঙে নি দেখছি ! তবে, তোমার কপালে দু-একটা ঠ্যাং ভাঙা উচিত ছিল। হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গেলে শূন্যে ছোঁড়াছুঁড়ি করা ছাড়া যদি আর কিছুই কাজে না লাগে, তা হলে ছ-ছটা ঠ্যাং নিয়ে লাভটা কী বাছা ? হাঁটবার জন্যেই পা, বুঝলে ? থাক, মেজাজ খারাপ করতে হবে না, ডানা ফট্‌ফট্‌ করারও দরকার নেই ; আমার বলা এখনো শেষ হয় নি। ঐ ব্যাটারকাপ গাছের পেছনে যে সোনা ব্যাঙ থাকে, তার কাছে যাও দিকিনি—তাকে আমার নমস্কার দেবে—সিল্‌ভির নমস্কার দেবে—'নমস্কার' বলতে পার তো ?"

পোকাটা উচ্চারণ করলে, মনে হল, ঠিকই বললে।

"হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। গিয়ে বলবে, কালকে আমি ওর কাছে যে মলমটা রেখে এসেছি, সেই মলম খানিকটা যেন তোমায় দেয়। ওকে দিয়ে মালিশ করিয়ে নিতে পারলে ভালোই হয়; ওর হাতটা বড়ো কড়া, তবে সে ভাবতে গেলে তো চলবে না!"

শুনে গুব্‌রে পোকাটা বোধ হয় শিউরে উঠে থাকবে, কারণ সিল্‌ভির গলাটা এবার একটু গম্ভীর শোনাল: "এমন একটা ভাব দেখাচ্ছ, যেন ব্যাঙের হাত গায়ে লাগলে তোমার অঙ্গের মহিমা রসাতলে যাবে, ও-সব ঢং ছাড়! সত্যি কথা বলতে কি, ও মালিশ করতে রাজি হলে, তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এর পর গোদা কোলাব্যাঙ ছাড়া যদি আর কাউকে মালিশ করবার জন্যে পাওয়া না যায়, তখন কেমন লাগবে শুনি?"

খানিকক্ষণ কোনো সাড়া শব্দ নেই, তার পর আবার সিল্‌ভির কথা শোনা গেল: "এবার যেতে পার। ভালো পোকা হয়ে থাক, আর থুতনি উঁচিয়ে থেকো না।" তার পর সিল্‌ভি সেই-সব কায়দা-টায়দা শুরু করে দিলে—গুন্‌গুন্ আওয়াজ তুলে বোঁ বোঁ করে এদিক-ওদিক ছিটকে ছিটকে উড়ে বেড়াতে লাগল, উড়ে কোথাও চলে যাবার ঠিক আগেই ডানাওলা পোকারা যেমন ঘুরপাক খায়। তার পর শেষকালে এলোমেলোভাবে এঁকেবেঁকে এদিক-ওদিক করবার মাথায় সাঁ করে একবার আমার মুখের ওপর উড়ে এসে পড়ল, আর আমি আচমকা ভাবটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই, ক্ষুদে পরী চোখের আড়ালে চলে গেছে।

বাচ্চা খুকি-পরীর খোঁজে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলুম, কোনো চিহ্ন নেই—টের পেলুম আমার সেই 'ছম্‌ছমানি' ভাবটাও চলে গেছে, ঝিঁঝিঁ পোকারাও সব মহানন্দে ডাকতে শুরু করেছে আবার—কাজেই বুঝলম, সে সত্যিই আর এ তল্লাটে নেই।

এইবার ঝিঁঝিঁ পোকার নিয়মটা নিয়ে তোমাদের বলবার ফুরসৎ পাওয়া গেল। কাছাকাছি পরীদের আনাগোনা হলেই ঝিঁঝিঁরা আর শব্দ করে না—কারণ, আমার মনে হয়, পরীরা ওদের রানী-টানি কিছু একটা হবে—আর কিছু না-হোক, ঝিঁঝিঁদের চেয়ে পরীরা অনেক চমৎকার তো বটেই—কাজেই, যদি কখনো বাড়ির বাইরে যাও, চলতে

চলতে যদি টের পাও যে, ঝিঁঝিঁরা ডাক থামিয়ে ফেলেছে, তা হলেই বুঝবে যে, হয় তারা কোনো পরীকে দেখতে পেয়েছে, নাহয় তুমি খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় তারা ভয় পেয়ে গেছে।

বুঝতেই পারছ, খুব মন-খারাপ করে আমি চলতে লাগলুম। এই ভেবে অবশ্য মনকে বোঝালুম, 'আজ বিকেলটা তো এখনো পর্যন্ত বেশ ভালোই কাটল—নিঃসাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সজাগ চোখে চারিদিকে খোঁজ করতে করতে কোথাও আর-একটা পরীর দেখা পাওয়াও তো বিচিত্র নয়।'

এইভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে একটা গোল-গোল পাতাওলা গাছের দিকে আমার নজর পড়ল, অনেক পাতার মাঝখানে ছোটো-ছোটো গর্ত কাটা। কিছু না ভেবেচিন্তেই বলে উঠলুম, "ঠিক ধরেছি! পাতা কাটা মৌমাছির কাজ!" জান তো প্রকৃতি বিজ্ঞানে আমি খুব পণ্ডিত (যেমন ধর, একবার তাকিয়েই আমি বুঝতে পারি, কোনটা বেড়াল ছানা, আর কোনটা মুরগী বাচ্চা)। এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা কথা মনে আসতেই হেঁট হয়ে খুব ভালো করে পাতাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

আনন্দে শিউরে উঠলুম—লক্ষ্য করলুম, ফুটোগুলো সব অক্ষরের মতো করে সাজান। পাশাপাশি তিনটে পাতাতে ফুটো দিয়ে দিয়ে লেখা রয়েছে 'বি', 'আর', আর 'ইউ'; একটু খোঁজাখুঁজি করতেই আরো দুটো পাতা চোখে পড়ল, তাতে রয়েছে 'এন' আর 'ও'।

সঙ্গে সঙ্গে, এল্‌ভেস্টনে আসার সময়ে গাড়িতে স্বপ্নের ঘোরে যে-সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা দেখেছিলাম—আমার জীবনের প্রায়-ভুলে-যাওয়া সেই-সব দিনগুলো যেন হঠাৎ আলোর ঝলক লেগে আবার প্রকট হয়ে উঠল; ভাবতে ভালো লাগল যে, 'আমার জেগে থাকা বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোথাও তার একটা যোগ আছে!'

এদিকে টের পেলুম, সেই 'ছম্‌ছমানিটা' আবার ফিরে এসেছে, হঠাৎ খেয়াল হল ঝিঁঝিঁ পোকারাও আর ডাকছে না। বেশ বুঝলুম যে, 'বি', 'আর', 'ইউ', 'এন', আর 'ও', মানে 'ব্রুনো' কাছেই কোথাও আছে।

সত্যিই তাই, এত কাছে ছিল যে দেখতে না পেয়ে তার ঘাড়েই পা ফেলতে যাচ্ছিলুম আর একটু হলেই। পরীদের মাড়িয়ে দেওয়া যায়,

এটা মেনে নিলে বলতে হয়, সত্যি যদি তার ঘাড়ে পা ফেলতুম, তা হলে কী ভয়ংকর কাণ্ডটাই না ঘটত—আমার নিজের ধারণা অবশ্য অন্যরকম, পরীরা আলেয়ার মতো ব্যাপার, কাজেই মাড়ানোর কোনো কথাই ওঠে না।

তোমার জানা-শোনা কোনো ছোট্টো ছেলের কথা মনে কর—বেশ নাদুসনুদুস, গালে লালচে আভা, বড়ো-বড়ো কালো-কালো চোখ, একমাথা এলোমেলো বাদামি চুলের রাশ—এবারে কল্পনা করে নাও যে, তার আকার এত ছোট্টো যে, কফি খাবার কাপের মধ্যে অনায়াসেই এঁটে যায়, তা হলেই দিব্যি ধারণা করতে পারবে, সেই পুঁচকেটিকে কী রকম দেখতে।

যতটা পারা যায় নরম মিষ্টি গলায় বললুম, "তোমার নামটি কী, ক্ষুদেবাবু ?" হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে, এই আর-একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় আসে না—ছোটোদের বেলায় সব সময় নাম জিগেস করে কথাবার্তা শুরু করা হয় কেন ? এইজন্যে কি, যে এমনিতে ও আর কতটুকুই-বা, নাম-টাম থাকলে তবু খানিকটা মাপে বাড়বে ? কোনো বয়স্ক মানুষকে প্রথমেই তার নাম জিগেস করার কথা কখনো মনে এসেছে তোমার ? বল-না, এসেছে ? আসল কারণ যাই হোক, এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল যে, ওর নামটা জানা দরকার ; তাই যখন দেখলুম ও কোনো জবাব দিলে না, তখন আবার একটু জোরে জিগেস করলুম, "ক্ষুদেবাবু, কী নাম তোমার ?"

মাথা না তুলেই সে বললে, "তোমার নামটা কী ?"

আমি বেশ শান্ত স্বরে বললুম, "আমার নাম লুইস ক্যারল।" খুব ছোটো তো, অমন অভদ্রের মতো জবাব দিলেও, রাগ করা যায় না।

একবার চট্ করে আমার দিকে চোখ বুলিয়ে আবার নিজের কাজে নিবিষ্ট হয়ে ফের শুধোলে "কোনো জায়গার ডিউক নাকি ?"

"ডিউক-ফিউক কিচ্ছু না," স্বীকার করতে গিয়ে একটু লজ্জাই পেলুম।

ক্ষুদে বললে, "তুমি যেরকম বড়ো, দুটো ডিউক হতে পারতে। তা হলে 'সার' অমুক-তমুক কিছু একটা হবে বোধ হয় ?"

"না, কোনো খেতাব-টেতাব নেই," আরো বেশি করে লজ্জা হতে লাগল আমার।

খোকা পরী বোধ হয় ভাবল, তা হলে এর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, তাই একমনে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ফুলসুদ্ধ গাছ উপড়ে উপড়ে ফুলগুলোকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

কয়েক মিনিট বাদে আবার একবার চেষ্টা করে দেখলুম, "তোমার নামটা দয়া করে বলই-না গো!"

ক্ষুদে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "বুনো—আগের বার 'দয়া করে' বল নি কেন?"

বহু বছর আগে (প্রায় দেড়শো বছর হবে) যখন নিজে ছোটো ছিলুম, তখনকার কথা মনে পড়ে গেল, আপন মনে ভাবলুম, 'নার্সারিতে পড়বার সময়ে এই-সব ধরনের সহবৎ শেখান হত বটে।' ভাবতেই একটা কথা আমার মাথায় এসে গেল, জিগেস করলুম, "আচ্ছা, যে-সব পরী ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের ভালো হতে শেখায়, তুমি কি সেই ধরনের পরী?"

ব্রুনো বললে, "তা, আমাদের মাঝে মাঝে ও-কাজ করতে হয় বটে, তবে ভারি বেয়াড়া কাজ। বলতে বলতে একটা প্যানজি ফুলকে দু টুকরো কোরে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে দলতে লাগল।

আমি বললুম, "এ-সব কী করছ ব্রুনো?"

"সিল্‌ভির বাগানটা 'নট্ট' কোরে দিচ্ছি।" প্রথমে ব্রুনো এ ছাড়া আর কিছু বললে না; তবে ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আপন মনে বিড়্‌বিড়্ করে বকে যেতে লাগল, "বদ্‌খৎ তিলিক্ষি মেজাজের মেয়ে—আজ সকালে খেলতে এত ইচ্ছে কচ্ছিল, তবু কিছুতেই খেলতে দিলে না—বললে, আগে পড়া শেষ করতে হবে—হুঁঃ, পড়া করতে হবে বৈকি! —দেখাচ্ছি মজা, এমন উস্তন-খুস্তন করে ছাব্ব না!"

আমি চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "ছি, ব্রুনো, এমন করা উচিত নয়। বুঝতে পারছ না, এ তো প্রতিহিংসা; আর প্রতিহিংসা বড়ো খারাপ কাজ, নিষ্ঠুরতার কাজ, বিপজ্জনক কাজ!'

"পাতিহাঁসা?" ব্রুনো বললে, "ভারি মজার কথা তো! তুমি খারাপ কাজ বললে কেন, বুঝতে পেরেছি। পাতিহাঁস যেখানে থাকে, সেখানে তো জল; বেশি দূর গেলে হোঁচট খেয়ে জলে পড়ে গিয়ে ডুবে যেতে পার তো, তাই।"

আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, "না না, পাতিহাঁসা নয়, 'প্রতিহিংসা' ।" (বেশ গুছিয়ে গোটা-গোটা করে উচ্চারণ করলুম) ।

চোখ দুটো খুব বড়ো-বড়ো করে ব্রুনো শুধু বললে, "ও !" কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলে না ।

আমি বেশ খুশি-মাখান গলায় বললুম, "এসো, ব্রুনো, কথাটা উচ্চারণ কর, 'প্রতিহিংসা,' 'প্রতি-হিংসা' ।"

ব্রুনো মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, পারবে না ; বললে, তার হাঁ-মুখের গড়নটা না কি ঐ ধরনের কথা উচ্চারণ করবার ঠিক উপযুক্ত নয় । শুনে আমি যতই হাসতে থাকি একরত্তি ব্রুনোর মুখটা ততই তেলো-হাঁড়ি হয়ে উঠতে থাকে ।

বললুম, "যাকগে, ও-সব ছাড়ান দাও, ক্ষুদেবাবু ! তোমার তো অনেক কাজ রয়েছে, হাত লাগাব না-কি ?"

ব্রুনো তখন ঠাণ্ডা হয়েছে, বললে, "দয়া করে যদি কর, তো ভালোই হয় । ওকে আরো বেশি করে খেপাবার মতো কোনো মতলব মাথায় এলে বড়ো ভালো হত । তুমি তো জান না, ওকে রাগান কত শক্ত ! কক্ষনো কুদ্ধ হয় না !

"শোন, ব্রুনো, প্রতিশোধ নেবার একটা চমৎকার উপায় আমি বাতলাতে পারি তোমায়, আমার কথা শোন ।"

দু চোখে আলো জ্বালিয়ে ব্রুনো প্রশ্ন করলে, "তাতে ও খুব ভালো মতন করে জ্বালাতন হবে ?"

"খুব ভালো করে জ্বালাতন হবে । প্রথমে ওর বাগানের সব আগাছা আমরা উপড়ে তুলে ফেলব । দেখছ তো এদিকটায় কত আগাছা, ফুলগুলো সব চাপা পড়ে গেছে ।"

ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়ে ব্রুনো বললে, "কিন্তু, তাতে তো ও জ্বালাতন হবে না !"

ওর মন্তব্যে কান না দিয়ে আমি বলে চললুম, "তার পর আমরা সবচেয়ে উঁচু এই ফুলের কেয়ারিতে জল দেব । দেখছ তো, এখানকার মাটি কত শুকনো, ধুলো উড়ছে ।"

ব্রুনো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে, কিন্তু এবার আর কোনো মন্তব্য করলে না ।

আমি বলে চললুম, "জল দেবার পর বাগানের রাস্তাগুলো ঝাঁট-

দেওয়া দরকার ; তার পর ঐ লম্বা কাঁটাঝোপটা কেটে ফেলা যেতে পারে—এত বাগান ঘেঁষে রয়েছে ওটা যে—"

ব্রুনো আর ধৈর্য রাখতে না-পেরে বলে উঠল, "কী সব বলছ ? এ-সবে ও মোটেই জ্বালাতন হবে না।"

আমি গোবেচারার মতো বললুম, "হবে না বুঝি ? আচ্ছা, ধর, তার পর যদি আমরা এই রঙিন নুড়িগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখি—মানে, রকম-রকম ফুলের কেয়ারিগুলোকে ভাগ-ভাগ করবার জন্যে আর কি ! খুব চমৎকার দেখাবে তাতে।"

ব্রুনো ঘাড় ফিরিয়ে আবার একবার আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগল, শেষ কালে তার চোখে কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের ঝিলিক খেলে গেল, তার পর সম্পূর্ণ একটা নতুন ধরনের গলায় বললে, "ভালো কথা, সারি দিয়ে সাজাই এস—লাল নুড়িগুলো এক সারিতে, অন্য সারিতে সব নীল।"

আমি বললুম, "মারাত্মক হবে। তার পর—আচ্ছা, বাগানের কোন ফুল সিল্‌ভি সবচেয়ে পছন্দ করে বল তো ?"

বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে পুরে ব্রুনো ভাবতে বসল, খানিক ভেবে নিয়ে শেষকালে জবাব দিলে, "ভায়োলেট।"

"বিলের ধারে এক জায়গায় একসঙ্গে অনেক ভায়োলেট ফুলের গাছ রয়েছে—"

শূন্যে একটা লাফ দিয়ে ব্রুনো চীৎকার করে উঠল, "চল-না নিয়ে আসি ! এই নাও, আমার হাত ধর, তোমার হাঁটতে সুবিধে হবে। ওদিককার ঘাসগুলো বড্ডো লম্বা-লম্বা।"

কী রকম বড়ো-সড়ো মাপের মানুষের সঙ্গে যে কথা বলছে ব্রুনো, তা খেয়ালই নেই দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না। বললুম, "না, না, ব্রুনো, এক্ষুনি নয়, প্রথমে ভেবে ঠিক করতে হবে, আগে কোন কাজটা করা দরকার। বুঝতে পারছ তো, আমাদের এখন অনেক কাজ।"

একটা মরা ইঁদুরের ওপর বসে পড়ে মুখের মধ্যে আবার বুড়ো আঙুল পুরে দিয়ে ব্রুনো বললে, "হ্যাঁ, তাই ভেবে দেখা যাক।"

আমি বললুম, "মরা ইঁদুরটাকে রেখেছ কেন ? মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার বা বিলের জলে ফেলা দেওয়া উচিত।"

ব্রুনো বললে, "জান না, ওটা দিয়ে মাপ নিতে হয়! মাপ নেবার জিনিস না থাকলে বাগান করবে কী করে? সব কটা ফুলের কেয়ারি আমরা লম্বায় সাড়ে তিন ইঁদুর আর চওড়ায় দু ইঁদুর মাপে তৈরি করি।"

ব্রুনো ইঁদুরটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে আমায় দেখাতে যাচ্ছিল কী ভাবে ইঁদুর দিয়ে মাপ নিতে হয়, আমি তাকে নিরস্ত করলুম, কারণ আমার ভয় হল, বাগানের কাজ সারা হবার আগেই পাছে আমার সেই 'ছম্‌ছমে' ভাবটা কেটে যায়, আর তা হলেই ব্রুনো বা সিল্‌ভির দেখা পাওয়ার দফা রফা। বললুম, "আমার মতে, তুমি ফুলগাছের কেয়ারি থেকে আগাছা সাফ করবার ভার নাও, আর আমি নুড়ি বাছাই করি, সেইটাই সবচেয়ে ভালো হবে।"

ব্রুনো বললে, "ঠিক বলেছ! কাজ করতে করতে আমি তোমায় শোঁয়াপোকার কথা শোনাব।"

নুড়িগুলো সব এক জায়গায় জড়ো করে নিয়ে রঙ অনুযায়ী ভাগ করতে করতে বললুম, "বেশ, বেশ, শোঁয়াপোকার ব্যাপারটা শোনা যাক।"

ব্রুনো তখন নিচু গলায় গড়্‌গড়্‌ করে বলতে লাগল—যেন নিজের মনে বলছে, "বনের মধ্যে ঢোকবার মুখেই যে ছোট্টো নদীটা পড়ে, কাল সেই নদীর ধারে যখন বসেছিলুম, তখন দুটো শোঁয়াপোকা চোখে পড়ল। বেশ সবুজ রঙ, হলদে চোখ, আমাকে কিন্তু দেখতে পায় নি। তার মধ্যে একজন আবার মথ্‌-এর একটা ডানা বয়ে নিয়ে চলেছে; বিরাট বাদামি মথ্‌-এর ডানা, বুঝলে, খুব শুকনো, পালকে ভরা। কাজেই আমার তো মনে হয়, ওটা খাবার ইচ্ছে ওর নিশ্চয়ই হবে না—তবে কি শীতকালের জন্যে জোব্বা বানাবার মতলবে নিয়ে যাচ্ছে?"

বললুম, "তাই হবে বোধ হয়।" কারণ ব্রুনো শেষ কথাটা প্রশ্নের ঢঙে উচ্চারণ করে উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে।

ঐ কথাতেই কাজ হল, ক্ষুদেবাবু খুশিভরা গলায় আবার বলতে শুরু করলে, "তা, কাজেই মথ্‌-এর ডানাটা অন্য শোঁয়াপোকার চোখে পড়ুক এটা সে চায় না, কাজেই লুকিয়ে নিয়ে যাবে বলে কেবল বাঁদিকের সারির পা দিয়ে বেচারিকে ডানাটা বইতে হল, আর খালি ডান দিকের সারির পা দিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করলে, এ ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য তার পরেই হোঁচট খেয়ে পড়েও গেল।"
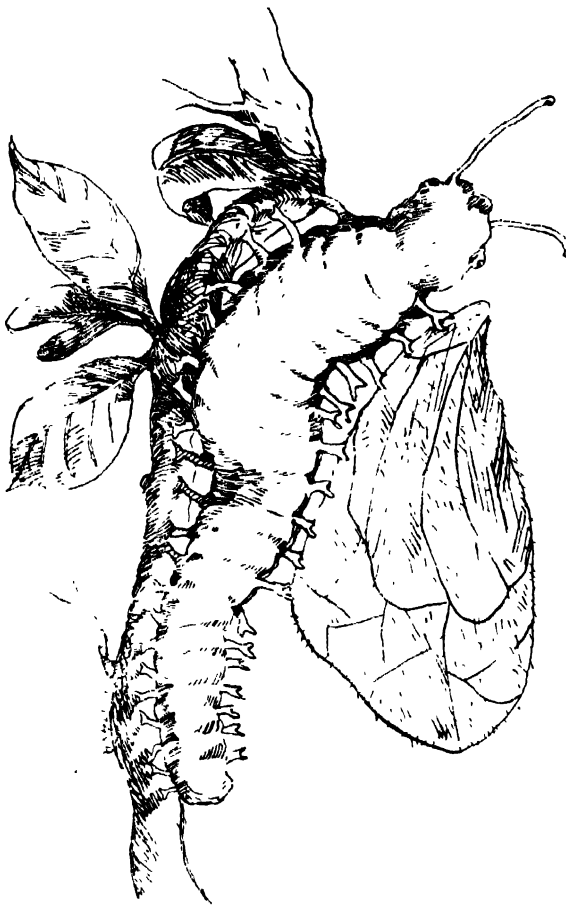
আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম না, তাই শেষের দিকের কয়েকটা কথার সূত্র ধরে বললুম, "কার পর ?"

আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে ব্রুনো খুব গম্ভীর হয়ে আবার বলে চলল, "হোঁচট খেলে ; শোঁয়াপোকা হোঁচট খেলে কী হয় যদি কখনো দেখা থাকত, তা হলে বুঝতে যে, সে কী গুরুতর ব্যাপার, এমন বসে বসে মুচকি মুচকি হাসতে না—আর, তা ছাড়া, আমি আর বলবও না।"

"তা তো বটেই ব্রুনো, তা তো বটেই, খুব গুরুতর ব্যাপার, আর আমি মোটেই হাসতে চাই নি, দেখ-না, আবার কেমন গম্ভীর হয়ে গেছি।"

কিন্তু ব্রুনো হাতে হাত জড়িয়ে বুকের ওপর রেখে বললে, "ও কথা আর আমায় শোনাতে এস না ; তোমার একটা চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল দেখতে পেলুম—ঠিক চাঁদের মতো।"

জিগেস করলুম, "হ্যাঁ ব্রুনো, আমি কি চাঁদের মতো ?"

আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চিন্তা করে ব্রুনো বললে, "তোমার মুখটা চাঁদের মতোই বড়ো আর গোল। অত জ্বলজ্বলে নয়, তবে আরো পরিষ্কার।"

না হেসে পারলুম না, "জান, ব্রুনো, আমি রোজ মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করি, চাঁদ কক্ষনো মুখ সাফ করে না।"

ব্রুনো বললে, "ও, করে না বুঝি !" তার পর সামনে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "পত্তেক রাত্তিরে দেখবে চাঁদের মুখটা ক্রমশই আরো নোংরা হয়ে যাচ্ছে, শেষ অবধি সবটা একেবারে কুচকুচে অন্ধকারের মতো কালো হয়ে যায়। তার পর, যখন সমস্ত মুখটা নোংরা হয়ে যায়, তখন—" বলতে বলতে ব্রুনো নিজের গোলাপি গালে হাত বুলিয়ে নিলে—"তখন, সে মুখটা ধুয়ে নেয়।"

"আর, তখন আবার পরিষ্কার দেখায়, তাই-না ?"

ব্রুনো বললে, "সবটা একসঙ্গে হয় না। কত আর শেখাই তোমায় ! একটু একটু করে ধোয়—তবে শুরু করে অন্য ধার থেকে।"

এতক্ষণ সে বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে সেই মরা ইঁদুরটার ওপর চুপচাপ বসে ছিল, আগাছা তোলার কাজে হাতই পড়ে নি মোটে ; তাই, না-বলে থাকা গেল না, "আগে কাজ, তার পর—আমোদ।"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ব্রুনোর প্রতিশোধ

এর পর আমরা কয়েক মিনিট চুপ করে রইলুম, আমি নুড়ি বাছাই করতে করতে ব্রুনোর বাগান করার রকম-সকম দেখতে লাগলুম আর আমার খুব মজা লাগতে লাগল। তার বাগান করার ধরনটা ভারি নতুন : আগাছা তোলবার আগে প্রত্যেকটা কেয়ারি সে মেপে মেপে দেখে নিচ্ছে, যেন আগাছা তোলবার পর কেয়ারিটা গুটিয়ে ছোটো হয়ে যাবার ভয় আছে বলে তার মনে হয়; একবার যখন মাপ নিতে গিয়ে দেখলে, তার মনের মতো হল না, লম্বায় একটু বড়ো হয়ে গেল, তখন ছোটো-ছোটো ঘুষি পাকিয়ে ইঁদুরটাকে দুমদুম করে কিলোতে লেগে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে লাগল, "হল তো! আবার সব ভুল হয়ে গেল! যখন বলি, তখন ল্যাজটা সোজা রাখতে পার না!"

কাজের ফাঁকে ব্রুনো হঠাৎ আধা ফিস্‌ফিসে গলায় আমায় বললে, "কী করব জান, রাজার ভোজসভায় তোমায় নেমন্তন্ন পাইয়ে দেব। ওখানকার একজন পধান খিদ্‌মদ্‌গারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে।"

শুনে আমি না হেসে পারলাম না। জিগেস করলাম, "খিদ্‌মদ্‌গাররাই অতিথি সজ্জনকে নেমন্তন্ন করে নাকি?"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "পাতে বসবার জন্যে নয়! পরি-বেশনের কাজে হাত লাগাবার জন্যে, বুঝলে তো। ভালোই তো লাগবে, লাগবে না? বেশ থালা সাজিয়ে দেওয়া-টেওয়া, এই-সব?

"তা বলে টেবিলে বসে খাওয়ার মতো ভালো কি?"

আমার জ্ঞানের দৌড় দেখে খানিকটা কৃপার সুরেই যেন ব্রুনো বললে, "তা তো নয়ই, কিন্তু তুমি যখন কোনো সার অমুক বা সার তমুকও নয়, তখন তোমায় টেবিলে খেতে বসতে দেওয়া যায় কী করে বল, বুঝলে না?"

যথাসম্ভব নম্রভাবে বললুম যে, "আমি তা আশাও করি না, তবে টেবিলে বসে খাবার সুযোগ না পেলে নেমন্তন্ন গিয়ে একদম আনন্দ হয় না আমার। ব্রুনো তাতে মাথা নেড়ে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে যে, আমার যা খুশি, আমি তাই করতে পারি—তবে, তার জানা শোনা এমন অঢেল লোক আছে, ভোজসভায় যেতে পারলে কান কেটে দিতেও যাদের আপত্তি হবে না।

"তুমি নিজে কখনো গেছ, ব্রুনো?"

ব্রুনো খুব গম্ভীরভাবে বললে, "গত সপ্তাহে একবার নেমন্তন্ন করে-ছিল, স্যুপের প্লেট ধোবার জন্যে—না, না, চীজ-এর প্লেট ধোবার জন্যে—তাতেই কী কম মজা! আর, একবারমাত্র একটু ভুল করেছিলুম।"

বললুম, "বলতে আপত্তি আছে?"

ব্রুনো বললে, "মাংস কাটবার জন্যে ছুরির বদলে কাঁচি এনে দিচ্ছিলুম। তবে, সবচেয়ে ভালো হয়েছিল—রাজার জন্যে আপেলের রস এনে দিচ্ছিলুম।"

ঠোঁট কামড়ে হাসি চেপে বললুম, "সত্যিই চমৎকার!"

ব্রুনো সাগ্রহে বললে, "তাই-না? অমন খাতির যার তার কপালে জোটে না, জান!"

এই কথায় আমার মাথায় ভাবনা শুরু হয়ে গেল, এই পৃথিবীতে আমরা কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসকেই না 'খাতির' বলে মনে করি, অথচ রাজাকে এক গেলাস ফলের রস এনে দিয়ে যে খাতির পেয়েছে বলে ক্ষুদে ব্রুনো এত সুখী, সে-সমস্তর মধ্যে তার চেয়ে এক কানাকড়িও বেশি খাতিরের ব্যাপার থাকে না। (ভালো কথা, দুষ্টু হলেও, ব্রুনোকে একটু একটু ভালো লাগতে শুরু হয়েছে তো তোমাদের?)

এই চিন্তায় কতক্ষণ যে মশগুল থাকতুম জানি না, হঠাৎ ব্রুনোর কথায় চমক ভাঙল, "আরে, শিগ্‌গির এদিকে এস-না।" ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ব্রুনো বললে, "ওর ওদিকের শিঙটা পাকড়ে ধর! আর এক মিনিটও ধরে রাখতে পারব না যে!"

একটা বিরাট শামুকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ব্রুনো, একটা শিঙ পাকড়ে ধরেছে, আর শামুকটাকে একটা ঘাসের ডগার ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে আনতে গিয়ে বেচারার পিঠটা ভেঙে যাবার দাখিল হয়েছে।

আমি দেখলুম এই-সব কাণ্ড-কারখানা চলতে দিলে বাগান করার দফা গয়া, তাই চুপচাপ শামুকটাকে একটা উঁচু পাড়ের ওপর বসিয়ে দিলুম, যাতে ব্রুনোর নাগালের বাইরে থাকে। বললুম, "যদি সত্যিই

ওটাকে ধরবার শখ থাকে, ব্রুনো, তা হলে পরে ওর ব্যবস্থা করা যাবে। তবে, শামুক নাহয় পেলে, তাতে লাভটা কী?"

ব্রুনো বললে, "খ্যাঁকশিয়াল পেয়েই-বা তোমাদের কী লাভ হয়? আমি জানি, তোমরা, 'পকাণ্ডরা' খ্যাঁকশিয়াল শিকার কর।"

'প্রকাণ্ডরা' কেনই-বা খ্যাঁকশিয়াল শিকার করবে, আর ব্রুনো কেন শামুক শিকার করবে না, তার একটা সঙ্গত কারণ ভাবতে লাগলুম, কিন্তু একটাও মাথায় এল না; কাজেই শেষ অবধি বললুম, "হুঁ, দেখছি দুটোই সমান। একদিন আমি নিজেই শামুক শিকারে বেড়িয়ে পড়ব।"

ব্রুনো বললে, "আমার মনে হয়, একদম একা একা শামুক-শিকারে যাবার মতো বোকামি তুমি করবে না। অন্য শিঙটা পাকড়াবার জন্যে আর-একজন কেউ সঙ্গে না থাকলে শামুককে বাগাতেই তো পারবে না!"

বেশ গম্ভীর হয়েই বললুম, "একা-একা যাব না তো বটেই। হ্যাঁ, ভালো কথা, শিকারের পক্ষে ঐ ধরনের শামুকই সবচেয়ে ভালো, না, তোমার মতে খোলা ছাড়া শামুকই বেশি সুবিধের?"

কথাটা ভেবেই ব্রুনো শিউরে উঠল, বললে, "ও বাবা, না, না, খোলা ছাড়া শামুক আমরা কক্ষনো শিকার করি না। ওতে ওরা ভয়ানক চটে যায়; তা ছাড়া হোঁচট খেয়ে ওদের গায়ের ওপর গিয়ে পড়লে ভীষণ চটচটে লাগে!"

এতক্ষণে আমাদের বাগানের কাজ প্রায় শেষ। আমি কয়েকটা ভায়োলেট গাছ এনেছিলাম, শেষ গাছটা লাগাবার সময়ে ব্রুনো আমায় সাহায্য করছে, হঠাৎ কাজ থামিয়ে সে বলে উঠল, "আর পারছি না, বড়ো ক্লান্ত লাগছে।"

বললাম, "জিরিয়ে নাও তা হলে, তোমাকে ছাড়াই সেরে ফেলতে পারব।"

দ্বিতীয়বার বলবার দরকার হল না, ব্রুনো ততক্ষণে ইঁদুরটাকে সোফার মতো করে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে শুরু করে দিয়েছে। ইঁদুরটাকে গড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে ব্রুনো বললে, "তোমাকে একটা ছোটো গান শোনাব।"

বললাম, "শোনাও-না, গানই আমার সবচেয়ে ভালো লাগবে।"

আমাকে যাতে ভালো করে দেখা যায়, তেমনি একটা সুবিধেমতো

জায়গায় ইঁদুরটাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ব্রুনো বললে, "কোন গানটা শুনতে চাও? 'টিং, টিং, টিং'-টা সবচেয়ে ভালো।"

এমন পরিষ্কার ইঙ্গিত তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না, তবু খানিকক্ষণ চিন্তার ভান করে বললুম, "তা, 'টিং, টিং, টিং'—টাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।"

ব্রুনোকে খুব খুশি দেখাল, বললে, "এতেই বোঝা গেল যে, গানের ব্যাপারে তুমি বেশ সমঝদার। ক'টা বুবেল চাও?" আমার ভাববার সুবিধের জন্যেই বোধ হয় বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে পুরে দিলে।

কাছাকাছি মাত্র এক থোকাই বুবেল ফুল ফুটে ছিল, তাই বেশ গম্ভীরভাবেই বললুম যে, এখনকার মতো একটা হলেই চলবে। বলে ফুলের থোকাটা তুলে ব্রুনোর হাতে দিলুম। গাইয়ে-বাজিয়েরা যেমন বাজনা পরখ করে নেয়, তেমনি করে সে ফুলগুলোর গায়ে ওপর থেকে নীচে হাত বোলাতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার মিষ্টি টুংটাং শব্দ উঠতে লাগল। ফুলের বাজনা এর আগে কখনো শুনি নি—আমার মনে হয়, 'ছম্‌ছমে' ঘোরের মধ্যে না-থাকলে কেউ শুনতে পায়ও না—আর, সে-বাজনা যে ঠিক কী রকম, তা তোমাদের কী করে বোঝাব, তাও ভেবে পাচ্ছি না, তবে, তোমাদের আন্দাজের জন্যে এইটুকু বলতে পারি যে, হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে-আসা অনেক ঘণ্টার শব্দের মতো শুনতে লাগল। ব্রুনো যখন দেখলে যে, ফুলগুলো ঠিক সুরে বাঁধা আছে, তখন সে মরা ইঁদুরটার ওপর চেপে বসল (আর কোথাও বসে ও তেমন আরাম পায় না বলে মনে হয়), তার পর চোখে একটা খুশির ঝিলিক তুলে আমার দিকে তাকিয়ে গান শুরু করলে:

"উঠে পড় গো, উঠে পড়! দিনের আলো মরমর;
পাঁ্যাচারা চেঁচায়; টিং, টিং, টিং!
ওঠ গো, পড় উঠে! বিলের ধারে জুটে
পরীরা বাজায় বাঁশি; টিং, টিং, টিং!
পরীর রাজায় স্বাগত জানাতে, ভাই,
আমরা গাই, গাই, গাই!"

প্রথম চারটে লাইন খুব চট্‌পট্‌ করে খুশি-ভরা গলায় গাইলে,

তালে তালে বুবেলের টুংটাং ঘণ্টার শব্দ করলে, তবে শেষের লাইন দুটো গাইলে খুব ধীরে আর শান্ত হয়ে, ফুলগুলোকে মাথার ওপর শুধু সামনে-পেছনে দোলাতে লাগল তখন। প্রথম স্তবক শেষ করে গান থামিয়ে বললে, "আমাদের পরীর রাজার নাম হল ওবেবরঅন"—'ওবেরন' বলতে চেয়েছে বোধ হয়—"তিনি ঐ বিলের ওপারে থাকেন—ও-ই ওখানে—কখনো-সখনো ছোট্টো একটা নৌকো চেপে এখানে আসেন—তখন আমরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি—তখন আমরা এই গান গাই, বুঝলে।"

আমি বদমাইসি করে বললুম, "আর, তার পর ওর কাছে নেমন্তন্ন খেতে যাও ?"

ব্রুনো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কথা বলতে নেই, তাতে গানের অসুবিধে হয়।"

বললুম, "আর কথা কইব না।"

খুব গম্ভীরভাবে ও বলতে লাগল, "যখন গান করি, তখন আমি একদম কথা কই না ; তোমারও কথা বলা উচিত নয়।" তার পর বুবেলের ঘণ্টায় ঝাঁকি দিয়ে ফের গাইতে শুরু করলে :

"শোন, ওগো ঐ শোন ! দূরে আর কাছে কোনো
সুর আসে ভেসে ; টিং, টিং, টিং !
খাদের ভেতরে বাজছে যে জোরে
পরীর ঘণ্টা ; টিং, টিং, টিং !
পরীর রাজায় স্বাগত জানাতে, ভাই,
মোরা বাজাই, বাজাই, বাজাই !

"দেখ, ওগো, দেখ চেয়ে ! গাছে গাছে আছে ছেয়ে
কিসের আলো যে ; টিং, টিং, টিং !
জোনাকির চোখ, জ্বেলেছে আলোক,
আমাদের ভোজে ; টিং, টিং, টিং !
পরীর রাজায় স্বাগত জানাবে বলে,
তারা দোলে, দোলে, দোলে !

"ত্বরা করি এস, ত্বরা করি ! নিয়ে নিই এস তাড়াতাড়ি
রসাল খাবার ; টিং, টিং, টিং !
মৌ ভরা আছে—"

এই সময়ে আমি ব্রুনোকে সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠলাম, "শ্-শ্-শ্! ব্রুনো! সিল্‌ভি আসছে!"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে দিলে, নইলে আর একটু হলেই ঠিক সিল্‌ভির কানে যেত। সিল্‌ভি তখন লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে; সিল্‌ভিকে যেই-না দেখতে পাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো হঠাৎ ষাঁড়ের মতো সোজা ছুটতে শুরু করে দিয়েছে সিল্‌ভিকে লক্ষ্য করে, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলছে, "এদিকে দেখো না! অন্য দিকে তাকাও! অন্য দিকে তাকাও!"

কোথাও কোনো বিপদ-আপদ আছে কি-না তাই দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বেশ ভয় পেয়েই সিল্‌ভি জানতে চাইলে, "কোন দিকে?"

ব্রুনো খুব সাবধানে সিল্‌ভিকে ঘুরিয়ে তার মখটা বনের দিকে করে দিয়ে বললে, "ঐদিকে! এবার পিছু হেঁটে এস—আস্তে আস্তে—হোঁচট খাবার ভয় নেই!"

তা সত্ত্বেও সিল্‌ভি হোঁচট খেল। আসলে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্রুনো এত-সব কাঠ-কুটো নুড়ি-টুড়ির ওপর দিয়ে ওকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল যে, সে নিজেই যে উল্টে পড়ে যায় নি, সেইটাই আশ্চর্য। তবে, তখন সে এতই উত্তেজিত হয়ে আছে, যে ও-সব দিকে খেয়ালই নেই।

আমি ইশারা করে নিঃশব্দে ব্রুনোকে খুব ভালো একটা জায়গা দেখিয়ে দিলুম, সিল্‌ভিকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে বাগানের সবটা একসঙ্গে চোখে পড়বে; সামান্য ঢিবির মতো জায়গাটা, একটা আলুর সমান উঁচু। ওরা তার ওপর চড়ে দাঁড়াতেই আমি আড়ালে চলে এলুম, সিল্‌ভি যাতে না-দেখতে পায়।

শুনলুম, ব্রুনো বিজয়গর্বে চীৎকার করে বলছে, "এইবার তাকিয়ে দেখ!" তার পরই শুনলুম জোর হাততালির শব্দ; তবে সেটা ব্রুনোই দিলে। সিল্‌ভি একদম চুপ— দুহাত একসঙ্গে জড়ো করে চেপে ধরে সে শুধু দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে, আমার তো ভয় হল, ওর বোধ হয় মোটেই পছন্দ হয় নি।

ব্রুনোও খুব উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল তার পর সিল্‌ভি যখন সেই ঢিবিটা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বাগানের ছোট্টো রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে লাগল, তখন সেও সাবধানে তার সঙ্গে সঙ্গে

হাঁটতে লাগল, সিল্‌ভি যেন কোনো আভাস-ইঙ্গিত না-পায় তার কাছ থেকে, নিজের মত নিজেই ঠিক করুক। আর, তার পর লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে সিল্‌ভি যখন তার অভিমত জানালে, চাপা গলায় একটানে বললে, "এত চমৎকার বাগান আমি জীবনে কখনো দেখি নি!" তখন ক্ষুদেবাবুর খুশি দেখে মনে হল, ইংলণ্ডের সমস্ত জজ আর জুরিরা একসঙ্গে মিলে যেন এই রায় দিয়েছে।

সিল্‌ভি বললে, "একলা হাতে এত-সব করেছ, ব্রুনো? আমারই জন্যে করেছ?"

সিল্‌ভির বিস্মিতভাব দেখে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে ব্রুনো বললে, "কিছুটা সাহায্য অবশ্য পেয়েছি। সারা বিকেল ধরে কাজ করেছি আমরা– ভাবলুম, তোমার ভালো লাগবে—" বলতে বলতে বেচারা ক্ষুদেবাবুর ঠোঁট দুটো থির্‌থির্‌ করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, তার পরেই এক লহমায় কান্নায় ফেটে পড়ে একদৌড়ে সিল্‌ভির কাছে গিয়ে প্রবল আবেগে তার গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধের ওপর মুখ লুকোলে।

সিল্‌ভি যখন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বললে, তখন তার গলাটাও কাঁপছে, "ব্যাপার কী? কী হয়েছে মানিক?" বলতে বলতে তার মুখটা তুলে চুমু দিতে চেষ্টা করলে।

ব্রুনো কিন্তু তেমনি ঝাঁপটে পড়ে রইল মুখ গুঁজে, বাকিটুকু না-বলে তার স্বস্তি নেই, "প্রথমে—আমি তোমার বাগানটা—নষ্ট করতে চেষ্টা করছিলুম—প্রথমে করছিলুম—কিন্তু—আর কক্ষনো—কক্ষনো—" তার পর আর একবার কান্নার জোয়ার এসে তার কথাগুলোকে ডুবিয়ে দিলে। শেষপর্যন্ত কোনোরকমে বললে, "ফুলগাছ পুঁতলুম—খুব ভালো লাগল—তোমার জন্যেই, সিল্‌ভি—তোমার জন্যেই তো—এমন আনন্দ আমার আর কক্ষনো হয় নি—" বলতে বলতে টস্‌টসে গোলাপি মুখখানি আস্তে আস্তে উঠে এল সিল্‌ভির চুমো পাবার জন্যে, কান্নায় সারা মুখ ভেসে গেছে।

ততক্ষণে সিল্‌ভির চোখও শুকনো নেই—"ব্রুনো আমার, সোনা আমার! এত আনন্দ আমিও এর আগে কখনো পাই নি—" এ ছাড়া আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, যদিও, কিছুতেই আমার মাথায় এল না যে, এই দুটি বাচ্চা যদি এমন আনন্দ এর আগে আর

কখনো না-ই পেয়ে থাকে, তা হলে এমন করে কাঁদে কেন? এ এক রহস্য।

আমারও খুব আনন্দ হতে লাগল, তবে কাঁদি নি: জেনে রাখ, 'প্রকাণ্ডরা' কখনো কাঁদে না—ও-সব আমরা পরীদের জন্যে তুলে রাখি। তবে, ঠিক সেই সময়ে নিশ্চয়ই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে থাকবে না-হলে আমার গালে দু-এক ফোঁটা জলই-বা এল কোথেকে।

তার পর ওরা দুজনে সারা বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখলে, একটি একটি করে ফুল দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল—যেন খুব লম্বা একটা বাক্য বানান করে করে পড়ছে ওরা, মাঝে মাঝে তার চুমুর কমা, আর সব শেষে জড়িয়ে-ধরার পূর্ণচ্ছেদ।

সিল্‌ভির দিকে খুব শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্রুনো বললে, "জান সিল্‌ভি, এটাই হল আমার 'পাতিহাঁসা'?"

সিল্‌ভি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল, বলল, "তার মানে কী?" বলে দুহাত দিয়ে তার বাদামি চুলের রাশ পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে ব্রুনোর দিকে তাকালে—সে চোখ খুশিতে নাচছে, কান্নায় ভিজে চিক্‌চিক্ করছে তখনো।

ব্রুনো লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে খুব শক্ত একটা কিছু করবার জন্যে মুখটাকে বাগিয়ে নিলে। বললে, "আসলে আমি বলতে চাই, 'প্রতিহিংসা', এবার তো বুঝলে!" শেষপর্যন্ত কথাটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পেরেছে বলে তার আনন্দ আর গর্বের সীমা নেই, দেখে আমারই হিংসে হল। বুঝলুম, আসল ব্যাপারটা সিল্‌ভি কিছুই বুঝতে পারে নি, তবে সে যাই হোক, তার দু গালে দুটো চুমু তো খেলে।

তার পর তারা খুব ভাব করে, হাতে হাতে জড়িয়ে ধরে, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে বলতে, মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে ফুলের কেয়ারির মধ্যে দিয়ে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল, আর আমি বেচারার দিকে একবারও ফিরে চাইলে না। হ্যাঁ, একবার চেয়েছিল, ওরা যখন প্রায় আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তখন ব্রুনো এক লহমার জন্যে সামান্য একটু ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ছোট্টো করে মিষ্টি একটা বিদায়ের ইশারা জানাল আমায়। আমি যে এত করলুম, তার জন্যে ধন্যবাদ বলতে ঐটুকুই যা জুটল আমার বরাতে।

বুঝতে পারছি, গল্প শেষ হয়ে গেল বলে তোমাদের খারাপ লাগছে—

লাগছে তো ? আচ্ছা, তা হলে আর একটা কথা বলি। শেষ যখন ওদের দেখলুম তখন ওরা কী করছিল, বলি—দুহাত দিয়ে ব্রুনোর গলা জড়িয়ে ধরে নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকে বড়ো সোহাগভরে তার কানে কানে সিল্‌ভি বলছে : "জান ব্রুনো, সেই যে খুব শক্ত একটা কথা তখন বললে, সেটা একদম ভুলে গেছি, আর একবার বল-না! আরে বলই-না! শুধু এই একবারটি, সোনা!"

কিন্তু না, ব্রুনোর আর সে-চেষ্টা করে দেখবার মোটেই ইচ্ছে নেই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বদলে-যাওয়া কুমির

সেই স্বপ্নমাখা রহস্যরাঙা আবেশ থেকে জেগে উঠলুম ; আবার আমার চারিপাশে মামুলি জীবনের ভীড়। আর্লমশাইয়ের বাড়ির দিকে পা চালালুম, কারণ তখন প্রায় পাঁচটা বাজে, মন 'চা' 'চা' করছে ; আর ওদের ওখানে চায়ের পাট এখনো চোকে নি নিশ্চয়ই।

লেডি মুরিয়েল আর তাঁর বাবা পরম সমাদরে আমায় ডেকে বসালেন। কেতাদুরস্ত বৈঠকখানায় সচরাচর যাঁদের দেখা মেলে—মনের ভাব গোপন রেখে যাঁরা বাইরে ভব্যতার মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান, —এঁরা ঠিক সে-ধরনের মানুষ নন। ওঁদের দেখে যদি মনে হয়, খুশি হয়েছেন, বুঝতে হবে তাঁরা সত্যিই খুশি হয়েছেন। লেডি মুরিয়েল যখন বললেন, "আপনাকে দেখে খুব খুশি হলুম !" বুঝলুম, তার মধ্যে ভেজাল নেই।

লেডি মুরিয়েলের কাছ থেকে চড়ুইভাতিতে যাবার কথা শুনলুম। আমায় যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করলেন, তার পর কী যেন মনে পড়ে যেতে বললেন, "যদি পারেন, ডাক্তার ফরেস্টারকেও নিয়ে আসবেন। শহরের বাইরে ঘুরে এলে, ওঁর পক্ষে ভালোই হবে ; উনি বড্ডো বেশি পড়াশোনা নিয়ে কাটান। আর, মনে হয়, ওঁর বন্ধুবান্ধব কম, একা একা থাকতে হয়। আনুন-না ওঁকে সেদিন। মনে রাখবেন, পরের সপ্তাহের

মঙ্গলবার। আমরা আপনাদের গাড়িতে নিয়ে যাব। রাস্তার দু ধারে কত কী সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, রেলে গেলে আফশোস হবে। আর, আমাদের খোলা গাড়িতে চারজনই ধরে।"

আমি বললাম, "যাতে আসে, আমি নিশ্চয়ই বিশেষ করে বলব।" মনে মনে ভাবলুম, 'ওকে আটকানই শক্ত হবে!'

আর দশ দিন বাদেই চড়ুইভাতি। আর্থারকে বলতেই যেতে রাজি হল, তবে অনেক পেড়াপিড়ি করেও এই দশ দিনের মধ্যে একবারও ওকে আর্ল বা মুরিয়েলের সঙ্গে দেখা করতে পাঠান গেল না—আমার সঙ্গেও নয়, একাও নয়। বললে বলে, তাতে নাকি ওর 'আদর কমে যাবে'।

মুরিয়েলের সঙ্গে যাতে ও একা একা একটু কথাবার্তা বলতে পারে, তাই জন্যে ঠিক করলুম যে, আর্লের বাড়ি যাবার সময়ে আমরা আলাদা আলাদা যাব—আমি একটু পরে পৌঁছাব।

তাই, চড়ুইভাতির দিন আমি ইচ্ছে করেই একটু ঘুর-পথে 'হল'-এর দিকে (আর্লের বাসার নাম 'দি হল') যেতে লাগলুম। মনে মনে ভাবলুম, 'একটু পথ হারিয়ে ফেললে, আরো চমৎকার হয়!'

যা আশা করেছিলুম, তার চেয়ে আরো ভালো হল, খুব শিগ্‌গিরই হল। আগের বারে এল্‌ভেস্টনে থাকতে এই গাছপালা-ভরা রাস্তায় কতবার একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি, পথ প্রায় মুখস্থ; আর, দেখতে না-দেখতে সেইখানে কি-না বেবাক হারিয়ে গেলুম! আর্থার আর লেডি মুরিয়েলের কথা মাথায় ঘুরছিল বটে, কিন্তু তবু, বড়ো আশ্চর্য লাগল। মনে মনে বললুম, 'এই ফাঁকা জায়গাটা খুব চেনা চেনা লাগছে, কী একটা ঘটনা যেন ঘটেছিল, মনে এসেও আসছে না—হ্যাঁ, এইখানেই তো সেই বাচ্চা-পরীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! তবে, কাছাকাছি সাপ-খোপ না-থাকলে বাঁচি!' একটা ভেঙে-পড়া গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসতেই মনের কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "সাপ আমার দুচক্ষের বিষ—আর, ব্রুনোরও নিশ্চয়ই সাপ ভালো লাগে না।"

"না, সাপ ওর মোটেই ভালো লাগে না!" পাশ থেকে শান্ত গলায় কে যেন বলে উঠল, "তবে, সাপকে যে ভয় পায়, তা নয়, বুঝলে? পছন্দ করে না। বলে, সাপ বড্ডো কিল্‌বিল্ করে!"

ব্যাগ্র চোখে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখলুম ভেঙে-পড়া একটা

গাছের গুঁড়ির ওপরে ক্ষুদে-ক্ষুদে ঘাসের মতো সবুজ একধরনের শ্যাওলা জন্মেছে, তারই ওপর আয়েস করে টুলটুলে ক্ষুদে পরী দুটিতে বসে আছে। কী সুন্দর যে দেখতে লাগল, বলে বোঝান যায় না। কনুয়ের ভর দিয়ে হাতের ওপর গোলাপি গালটি ঠেকিয়ে সিল্‌ভি আধ-শোওয়া; আর, ব্রুনো তার কোলের কাছে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়েছে তার পায়ের দিকে।

তাড়াহুড়োয় আমার মুখ দিয়ে আর কিছু বের হল না; শুধু বললুম, "বড্ডো বেশি কিলবিলে?"

ব্রুনো না-ভেবেচিন্তেই বলে দিলে, "বিশেষ বাছ-বিচার করি না, তবে সোজা চেহারার জানোয়ারই আমার সবচেয়ে পছন্দ—"

সিল্‌ভি বললে, "কিন্তু কুকুর যখন বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ল্যাজ নাড়ে, তখন তো বেশ লাগে তোমার? তুমি নিজেও জান, ব্রুনো, তোমার ভালো লাগে।"

ব্রুনো আমাকে সালিসী মেনে বললে, "কিন্তু, ল্যাজের চেয়ে কুকুরের ভাগটাই তো বেশি, তাই-না মশাইবাবু? শুধু মাথাটা আর ল্যাজটা থাকলে কি আর কেউ কুকুর রাখতে চাইত?"

স্বীকার করতে বাধ্য হলুম যে, তেমন কুকুর মোটেই ভালো লাগবে না।

সিল্‌ভি ভাবতে ভাবতে বললে, "ওরকম কুকুর হয়-ই না!"

ব্রুনো বলে উঠল, "কিন্তু, হবে—যদি প্রফেসর আমাদের হয়ে কুকুরকে ছোটো করে দেন!"

আমি বললুম, "ছোটো করে দেন? এ-খবর তো জানা ছিল না! কী করে করেন?"

সিল্‌ভি বলতে শুরু করেছে, "তাঁর একটা অদ্ভুত যন্ত্র আছে—"

ব্রুনো মাঝ পথে বলে উঠল, "মচৎকার অদ্ভুত যন্ত! তার একদিকে যদি কিছু পুরে দেওয়া যায়, আর তিনি যদি হাতল ঘোরান, তখন অন্য দিক দিয়ে সেটা যখন বেরিয়ে আসে—কী ছোট্টো হয়ে যায়!" তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে সিল্‌ভি গল্পটা বলে ফেলবে, এটা ব্রুনোর ভালো লাগে নি, তাই তাড়াহুড়ো করে সবটা বলে দিলে।

সিল্‌ভি ব্রুনোর শেষ কথাটার জের টেনে বললে, "ছোটো বলে ছোটো!"

ব্রুনো বলে যেতে লাগল, "একদিন—যখন আমরা অচিন দেশে থাকতুম, বুঝলে—সিল্‌ভি আর আমি পরীর দেশে আসবার আগে—আমরা তাঁর কাছে একটা বড়ো কুমির নিয়ে গেছিলাম। উনি আমাদের জন্যে সেটাকে ছোটো করে দিলেন। কী মজার যে দেখতে হয়েছিল না! কুমিরটা চারিদিকে তাকাচ্ছে আর বলছে, 'আমার বাদবাকিটা গেল কোথায়?' তখন ওর দুচোখে দুঃখু দেখতে পেলুম—"

সিল্‌ভি বাধা দিয়ে বললে, "দুচোখে নয়, মোটেই!"

ক্ষুদুবাবু বললে, "তা তো নয়ই! যে-চোখে দেখতে পাচ্ছিল না যে, বাদবাকিটা কোথায় গেল, সেই চোখেই শুধু দুঃখু ছিল, আর যে-চোখে দেখতে পাচ্ছিল যে—"

ব্যাপারটা ভয়ানক গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি বললুম, "কুমিরটা কত ছোটো হল?"

"আমরা যখন কুমিরটাকে ধরেছিলুম, তার আদ্দেক—এই এতটা," বলে ব্রুনো প্রাণপণে দুহাত ছড়িয়ে দেখালে।

তার মানে কতটা হল, হিসেব করতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না। তুমি তো পড়ছ, আমার হয়ে হিসেবটা করে নিও লক্ষ্মীটি!

"তা বলে ঐরকম ছোটো অবস্থায় ওকে ফেলে রাখ নি তো?"

"তা রাখি নি। সিল্‌ভিতে আমাতে মিলে আবার ওটাকে পফেসারের কাছে নিয়ে অনেকখানি লম্বা—কতটা লম্বা করিয়ে নিলুম রে সিল্‌ভি?"

সিল্‌ভি বললে, "আসল মাপের চেয়ে আড়াই গুণেরও কিছু বেশি হবে।"

"আগের চেয়ে এটাই কি তার পছন্দ হল? মনে তো হচ্ছে না!"

ব্রুনো সাগ্রহে বলে উঠল, "কিন্তু পছন্দ হল! নতুন ন্যাজটা দেখে তার কী গব্ব! কুমিরের এমন গব্ব তুমি কক্ষনো দেখ নি! ন্যাজের ওপর দিয়ে চলে চলে, তাম্পর পিঠের ওপর দিয়ে চলে চলে, তাম্পর মাথা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে চলে গেল, জান?"

সিল্‌ভি বললে, "অতটা নয়। অতটা যাওয়া যায় না, নিজেই তো জান, ব্রুনো!"

ব্রুনো বিজয়গর্বে বলে উঠল, "হুঁ হুঁ ব্বাবা, একবারমাত্ত গেছিল, তুমি দেখতে পাও নি, আমি কিন্তু ঠিক দেখেছি! খুব পা টিপে টিপে গেছিল, পাছে তার নিজের ঘুম ভেঙে যায়। ও ভাবছিল, ও বোধ হয়

ঘুমচ্ছে। দুটো পা-ই ন্যাজের ওপর ছিল। তা'পর চলতে চলতে পিঠের ওপর দিয়ে গিয়ে কপাল পর্যন্ত চলে গেল। তা'পর নাকের কাছে এট্টুখানি এগিয়ে গেল! হুঁহুঁ ব্বাবা!"

আগের চেয়ে এটা আরো গোলমেলে ব্যাপার। লক্ষ্মীটি, এবারেও তুমিই ভরসা!

বার বার 'এটা হয় নি', 'ওটা হতে পারে না', এই-সব বলার চেয়ে, এক কথায় পুরো ব্যাপারটাকে নাকচ করে দেবার জন্যে তেরিয়া হয়ে সিল্‌ভি বলে উঠল, "কোনো কুমির তার নিজের কপাল বেয়ে হাঁটতে পারে, এ আমি একদম মানি না!"

ব্রুনো বেশ বিঁধিয়ে বললে, "কেন কুমিরটা অমন করলে, তার কারণটাই যে জান না! মস্ত একটা কারণ ছিল। শুনলুম বলছে, 'নিজের কপালের ওপর দিয়ে হাঁটব নাই-বা কেন?' তাই জন্যেই তো হাঁটল, বুঝলে!"

আমি বললুম, "বেশ, তাই নাহয় হল, ব্রুনো। কিন্তু তা হলে আমিও তো বলতে পারি, তুমি ঐ গাছটাতে চড়ছ নাই-বা কেন?"

ব্রুনো সাফ জবাব দিলে, "আমাদের গপ্প শেষ হয়ে গেলেই এট্টু পরেই চড়ব। একজন যদি গাছে চড়ে, আর, আর-একজন যদি বসে থাকে, তা হলে কি ভালো করে তার সঙ্গে কথা বলা যায়?"

আমার তো মনে হল, গাছে চড়তে চড়তে ভালো করে কথা বলা কোনো সময়েই যায় না—দুজনেই যদি চড়ে, তা হলেও নয়। কিন্তু ব্রুনোর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলার অনেক ঝক্কি, তাই ভাবলুম যে, ও-প্রসঙ্গের ইতি করে বরং সেই লম্বা করার যন্ত্রটার বিষয়ে একটু খোঁজ-খবর করি।

ব্রুনো এবারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলে না, সিল্‌ভিকেই বলতে দিলে। সিল্‌ভি বললে, "আখ-মাড়াই কলের মতন, কোনো কিছু তার মধ্যে দিলে, সেটা চেপ্‌টে নিষ্পেষিত—"

ব্রুনো বাধা দিয়ে বললে, "চিষ্‌পেষিত!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ", বলে সিল্‌ভি সায় দিলে, তবে কথাটা আর উচ্চারণ করতে ভরসা পেলে না। "তার মধ্যে কোনো কিছু দিলে, সেটা—ঐ-রকম হয়ে যায়, আর-কি; আর তখন কী লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসে!"

ব্রুনো বললে, "একবার আমাতে আর সিল্‌ভিতে মিলে একটা ঘুমপাড়ানি ছড়া লিখে ফেলেলুম—"

সিল্‌ভি ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "ফেলেছিলুম !"

"হ্যাঁ, একটা ছড়া লিখেছিলুম ফেলেছিলুম। পফেসার আমাদের জন্যে সেটাকে কত লম্বা করে দিলেন !"

"সেই যন্ত্র থেকে কবিতাটা লম্বা হয়ে বেরিয়ে এল ?"

সিল্‌ভি বললে, "প্রফেসরমশাইকে বলব, তোমায় গেয়ে শোনাতে, এমনি বললে কোনো মজাই থাকবে না।"

বললুম, "প্রফেসরের সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছে আছে। আর, কাছাকাছি আমার কজন বন্ধু থাকেন, তোমাদের সবাইকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই ! যাবে নাকি ?"

সিল্‌ভি বললে, "প্রফেসরমশাই আসতে চাইবেন বলে মনে হয় না, বড্ডো মুখচোরা। আমাদের খব ভালো লাগবে। তবে, এইরকম পুঁচকে হয়ে না যাওয়াই ভালো, বঝলে তো !"

সে কথা আগেই আমার মাথায় এসেছে, ভেবেছি যে, ক্ষুদে-ক্ষুদে এই দুটি বন্ধুকে লোকসমাজে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে, সেটা একটু অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে। জিগেস করলুম, "কী মাপের হবে তোমরা ?"

সিল্‌ভি ভাবতে ভাবতে বললে, "সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতন হয়ে আসাই ভালো। ওটাই মানিয়ে নেওয়া সবচেয়ে সহজ হবে।"

"আজকে যাবে ? তা হলে তোমাদের একটা চড়ুইভাতিতে নিয়ে যেতে পারি !"

একটু ভেবে নিয়ে সিল্‌ভি বললে, "না, আজ নয়। আজ সব গোছগাছ করা নেই। যদি বল তো—পরের মঙ্গলবার নাহয় আসতে পারি। এবার কিন্তু পড়তে বসতে হবে ; সত্যি বলছি ব্রুনো, আর দেরি নয় !"

ব্রুনো বললে, "কবে যে তুমি ঐ কথাটা বলা ছাড়বে—'সত্যি বলছি বুনো !' শুনলেই বুঝতে পারি কিছু একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে !" বলতে বলতে ব্রুনো ঠোঁট ফোলালে, তাতে ওকে আরো মিষ্টি দেখাল। তার পর বললে, "ওরকম করলে আর তোমায় চুমু খাব না, যাও !"

সিল্‌ভি মজা করে বলে উঠল, "কিন্তু চুমু খাওয়া তো হয়েই গেছে !"

"বেশ, তা হলে চুমু তুলে নিচ্ছি," বলে ব্রুনো সিল্‌ভির গলা জড়িয়ে ধরে যা করলে, সেটা খুব খারাপ লাগার মতো ব্যাপার বলে তো বোধ হল না।

ঠোঁটদুটো ছাড়া পেতেই সিল্‌ভি বললে, "এ তো চুমু খাওয়ারই সামিল!"

রেগেমেগে ব্রুনো বললে, "তুমি ঘোড়ার ডিম জান, এটা ঠিক-উল্‌তো!" বলেই গট্‌গট্‌ করে সেখান থেকে চলে গেল।

হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে সিল্‌ভি বললে, "তা হলে মঙ্গলবার কি আসছি?"

বললুম, "তাই ভালো, মঙ্গলবারই হোক। কিন্তু প্রফেসর এখন কোথায়? তোমাদের সঙ্গে তিনিও পরীর দেশে এসেছেন না-কি?"

সিল্‌ভি বললে, "না, তবে কথা দিয়েছেন যে, পরে কোনো-এক দিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। বক্তৃতা তৈরি করছেন এখন, তাই বাধ্য হয়ে বাড়িতেই আছেন।"

কী যে বলল, ভালো করে যেন বুঝলুম না, কেমন ঘোর লাগল, তাই আবার বললুম, "বাড়িতে আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আলসাহেব এবং লেডি মুরিয়েল বাড়িতেই আছেন। দয়া করে ভেতরে আসুন—এই দিকে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তিনটে খটাস

তার পর, ঘোরের মধ্যেই সেই স্বরের পিছু-পিছু যে-ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম, সেখানে আর্লমশাই, তাঁর মেয়ে আর আর্থার বসে আছে। লেডি মুরিয়েল কপট রাগ দেখিয়ে বলে উঠল, "এতক্ষণে আসা হল!"

"একটু দেরি হয়ে গেল।" আমতা আমতা করে বললুম বটে, কিন্তু কেন দেরি হল, তা বোঝাতে গেলে মুস্কিলে পড়তুম। কপাল ভালো, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠল না।

গাড়ি লাগাতে বলা হল; চড়ুইভাতিতে আমরা যে-সব খাবার নিয়ে যাব, একটা টুক্‌রিতে সে-সব বোঝাই করা ছিল, সেটা গাড়িতে চাপান হল, আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

যেতে যেতে লেডি মুরিয়েল আর আর্থার মন খুলে কথাবার্তা বলতে লাগল। কোন কথাটা ভালো শোনাবে না, কোন কথাটায় কে কী মনে করবে, কোন কথাটা বড্ডো গুরুগম্ভীর শোনাবে, কোনটা ছ্যাবলামি হবে— এ-সব নিয়ে কারও মাথা ঘামাবার দরকার হচ্ছে না, অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো দুজনে অনর্গল কথা বলে চলেছে।

মুরিয়েল হঠাৎ বললে, "আচ্ছা, চড়ুইভাতি বাতিল করে আমরা অন্য কোথাও যাব নাই-বা কেন? চারজনই-বা কম কী? আর খাবারের কথা যদি ওঠে, তো আমাদের টুক্‌রিতে যা আছে—"

আর্থার হেসে উঠে বললে, "যাব নাই-বা কেন? ঠিক মেয়েদের মতো কথা! মেয়েরা কিছুতেই বুঝতে পারে না, কোনটা ঠিক।"

খুব গোবেচারার মতো মুখ করে মুরিয়েল বললে, "ছেলেরাই যেন সব সময়ে বোঝে!"

আর্থার বললে, "বেশির ভাগই, তবে একজনের কথা বলতে পারি, যিনি ব্যতিক্রম—আমাদের কবি ওয়াট্‌স—, তিনি অনেকটা মেয়েদের মতোই প্রশ্ন করেছেন।

'আমার প্রতিবেশীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে
তার জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত
করবই-বা কেন?'

সততার পক্ষে কী চমৎকার যুক্তি! ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে, যেন 'চুরি করবার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না বলেই আমি সাধু রয়ে গেছি!' এর বদলে চোর যে-যুক্তি দেখাতে পারে, সেটাও খুব পাকা: 'আমার প্রতিবেশীর জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করব, কারণ জিনিসটা আমার নিজের দরকার। আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করব এইজন্যে যে, তার সম্মতি তো কোনোদিনই পাব না'!"

আমি বললুম, "আমি আরো একজনের কথা বলতে পারি। আজই ঐরকম একটা প্রশ্ন শুনেছি—যে করেছে, সে মেয়ে নয়। 'আমার নিজের কপালের ওপর দিয়ে আমি হাঁটব নাই-বা কেন'!"

মুরিয়েল হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে বললে, "কী অদ্ভুত প্রশ্ন! কে এমন প্রশ্ন করলে, জানতে পারি?"

আমি আমতা আমতা করে বললুম, "কে যে বললে, কোথায় যে শুনলুম, কিছুই মনে পড়ছে না।"

মুরিয়েল বললে, "যেই হোক, চড়ুইভাতিতে তাকে পেলে বড়ো ভালো হত। চড়ুইভাতিতে গিয়ে কী ধরনের প্রশ্ন শুনতে হবে, তা তো জানি—'এই যে পুরনো ইমারতগুলো ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে, যেন ছবির মতো, তাই-না?' 'গাছের পাতায় হেমন্তের ছোঁয়ায় হলদে রঙ ধরছে, অপূর্ব দেখতে হয়েছে, তাই-না?' আজ বিকেলে অন্তত দশবার এই কটি প্রশ্ন আমায় শুনতে হবে, আর তার জবাব দিতে হবে!"

আর্থার বললে, "লোকসমাজের মেলামেশার মধ্যে এই এক অদ্ভুত

ব্যাপার! সুন্দর জিনিসের শোভা যদি ভালোই লেগে থাকে, সে কথা দশজনকে ডেকে না-শোনালে কি ভালো লাগা কমে যায়? প্রশ্ন আর উত্তরের মালা দিয়েই জীবনটা ভরে রাখতে হবে?"

কথাবার্তা একটু গুরুগম্ভীর হয়ে আসছিল, তার মধ্যেই আমরা চড়ুইভাতির জায়গায় পৌঁছে গেলাম। অন্য আরো-সব লোকজন আগেই এসে গেছেন। কাছেই একটা ভেঙে-পড়া প্রাচীন কেল্লা ছিল, ঘণ্টাদুয়েক তারই মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বেড়ালুম। তার পর সবাই মিলে একটা ঢিবির ধারে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে এখানে-ওখানে বসে পড়া গেল; সেখান থেকে সেই প্রাচীন কেল্লা আর তার চারিপাশের অনেকখানি পরিষ্কার দেখা যায়।

কিছুক্ষণ বেশ নির্বাক শান্তিতে কাটল। কিন্তু বেশিক্ষণ তা কপালে সইল না, মুরিয়েলের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল—চশমা-পরা অতি-আধুনিকা ধরনের একটি তরুণী তার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "কী সুন্দর এই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপটা, তাই-না? আর, গাছের পাতায় হেমন্তের ছোঁয়ায় হলদে রঙ ধরে অপূর্ব দেখতে লাগছে, না? আমার তো ভয়ানক অপূর্ব লাগছে!"

মুরিয়েল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে, তবে মুখে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! সত্যিই অপূর্ব!"

মুরিয়েলকে পাশে পেয়ে আমি বললাম, "যখন খুব ছোটো ছিলাম, তখন আবহাওয়া খারাপ থাকলে, বাইরে কোথাও যাওয়া যেত না বলে, আমরা ঘরের মধ্যেই নতুন এক ধরনের চড়ুইভাতি করতাম; খুব মজা হত। টেবিল-ক্লথটা টেবিলের ওপর না-পেতে, টেবিলের তলায় পাততাম, তার চারিধারে ঘিরে সবাই মাটিতে বসতাম। বসতে অসুবিধে হত, তবু তার মধ্যেই যে আনন্দ পেতাম নিয়মমাফিক সাজান ব্যবস্থায় তা কল্পনাও করা যায় না।"

মুরিয়েল বললে, "খাঁটি কথা বলেছেন। যতই নিয়মের মধ্যে মানুষ করা হোক-না কেন, ছোটোরা সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করে নিয়মকে। সুস্থ-স্বাভাবিক কোনো ছেলে বা মেয়েকে যদি মাথা নীচের দিকে আর পা ওপর দিকে করে পড়তে দেওয়া হয়, ব্যাকরণকৌমুদী পড়তেও বোধ হয় তার আপত্তি হবে না! তবে আপনাদের ঐ ঘরের-ভেতর-

চড়ুইভাতিতে নিশ্চয়ই একটা জিনিস বাদ পড়ত, খোলা জায়গায় চড়ুইভাতির যেটা একটা ভীষণ খুঁত !"

"ঝড়-বৃষ্টির ভয় ?"

"না, ভয় নয়, সম্ভাবনা—বরং নিশ্চিত সম্ভাবনা ! খাবারের মধ্যে পোকা-মাকড়, মশা-মাছি পড়বার সম্ভাবনা ! মাকড়সাকে আমি জুজুর মতো ভয় করি। বাবার কিন্তু ও-বালাই নেই—তাই-না বাবা ?" আর্লমশাই মেয়ের কথায় তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, তাই মুরিয়েল তাঁকে সাক্ষী মানল।

আর্ল বললেন, "প্রত্যেক মানুষেরই এক-একটা ব্যাপারে বিরাগ থাকে।"

খিলখিল করে হেসে উঠে মুরিয়েল বললে, "কিন্তু বাবার যে কিসে বিরাগ, তা আপনি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবেন না !"

আমি আন্দাজ করার চেষ্টাও করলাম না।

মুরিয়েল ফিস্‌ফিসে গলায় বললে, "দুচক্ষে সাপ দেখতে পারেন না বাবা ! আচ্ছা, এর কোনো মানে হয় ? কী সুন্দর, তুলতুলে, আদুরে-আদুরে ; তাকে কি-না ভালো লাগে না !"

আমি যেন ভয়ানক অবাক হয়ে গেছি। বললাম, "সাপ পছন্দ করেন না ! তাও নাকি হয় ?"

গম্ভীর হবার ভান করে মুরিয়েল বললে, "না পছন্দ করেন না। তবে, সাপকে যে ভয় পান, তা নয়, বুঝলেন ? তবে পছন্দ করেন না। বলেন, সাপ বড্ডো কিলবিল করে !"

ভেতরে ভেতরে যতটা চমকে উঠলুম, বাইরে ততটা অবশ্য প্রকাশ পেল না ! ক্ষুদে পরীর মুখ-থেকে-শোনা কথাগুলোর এই হুবহু প্রতিধ্বনি কানে যেতেই মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল ; অনেক কষ্টে শুধু বললাম, "এ-সব কথা থাক। একটা কিছু গেয়ে শোনাও না বরং, মুরিয়েল। আমি জানি, বাজনা ছাড়াই তুমি গাইতে পার।"

"বাজনা-ছাড়া একটা গানই আমার জানা আছে—সেটা আবার মারাত্মক রকমের করুণ ! চোখের জলটল সব তৈরি তো ?"

আশপাশ থেকে সবাই বলে উঠল, "খুব তৈরি ! খুব তৈরি !" আর পাঁচটা গান-জানা মেয়ের মতো কথা ভুলে-যাওয়া, গলা খারাপ-থাকা, ইত্যাদি নানারকম অজুহাতের দোহাই দিয়ে বারচারেক সনির্বন্ধ অনুরোধের অপেক্ষা না-করেই লেডি মুরিয়েল সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল :

"ছায়ায় ঘেরা পাতায় ছাওয়া পথের পাশে শ্যাওলা-ঢাকা পাথর,
তার ওপরে তিনটি খটাস অনড় বসে থাকে ;
স্বপ্ন দ্যাখে, সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেই আছে নিথর,
নিথর বসে আঁকড়ে ধরে রাজার গদিটাকে।
বৃদ্ধ পিতা একলা ঘরে পথ চেয়ে আর দিন গুনে হন কাতর—
তবু তারা বসেই থাকে, কেবল বসেই থাকে।"

"তিনটে হেরিং আশে-পাশে এদিক সেদিক করছে ঘোরাঘুরি,
খুঁজছে সুযোগ মওকা-মাফিক বসবে পাথরটায় ;
যে আনন্দে জীবন তাদের কানায় কানায় উঠল এমন পূরি
ইচ্ছা তাদের, খোশমেজাজে তাহারই গান গায়।
ঘড়ঘড়ে আর বেসুর-গলায় তিনজনে তাই গানটি দিল জুড়ি'—
সে-গান তারা গেয়েই চলে, গানটি গেয়েই যায়।

"তিন হেরিং-এর মা-জননী নোনা জলের ঢেউয়ের মাথায় মাথায়
হারিয়ে-যাওয়া তিনটি মেয়ের সন্ধানেতে ফেরে ;
তিন খটাসের বৃদ্ধ পিতা গুহার ভিতর কাৎরে ওঠে ব্যথায়,
'আয় রে ফিরে, থাকিস নি আর তোরা আমায় ছেড়ে !'
চেঁচিয়ে বলে, 'মিঠাই দেব, মণ্ডা দেব তোদের খাবার পাতায়—
মণ্ডা-মিঠাই দেব তোদের থালায় থালায় বেড়ে' !"

"হেরিং-মাতা বললে, 'তোমার তিনটি ছেলে, বলছ, গেছে বকে ?
ঘুমচ্ছিলাম, মোর মেয়েরা অমনি পড়ল সরে !'
খটাস-বাবা বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ, আমিই গেলাম ঠকে,
উচিত ছিল মানুষ করা অধিক যত্ন করে।'
এমনি করেই দুজনাতে সময় কাটায় দুঃখে এবং শোকে—
দুঃখে নয়ন-লোরে ভাসে, ভাসে নয়ন-লোরে !"

এই সময়ে হঠাৎ ব্রুনো বলে উঠল, "হেরিং-এর গানটা গাইতে হলে কিন্তু সঙ্গে বাজনার দরকার হয়, তবে এই খটাসের গানটায় বাজনা

না-হলেও আমার চলে।" বলে গানের বাদবাকিটা গাইতে শুরু করল: তার মিষ্টি কচি গলায় :

"খটাসগুলোর নেইকো গরজ মাছের সাথে আলাপ করার তরে ;
গান শুনবে, এমন কোনো হয় নিকো ভিমরতি ;
হেরিং-দিয়ে-রাঁধা যে-সব খাবার খেতে জল আসে মুখ-ভরে
সে-সব তাদের হয় নি চাখা কভুও এক রতি।
(ইচ্ছে তাদের) হেরিং-মেয়ের ল্যাজগুলোকে বাগিয়ে কষে ধরে
চিপ্‌টিয়ে দিই চিম্‌টে দিয়ে বিষম জোরে অতি !"

বলে রাখা দরকার যে, ঐ ব্র্যাকেটটা কিন্তু ব্রুনোই দিয়েছে--অবশ্য আঙুল দিয়ে হাওয়ায় এঁকে। এই মতলবটা কিন্তু আমার খুব ভালো মনে হয়। কোনো শব্দ করার দরকার নেই ; প্রশ্ন বোঝাতে গেলেও শব্দ হবে না।

ধর, তোমার বন্ধুকে তুমি বোঝাতে চাও যে, তুমি তাকে প্রশ্ন করছ, কিছু জিগেস করছ, অথচ ভাষায় তার কোনো লক্ষণ নেই, ভঙ্গিতেও নয়। বললে, "আগের চেয়ে আজ ভালো আছ।" এখন, এটাকে প্রশ্ন বলে বোঝাতে গেলে, সবচেয়ে সহজ উপায় হল শূন্যে আঙুল দিয়ে একটা '?' চিহ্ন আঁকা, তাই না ? সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরে যাবে ; ঠিক-না ?

ব্রুনো গেয়ে চলেছে :

" 'এ-তিনটে কি সেই মাছেরা, সাগরতলে যাদের মায়ের বাসা ?'
বুক-কাঁপান দীর্ঘশ্বাসে বললে বড়ো ভাই।
বললে মেজো, 'সেই মাছেরাই ; মাকে ফেলে রয়েছে বেশ খাসা।
ফুর্তি ছেড়ে ঘরে ফেরার মতলব নেই তাই !'
বললে ছোটো, 'বজ্জাত মাছ ! মগজগুলো দুষ্টুমিতে ঠাসা—
করছে কেবল পালাই, পালাই, পালাই !'

"তিনটে খটাস দুলকি চালে একে একে চলল তীরের দিকে,
পৌঁছে গেল সাগর উপকূলে ;

তিনজনেরই দাঁতের মাঝে দেখা গেল হেরিং এক-একটিকে—
মাঝবয়সী সরেস হেরিং, পুরুষ্টু, তুলতুলে।
'হুর্‌রে, হুর্‌রে. হুর্‌রে' রবে ঢেউয়ের আওয়াজ, তাও শোনাল ফিকে,
'হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌রে!' তারা গাইল গলা খুলে!"

গান শেষ করে ব্রুনো খানিকক্ষণ চুপ করে বসে অপেক্ষা করে দেখলে, আমি কিছু বলি কি-না। ও আশা করছিল, গান শুনে আমি নিশ্চয়ই একটা কিছু মন্তব্য করব।

কিন্তু আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। শুনলাম কে বলছে, "কী হল আপনার? ঘুমিয়ে পড়লেন না-কি? আমার গানের যে এমন ঘুম-পাড়ানি গুণ আছে, তা তো জানতাম না!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উনিশ-বিশ নম্বর, আজব সরণি

টের পেলুম, লেডি মুরিয়েল কথা বলছে। শুধু ঐটুকুই টের পেলুম, কিছুক্ষণ ধরে আর সবকিছু ধোঁয়াটে মনে হল। মুরিয়েল কী করে এখানে এল, আমিই-বা এখানে কেন, ঠিক যেন বোধগম্য হল না। মনের ভাব মনেই চেপে রাখলুম, মুখ ফুটে কিছু বললুম না; যতক্ষণ ঘোরটা না-কাটে, চুপ করে থাকাই ভালো।

প্রথমে বরং চারিদিকে তাকিয়ে দেখা যাক; তার পর যা যা দেখব, সেই-সব ঘটনা থেকে আস্তে আস্তে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঘাসে-ভরা জমি ঢালু হয়ে উঠে গেছে; ওপরে আইভিলতায় ছাওয়া প্রাচীন কেল্লার ভগ্নাবশেষ, নীচে দু সারি গাছের খিলেনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট্টো নদী—এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জটলা করে বসে আছে বাহারি পোশাক-পরা জনা বারো ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা—খোলা টুক্‌রিগুলো এলোমেলোভাবে ছড়ান—এই হল ঘটনা। না, আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ে নি; সবাই যখন দুজন বা তিনজনে মিলে একসঙ্গে দলবেঁধে গল্প করছে, আর্থার সেখানে একা। সবাই কথা বলছে, আর্থার চুপচাপ। সবাই হাসি-খুশি, আর্থারই কেবল গম্ভীর আর মনমরা।

লেডি মুরিয়েল একটু আগেই দলছাড়া হয়ে কোথায় উঠে গেছে, তাই কি আর্থার মনমরা ?

আবার একবার নজর করে দেখতে হল। দেখা গেল, লেডি-মুরিয়েল একজন নতুন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে দেখা করতেই উঠে গিয়েছিল তখন। দুজনে বেশ সাগ্রহে আর হাসিমুখে আলাপ করছে যেন অনেক দিনের পরিচয়। এবার মুরিয়েল ঘুরে ঘুরে সকলকার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। তরুণ, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ভদ্রলোকটি মুরিয়েলের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে মাথা উঁচু করে ; চলার ভঙ্গিটা সেনাপতির মতো।

আর্থারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে আমার কাছে এগিয়ে এল।

বললাম, "ভারি সুন্দর চেহারা।"

আর্থার বিড়্বিড়্ করে বললে, "দেখলে গা ঘুলিয়ে আসে, এত সুন্দর !" নিজের তিক্ত মন্তব্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে হেসে বললে, "ভাগ্যিস তুমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় নি !"

ঠিক সেই সময়ে লেডি মুরিয়েল আমাদের কাছে এসে বললে, "ডক্টর ফরেস্টার, আসুন, আপনার সঙ্গে আমার এই আত্মীয়টির পরিচয় করিয়ে দিই--এরিক লিণ্ডন—ক্যাপ্টেন লিণ্ডন বলাই অবশ্য উচিত !"

আর্থার এক লহমায় মনের ক্ষোভ সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে উঠে দাড়িয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আপনার কথা শুনেছি। আপনি লেডি মুরিয়েলের আত্মীয়, পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল।"

এরিক বললে, "হ্যাঁ, আপাতত লেডি মুরিয়েলের আত্মীয় হওয়াটাই আমার একমাত্র বলবার মতো পরিচয় !" তার পর লেডি মুরিয়েলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, "অবশ্য মানুষ হিসেবে তাতে জাতে উঠলুম কি-না, জানি না ; তবে, হাত তো খুলুক !"

মুরিয়েল বললে, "বাবার কাছে যাওয়া দরকার, এরিক। তিনি বোধ হয় ঐ পুরনো কেল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" ওরা চলে গেল।

আর্থারের মুখটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল ; বুঝলুম, নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে ইচ্ছে করেই সে একজনের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে।

ইতিমধ্যে ফেরার সময় হল, যাদের যাদের গাড়ি ছিল, সেগুলো এক জায়গায় এসে জড়ো হল। বুঝলুম, মুরিয়েলের আত্মীয়, এরিক এসে পড়ার ফলে স্বভাবতই সমস্যা হবে যে, চারজনের গাড়িতে পাঁচজনে

এল্‌ভেস্টন পৌঁছনো যাবে কী করে। একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হয়।

মহামান্য অতিথি, এরিক লিণ্ডন তখন মুরিয়েলের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন ; তিনি যদি দয়া করে বলেন যে, তিনি পায়ে হেঁটে যাবেন, তা হলে এক লহমায় সব সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু সেরকম কোনো সম্ভাবনা তো মোটেই দেখা যাচ্ছে না।

আমার মনে হল, তার বদলে আর-একটা পথ হল, আমার হেঁটে যাওয়া। আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব করলুম।

শুনে আর্ল বললেন, "তোমার সত্যিই কোনো অসুবিধে হবে না তো ? গাড়িতে সবাইকে তো ধরবে না, অথচ এরিককেও বলতে পারি না যে, মুরিয়েল থাকুক, আর তুমি চলে যাও— সবে দেখা হল।"

আমি বললুম, "অসুবিধের কথা কী বলছেন, আমার বরং সুবিধেই হবে। এই চমৎকার পুরনো কেল্লাটার একটা স্কেচ এঁকে ফেলার সময় পাব।"

আর্থার হঠাৎ বলে উঠল, "আমি থাকব তোমার সঙ্গে।" আমার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললে, "সত্যিই আমি থাকতে চাই, গাড়িতে আমায় ফালতু হয়ে থাকতে হবে!"

আর্ল বললেন, "আমিও হাঁটব ভাবছি। মুরিয়েল, সঙ্গী হিসেবে শুধু এরিককে নিয়েই তোমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা দুজনে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

আর্থার জিগেস করলে, "আঁকতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?"

বললাম, "ঘণ্টাখানেক নেব। তুমি আমার আগেই চলে গেলে ভালো হত না ? আমি বরং ট্রেনে যাব। ঘণ্টাখানেক বাদে একটা গাড়ি আছে, জানি।"

আর্ল বললেন, "সেটাই বোধ হয় ভালো হবে। স্টেশন তো কাছেই।"

আমি একাই রয়ে গেলাম। একটা গাছের তলায় সুবিধা মতো জায়গা পেলাম ; সেখান থেকে পুরো কেল্লাটা চোখে পড়ে।

আঁকার খাতায় সাদা পাতা খুঁজতে খুঁজতে আপনমনে বললাম, "আজ বড়ো ঝিমুনি লাগছে।" তার পরেই অবাক হয়ে দেখতে পেলাম ওঁরা দুজনে ফিরে এসেছেন।

আর্থার বললে, "তোমায় মনে করিয়ে দিতে এলাম যে, দশ মিনিট বাদে বাদে একটা করে ট্রেন আছে।"

বললাম, "যাঃ, তা কী করে হবে?"

আর্থার বললে, "আরে, চোখ বুজে কথা কইছ কেন? জেগে পড়!"

"এই গরমের জন্যে বোধ হয় ঝিমুনি লাগছে!" ভাবলুম, বেশ গুছিয়েই কথা বলছি, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। বললুম, "এবার বেশ জেগে আছি তো?"

আর্ল বেশ খতিয়ে নিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে না। তুমি কী বল, ডাক্তার? কেবল একটা চোখ খোলা!"

ব্রুনো বলে উঠল, "আর, কী নাক ডাকাচ্ছে! ও মশাই, উঠুন না!" ব্রুনো আর সিল্‌ভিতে মিলে ভারি মাথাটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে এদিক-ওদিকে নড়াতে শুরু করে দিলে, যেন কাঁধের সঙ্গে সেটার যে যোগ রয়েছে, তাতে কিছুই আসে-যায় না।

শেষ অবধি প্রফেসর চোখ চেয়ে হতভম্বের মতো আমাদের দিকে পিট্‌পিট্‌ করে তাকাতে লাগলেন। সেই আগেকার মতো সাবেকি ভদ্রতার ঢঙে আমাকে বললেন, "দয়া করে আমায় বলবেন কি, আমরা এখন কোথায় আছি—আর, আমরা কে? আমায় দিয়ে শুরু করুন।"

আমি ভাবলুম বাচ্ছাদের দিয়েই শুরু করি। বললুম, "মশাই, এ হচ্ছে সিল্‌ভি, আর এ হল ব্রুনো।"

বৃদ্ধ প্রফেসর বিড়্‌বিড়্‌ করে বললেন, "ঠিক! ওদের খুব জানি! আমার নিজেকে নিয়েই হয়েছে যত গণ্ডগোল! আমার কথা বলুন; আর, আশাকরি, সেই সঙ্গে আমি কী করে এখানে এলাম, সে কথাও বলবেন?"

আমি বললাম, "আমার তো আরো বড়ো দুশ্চিন্তা মাথায় ঢুকেছে; সেটা হল, আপনি ফিরে যাবেন কী করে?"

প্রফেসর বললেন, "ঠিক, ঠিক! ওটাই আসল সমস্যা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের সমস্যা বাদ দিলে, সমস্যা হিসেবে ওটাই সবচেয়ে আগ্রহজনক। আর নিজের জীবনের একটা অংশ হিসেবে ধরলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক!" খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করেই তক্ষুনি মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমার ব্যাপারটা—আমি যেন কে বললেন, মনে হচ্ছে—"

ব্রুনো তাঁর কানের কাছে চীৎকার করে বলে উঠল, "আপনি হচ্ছেন পফেসর! খেয়াল নেই? আপনি অচিন দেশ থেকে এসেছেন! সে এখান থেকে অনেক দূর!"

বাচ্ছা ছেলের মতো তড়াং করে প্রফেসর উঠে দাঁড়ালেন। খুব চিন্তান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, "তা হলে তো আর সময় নেই! ঐ যে, ঐ সরল কৃষকটি জলের ভারা নিয়ে চলেছে, ওকেই অনুরোধ করে দেখি, ও আমাদের রাস্তা বাতলাতে পারে কি-না।" তার পর হাঁক পাড়লেন, "ওহে সরল কৃষক! অচিন দেশের পথ বলে দেবে?"

সরল কৃষক বোকা বোকা হেসে ফিরে তাকালে। একটি কথাই শুধু বললে, "হেঁ?"

প্রফেসর আবার বললেন, "অচিন দেশের পথ!"

সরল কৃষক তার জলের ভারা নামিয়ে রেখে চিন্তা করতে লাগল। তার পর বললে, "মুই জানি না—"

প্রফেসর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বলে রাখা দরকার যে, তুমি যা কিছু বলবে, সবই তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে প্রয়োগ করা হবে।"

সরল কৃষক তৎক্ষণাৎ জলের ভারা তুলে নিয়ে বললে, "তবে মুই বলবু নি!" বলেই লম্বা-লম্বা পা ফেলে ভোঁ হয়ে গেল।

তার চলে যাওয়ার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল ওরা দুটিতে। প্রফেসর ফোঁস্ করে নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বড়ো তাড়াতাড়ি হাঁটে। কিন্তু আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। তোমাদের ইংরেজদের আইন আমি জানি। যাই হোক, আর-একজন আসছে, ওকেই জিগেস করি। এ লোকটি সরলও নয়, কৃষকও নয়—তবে তাতে কিছু আসে-যায় কি-না ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আসলে লোকটি হচ্ছেন মহামান্য এরিক লিণ্ডন। বুঝতে পারা গেল, মুরিয়েলকে বাড়ি পেঁ ৗছবার দায়িত্বটি পালন করে, বাইরে ফাঁকা হাওয়ায় রাস্তায় পায়চারি করতে করতে আরাম করে চুরুট ফুঁকতে বেরিয়েছেন।

ভেতরকার আসল যে-স্বভাবটি বাইরের কোনো আবরণেই ঢাকা পড়ে না, সেদিক থেকে বিচার করলে, আমাদের প্রফেসরমশাইটি একজন খাঁটি ভদ্রলোক—ধরন-ধারণে তিনি যতই বেখাপ্পা হন-না কেন।

তাই এরিক লিণ্ডন তাঁকে এড়িয়ে গেল না। মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে খুব আলতো করে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবতে লাগল। তার পর

বললে, "নামটা অদ্ভুত লাগছে ; কোনো সাহায্য করতে পারব বলেতো মনে হচ্ছে না।"

প্রফেসর খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে বললেন, "পরীর দেশের কাছাকাছি।"

এই কথায় এরিক লিণ্ডনের ভুরু দুটো একটু উঁচু হল ; ভদ্রতা করে চাপতে চেষ্টা করলেও, একটা মুচকি হাসি লেগে রইল তার সুন্দর মুখে। আপনমনে বিড়্‌বিড়্‌ করে বললে, "কিঞ্চিৎ ছিটিয়াল !" তার পর সিল্‌ভি আর ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে বললে, "কি গো, তোমরা ওঁকে একটু সাহায্য করতে পারছ না ?" এমন মিষ্টি করে বললে যে, ওরা দুজনে একেবারে গলে গেল। "এই ছড়ার মানেটা তো জানা আছে নিশ্চয়ই—

ব্যাবিলনে যাব, ক'মাইল পথ হবে ?
তিন-কুড়ি আর দশ মাইলের পাড়ি।
বাতির আলোয় যেতে পারব কি তবে ?
শুধু যাওয়া নয়, ফিরেও আসবে বাড়ি !"

অবাক হয়ে দেখলাম, ব্রুনো একদৌড়ে তার কাছে চলে গেল, যেন কতকালের চেনা লোক। দুহাত দিয়ে এরিকের হাত পাকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর জাঁদরেল কর্তা-ব্যক্তিটি কি-না বাচ্ছা একটা ছেলেকে হাতে করে দোল খাওয়াতে লাগল ! সিল্‌ভি ব্রুনোকে ঠ্যালা মারবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়াল—যেন ওদের ফুর্তির জন্যে সত্যি সত্যিই একটা দোলনা পাওয়া গেছে।

এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গেছি, আমি যে আছি, এরিক তা টের পাচ্ছে না। এমন-কি, প্রফেসর বা বাচ্ছাদুটোও আর আমাকে দেখতে পাচ্ছে না ; ওদের মাঝখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি—দেখছি, কিন্তু দেখা দিচ্ছি না।

প্রফেসর এতক্ষণ একটি ঘড়ি হাতে নিয়ে নিবিষ্ট মনে ব্রুনোর দোল-খাওয়ার হিসেব করছিলেন ; এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "একেবারে নির্ভুল ছন্দে দুলছে ! ঠিক পেণ্ডুলামের মতো সমান তালে তালে—একবারও ভুল করে নি !"

ব্রুনোর মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এরিক বললে, "একবারে আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষুদেবাবু, এবার ক্ষান্ত দাও। ফের যখন দেখা হবে, তখন আবার হবে। এখন বরং এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করে আজব সরণিতে নিয়ে যাও। নম্বরটা হল—'

প্রফেসরকে টানতে টানতে ব্রুনো বললে, "ঠিক খুঁজে নেব!"

ঘাড় ফিরিয়ে পেছন ফিরে প্রফেসর বললেন, "আমাদের অনেক উপকার করলেন, বড়ো বাধিত হলাম!"

টুপিটা মাথার ওপর উঁচু করে তুলে ওদের বিদায় জানিয়ে এরিক বললে, "থাক, ও আর এমন কী?"

দূর থেকে প্রফেসর জিগেস করলেন, "কত নম্বর বললেন?"

এরিক মুখের কাছে দুহাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বললে, "উনিশ-বিশ!" তার পর আর-একটা চুরুট ধরিয়ে তার হোটেলের দিকে চলল।

আমার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তার সঙ্গ নিলুম, বললুম, "ভারি সুন্দর সন্ধেটা!"

এরিক বললে, "সত্যিই সুন্দর! তা, আপনি জুটলেন কোত্থেকে? আকাশ থেকে পড়লেন না-কি?"

বললাম, "আপনি যেদিকে যাচ্ছেন, আমিও সেই দিকেই যাব।" আর কিছু বলার দরকার হল না।

"একটা চুরুট নেবেন না-কি?"

"ধন্যবাদ, ও-সব খাই না।"

"কাছাকাছি কোথাও পাগলাগারদ আছে না-কি?"

"আছে বলে তো জানি না।"

"ভেবেছিলুম আছে। এক্ষুনি একজন পাগলের সঙ্গে দেখা হল। এমন অদ্ভুত জীব খুব কমই দেখেছি!"

গল্প করতে করতে বাড়িমুখো চললুম আমরা, তার পর এরিকের হোটেলের দরজায় এসে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে বিদায় নিলুম।

একা পড়ে যেতেই, আবার আমার সারা গা ছম্‌ছমিয়ে উঠল, দেখলুম উনিশ-বিশ নম্বরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। উনিশ বিশের তফাতটা পরিষ্কার চোখে পড়ল, দেখলুম লেখা রয়েছে 'এক'।

শুনতে পেলুম, ব্রুনো বলছে, "তা হলে এটা ভুল বাড়ি?"

প্রফেসর খুশির গলায় বললেন, "না, না! ঠিক বাড়ি, তবে রাস্তাটা
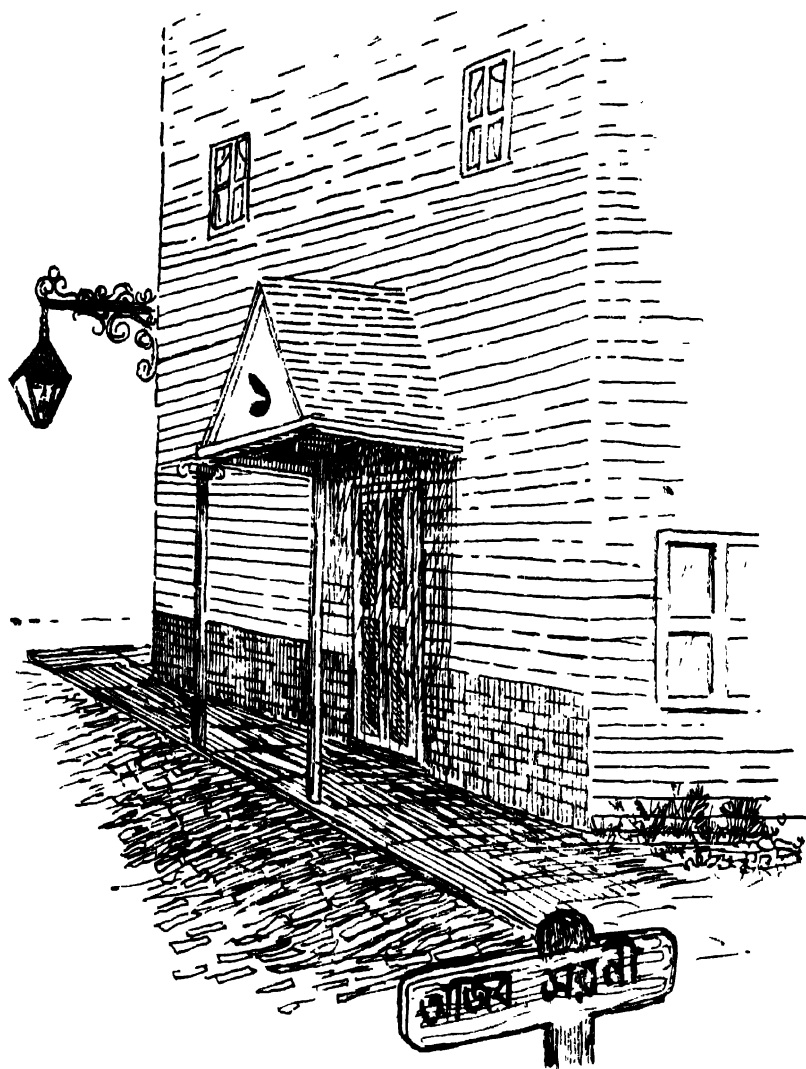
ভুল। সেই খানেই গুলিয়ে ফেলেছি! এখন, আমাদের উচিত হচ্ছে—”

ব্যস্, পালা শেষ। রাস্তা ভোঁ ভোঁ। আবার সব যেমনকার তেমনি হয়ে গেল। আর গা ছম্‌ছম্ করছে না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ফ্রিজ তৈরির কায়দা-কানন

মুরিয়েলদের সঙ্গে সপ্তাহখানেক কোনো যোগাযোগ নেই। আর্থারের সেই এক আশঙ্কা, ঘন ঘন যাতায়াত করলে খাতির কমে যাবে। রবিবার সকালে গীর্জায় যাবার সময়ে আর্থার বললে যে, একবার বাড়িটা হয়ে গেলে ভালো হয়, কারণ আর্লের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি সায় দিলাম।

'হল'-এর বাগানে এরিকের দেখা পেলাম, তার কাছেই আর্লের কুশল সংবাদ পেলাম; তিনি অবশ্য এখনো শুয়ে আছেন, মুরিয়েল দেখাশুনা করছে।

আমি জিগেস করলাম, "আমাদের সঙ্গে গীর্জায় আসবেন না-কি?"

এরিক বললে, "না। ওটা ঠিক আমার ধাতে আসে না। যখন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শিদের মধ্যে থাকি, তখন যাই, দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে যাই। গরিবদের পক্ষে চার্চ জিনিসটা খুবই কাজের। এখানে তো আমায় কেউ চেনেন না, তাই ধর্মযাজকের নীতি-উপদেশ শোনার হাত থেকে রেহাই পাবার সুযোগটা আর ছাড়ি কেন? পাড়াগাঁয়ের ধর্মপ্রচারকদের বক্তৃতা ভারি নীরস হয়!"

চার্চ থেকে ফেরার পথে দেখলাম, আর্ল আর মুরিয়েল বাগানে বসে আছেন। এরিক একটু ঘুরতে গেছে।

ধর্ম নিয়ে, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে, চার্চ আর ধর্মযাজকদের নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। এরিক এসে পড়তেই কথাবার্তার মোড় ঘুরে গেল। সাধারণ আলাপ করে আমরা উঠে পড়লাম।

মঙ্গলবার দিন আমি একাই বেড়াতে বেরুলাম, আর্থার বেশি হাঁটতে পারবে বলে মনে হল না। ঠিক হল যে, সারাদিন পড়াশুনা না-করে, বিকেলে চা খাবার সময় নাগাদ সে 'হল'-এ যাবে, সেখানে আমাদের দেখা হবে। বেড়িয়ে ফেরবার পথে স্টেশনের কাছ দিয়ে যখন আসছি, তখন বিকেলের ট্রেনটাকে দূর থেকে আসতে দেখলুম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে নামতে লাগলুম, ট্রেনটা আসুক, দেখব। কিন্তু দেখবার মতো কিছুই পেলাম না; ট্রেনের কামরাগুলো সব খালি হয়ে গেল, প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল, খেয়াল হল, পাঁচটার মধ্যে 'হল'-এ পৌঁছতে হলে এবার বেরিয়ে পড়তে হয়।

প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষে যে খাড়াই ত্যাড়াবেঁকা কাঠের সিঁড়িটা রাস্তার দিকে উঠে গেছে, সেই দিকে এগোতেই দুজন যাত্রীকে চোখে পড়ল। তারা এই ট্রেনেই এসেছে, যাত্রীও ছিল সামান্য, অথচ আগে এদের চোখে পড়ে নি, সেইটাই আশ্চর্য। একজন হল তরুণী, আর একজন খুকি; তরুণীটিকে দেখে মনে হয় পরিচারিকা হবে, কিম্বা হয়তো অভিভাবক ধাঁচের গৃহশিক্ষিকা, খুকিটিকে আগলাচ্ছে। খুকির পোশাক তো দামি বটেই, তা ছাড়া তার মুখের ডৌল দেখেও বোঝা যায়, খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে।

খুকিটির মুখের ডৌলটি ভারি মার্জিত, কিন্তু সেই সঙ্গে কোথায় যেন একটু কষ্ট সহ্য করার ছাপ রয়েছে, বেদনার ছাপ রয়েছে; মুখ দেখে মনে হয় (আমার তাই মনে হল), অনেক অসুখ, অনেক যন্ত্রণা সে হাসিমুখে পরম ধৈর্যে সয়ে গেছে। হাঁটবার জন্যে তার সঙ্গে রয়েছে ক্রাচ; সেই খাড়া সিঁড়িটার দিকে ঘাড় উঁচু করে বড়ো আকুল প্রত্যাশা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে; এই সিঁড়ি ভাঙা তার পক্ষে বড়ো কষ্টকর, তাই বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করছে।

আমরা অনেক কিছু বলি—অনেক কিছু করিও—যেগুলো আপনা থেকেই ঘটে, মনস্তত্ত্ববিদরা যাকে বলেন 'প্রতিবর্তী ক্রিয়া'। একটা উদাহরণ হল, চোখের মধ্যে কিছু উড়ে এসে পড়তে গেলেই চোখের পাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া; তেমনি আর একটা উদাহরণ

হল, হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া—"খুকিকে কোলে করে সিঁড়িটা পার করে দিতে পারি?" সাহায্য করার কথা আগে আমার মনে এসেছে, তার পর কথাটা বলেছি, তা কিন্তু নয়; আমি যে সাহায্য করতে চাই, নিজের কথাগুলো কানে যাবার আগে আমি নিজেই তা টের পাই নি, সাহায্য করতে চাওয়ার কথা বলা হয়ে যেতে, তবে টের পেলুম। পরিচারিকাটি দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালে, তার পর আবার খুকিটির দিকে চেয়ে বললে, "তুমি কি তাই চাও?" মেয়েটির মনে কিন্তু দ্বিধার কোনো লক্ষণই ছিল না, তাকে যাতে তুলে নেওয়া যায়, তার জন্যে দুহাত উঁচু করে বাড়িয়ে সে বললে, "দয়া করে তুলে নিন আমায়!" তার ছোট্টো ক্লান্তিকরুণ কচি মুখে সামান্য একটু হাসির ঝিলিক দেখলুম। খুব সাবধানে তাকে দুহাতে কোলে তুলে নিলুম, ছোটো ছোটো হাতদুটি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

মেয়েটি ভীষণ হাল্কা—এত হাল্কা যে, আমার হঠাৎ মনে হল, খালি হাতে যাওয়ার চেয়ে ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া যেন বেশি সহজ—কী অসম্ভব চিন্তা! সিঁড়ি ভেঙে ওপরে পৌঁছে দেখলুম গাড়ির চাকার কল্যাণে রাস্তাময় খানা-খন্দ হয়ে গেছে, এদিকে-ওদিকে পাথর-টাথর ছড়িয়ে রয়েছে—বেচারির চলতে অসুবিধে হবে। কিন্তু এত-সব ভাববার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "এই জায়গাটা বরং পার করে দিই।" পরিচারিকাটি বললে, "আপনাকে বড়ো বেশি কষ্ট দেওয়া হচ্ছে! সমান জায়গায় ও বেশ ভালোই হাঁটতে পারে।" এই কথায় আমার গলাকে ঘিরে সেই ছোট্টো নরম হাতদুটো সামান্য একটুখানি যেন নিবিড় হয়ে এল, আর আমি নির্দ্বিধায় বলে উঠলুম, "ওর তো কোনো ওজনই নেই। আর একটু এগিয়ে দিই। ঐদিকেই তো যাব।"

পরিচারিকাটি আর কোনো আপত্তি করলে না। একটা ছন্নছাড়া ছেলে খালি পায়ে, একটা হাতলওলা ঝাড়ু কাঁধে চাপিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমাদের সামনে এসে হঠাৎ এমন একটা ভাব দেখালে, যেন কতই রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। তার পর নোংরা মুখে একগাল হেসে বললে, "একটা আধ্লা দিন না!"

আমার কোল থেকে মেয়েটি বলে উঠল, "এক আধলাও দেবেন না,

ছেলেটা ভারি কুঁড়ে!" কথাগুলো কড়া, কিন্তু সুরটা খুব নরম। তার পর, এমন ঝর্নার মতো কলকল শব্দে হেসে উঠল, সিল্‌ভি ছাড়া তেমন হাসি আমি আর কাউকে হাসতে শুনি নি। অবাক হয়ে দেখলুম, ছোঁড়াটাও সেই হাসিতে যোগ দিলে, যেন ওদের দুজনের মধ্যে কী একটা বোঝাপড়া আছে ; তার পর, রাস্তা পার হয়ে ছুট্টে, একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খানিক বাদেই আবার যখন ফিরে এল, তখন তার হাতে আর ঝাড়ু নেই, তার বদলে চমৎকার একটা ফুলের তোড়া, কী মন্তরে যে জোগাড় করেছে, জানি না। পাক্কা ভিখিরির মতো একঘেঁয়ে করুণ সুরে বলতে লাগল, "ফুল চাই, ফুল! মাত্র আধ পেনি!"

আমার কোলের মহারানীটি পায়ের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে বলে উঠল, খবরদার কিনবেন না!" তার চোখের অবজ্ঞা আর ঘৃণার সঙ্গে যেন একটু আগ্রহও মেশান।

এবার কিন্তু আমি মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলুম, তাঁর আদেশ

অমান্য করলুম। কী সুন্দর-সুন্দর ফুল, এমন অদ্ভুত আকারের ফুল আগে কখনো দেখিই নি ; আর তাই কিনা একটা বাচ্চা মেয়ের কথায় ছেড়ে দেব! তোড়াটা কিনলুম। আধ-পেনিটা নিয়ে ছেলেটা টপ্ করে মুখের মধ্যে পুরেই একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলে, যেন দেখে নিলে, টাকা রাখার পক্ষে মুখটাকে বাক্সের মতো ব্যবহার করা যায় কি-না।

আমি ক্রমেই অবাক হচ্ছি। তোড়াটাকে নিয়ে ফুলগুলোকে এক-এক করে দেখতে লাগলুম—একটাও আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শেষকালে পরিচারিকাটিকে জিগেস করলুম, "এখানে কি আপনা থেকেই বনে-জঙ্গলে এই-সব ফুল ফোটে? আগে কখনো—" মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। পরিচারিকার কোনো পাত্তা নেই!

সিল্‌ভি শান্ত গলায় বললে, "এবার নামিয়ে দিতে পার।"

তাই করলুম। অবাক হয়ে টের পেলুম, সিল্‌ভি আর ব্রুনো বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের মতো পরম নির্ভরতায় আমার হাত ধরে দুপাশে হেঁটে চলেছে। মনে মনে শুধু ভাবলুম, 'এ কি স্বপ্ন?'

বললুম, "গেলবারে যেরকম দেখেছিলুম তার চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে গেছ তোমরা। আমার তো মনে হচ্ছে, আবার নতুন করে পরিচয় করা দরকার! তোমাদের অনেকখানিই আমার কাছে নতুন, আগে আলাপ হয় নি, তাই-না?"

সিল্‌ভি খুশির সুরে বললে, "বেশ, ভালো কথা! এই হচ্ছে ব্রুনো। কতক্ষণই-বা লাগে পরিচয় করতে, একটাই তো নাম!" চোটে-মোটে ব্রুনো বলে উঠল, "আর-একটা নাম আছে! সেটা হল, 'শ্রীযুক্ত'!"

সিল্‌ভি বললে, "ঠিক, ঠিক। ভুলে গিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত ব্রুনো!"

জিগেস করলুম, "আমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছ না-কি?"

সিল্‌ভি বললে, "বলেছিলুম না, মঙ্গলবার আসব। সাধারণ ছেলে-মেয়েদের মতো দেখতে হয়েছি, দেখ তো?"

বললুম, "একেবারে ঠিক হয়েছে। কিন্তু, সেই পরিচারিকাটি গেল কোথায়?"

ব্রুনো গম্ভীর হয়ে বললে, "মিলিয়ে গেছে!"

"তার মানে, তোমার বা সিল্‌ভির মতো ওর শক্ত দেহ ছিল না, বল?"

"না, তুমি ছুঁতেই পারতে না। ওকে ফুঁড়ে ওর ভেতর দিয়ে চলেও যেতে পারতে!"

সিল্‌ভি বললে, "একবার তোমার নজরে পড়া উচিত ছিল, আমি তো ভেবেছিলাম. তোমার চোখে পড়েছে। ব্রুনোর ধাক্কায় হঠাৎ সে বেমক্কা টেলিগ্রাফের তারের খুঁটির ওপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুভাগ হয়ে খুঁটির দুপাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তুমি তখন অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলে।"

একজন লোক দুভাগ হয়ে চলে গেল, এমন দৃশ্য জীবনে দুবার দেখা যায় না, তাই এমন সুযোগ হারালুম বলে খুব আফসোস হল।

ব্রুনো বললে, "কখন আন্দাজ করলে যে, ও সিল্‌ভি?"

বললুম, "সিল্‌ভির মতো দেখতে হবার আগে মোটেই আন্দাজ করতে পারি নি। কিন্তু ঐ পরিচারিকার ব্যাপারটা হল কী করে?"

সিল্‌ভি বললে, "ওটা ব্রুনোর কৃতিত্ব। ওকে বলে 'ফ্রিজ'।"

"তা ব্রুনো, কী করে 'ফ্লিজ' তৈরি হয়?"

ব্রুনো বললে, "পফেসার আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে গাদা-গাদা হাওয়া নিতে হয়—"

সিল্‌ভি বাধা দিয়ে বলে উঠল, "কী হচ্ছে. ব্রুনো! প্রফেসর বলতে বারণ করে দিয়েছেন না!"

জিগেস করলুম. "কিন্তু তার কথাগুলো কইলে কে?"

শুনতে পেলুম, "আপনাকে বড়ো বেশি কষ্ট দেওয়া হচ্ছে! সমান জায়গায় ও বেশ ভালোই হাঁটতে পারে।"

"কে বললে?" আমি তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগলুম; আর ব্রুনো খুব মজা পেয়ে নিজের স্বাভাবিক গলায় বললে, "আমিই তো বললুম!"

ইতিমধ্যে আমরা 'হল'-এর কাছে এসে পড়েছি দেখে ওদের বললুম, "এইখানেই আমার সেই বন্ধুরা থাকেন। চল-না, ভেতরে যাই, ওঁদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে চা খাই?"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। সিল্‌ভি বললে, "তাই চল, খুব ভালো হয় তা হলে! তোমার তো চা খাবার ইচ্ছে করছে, তাই-না ব্রুনো?" তার পর আমায় বললে, "অচিন দেশ থেকে চলে আসার পর ওর কপালে চা জোটে নি।"

ব্রুনো বললে, "সেও তো বাজে চা! ভালো মতন পাতলা চা!"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় যায়

লেডি মুরিয়েল হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করল, কিন্তু আমার সঙ্গীদের দেখে যে অবাক হল, সেটা ঢাকতে পারলে না।

আমি রীতি অনুযায়ী ওদের পরিচয় দিলুম। "লেডি মুরিয়েল এ হল সিল্‌ভি, আর এই হল ব্রুনো।"

লেডি মুরিয়েলের চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বললে, "কোনো পদবী নেই?"

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, "না, পদবী নেই।"

রসিকতা করলুম ভেবে মুরিয়েল হেসে উঠল। ওদের চুমু খাবার জন্যে হেঁট হল। ব্রুনো অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাল বাড়িয়ে দিলে, সিল্‌ভি সাগ্রহে বদলা চুমু খেলে।

মুরিয়েল আর আর্থার (আমার আগেই এসে পৌঁছেছে) ওদের চা আর কেক পরিবেশন করতে লাগল, আমি আর্লের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সময় কাটাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু জমাতে পারলাম না। তাঁকে কেমন অস্থির আর উদ্বিগ্ন দেখাতে লাগল। আচমকা একটা প্রশ্ন থেকেই বুঝলুম, তাঁর অস্বস্তির কারণটা কী।

"তোমার হাতের ফুলগুলো একবার দেবে, একটু দেখব?"

"বেশ তো, নিন-না," বলে তাঁর হাতে তোড়াটা দিলুম। জানতুম,

উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে উনি পড়াশুনা করেন; তা ছাড়া ফুলগুলো আমার খুব নতুন ধরনের আর অদ্ভুত লেগেছে বলে শুনতে চাইছিলুম, যাঁরা গাছপালা চেনেন তাঁরা কী বলেন।

ফুলগুলো দেখে তাঁর অস্থিরতা কমল বলে মনে হল না। বরং দেখতে দেখতে ক্রমশই যেন আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কয়েকটা ফুল আলাদা করে রেখে বললেন, "এগুলো সব মধ্যভারতের ফুল। ভারতেও এ-সব ফুল অত্যন্ত বিরল; পৃথিবীর আর কোথাও আমি এ-ফুল দেখি নি। এ-দুটো মেক্সিকোর ফুল—আর, এটা—" (উত্তেজনায় তখন তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে; ভালো করে দেখবার জন্যে উঠে জানলার দিকে আলোর কাছে চলে গেলেন) "—এটা হল, আমার খুব মনে হচ্ছে, ঠিকই ধরেছি—তবে, আমার কাছে ভারতের গাছপালা সম্বন্ধে একটা বই আছে—" তাক থেকে একটা বই তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। "হ্যাঁ! ঠিক! এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ! হুবহু এক! এ হচ্ছে বিষবৃক্ষের ফুল, খুব গভীর জঙ্গলে পাওয়া যায়। গাছ থেকে তুলে নিলে এর ফুল এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় যে, জঙ্গলের সীমানা পার হবার আগেই এর আকার আর রঙ দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এটা একেবারে পুরোপুরি ফুটে রয়েছে! এ-ফুল তুমি কোথায় পেলে?" আকুল আগ্রহে তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

সিল্‌ভির দিকে তাকালুম। গম্ভীরভাবে সে নিঃশব্দে তার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা করলে, তার পর ব্রুনোকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বাগানে বেরিয়ে গেল। আমি পড়লুম মহা ফাঁপরে, সাক্ষী দুজন-ই তো হাওয়া, জবাব দেব কি? বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায়ই মাথায় এল না, শেষকালে তোতলাতে তোতলাতে বললুম, "ফুলগুলো আপনাকেই দিয়ে দিই! আমার চেয়ে আপনিই বুঝবেন ভালো!"

"খুব কৃতার্থ হয়েই তোমার উপহার গ্রহণ করলুম। কিন্তু তুমি তো এখনো বললে না—" মাঝপথে এরিক লিণ্ডন এসে পড়াতে আর্লমশায়ের কথা আর শেষ হতে পারল না, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

বেশ দেখতে পেলুম, এরিক আসাতে আর্থার খুব খুশি হল না। ওর মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল; আসর থেকে সরে গেল, কথাবার্তায়

আর যোগ দিলে না। কিছুক্ষণ মুরিয়েল আর তার প্রাণবন্ত আত্মীয়, এরিকের মধ্যেই বেশিরভাগ কথাবার্তা চলতে লাগল।

এদিকে আর্থার ক্রমশই মুষড়ে পড়ছে, আর্লমশাই-ও ফুলের বিষয়ে সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা আবার তুলব তুলব করছেন, তাই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম।

"তুমি কিন্তু এখনো—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চা খেয়েছি বৈকি, ধন্যবাদ!"

তাড়াতাড়ি তাঁর কথাটা চাপা দিয়ে বললুম, "এবার কিন্তু সত্যিই আমাদের উঠতে হবে। শুভরাত্রি, লেডি মুরিয়েল!" বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, আর্ল তখনো সেই রহস্যময় তোড়াটাকে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করে চলেছেন।

মুরিয়েল আমাদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসেছিল। খুব আন্তরিক সুরে বললে, "বাবাকে যে জিনিস দিলেন, তার চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে না। গাছপালা নিয়ে চর্চা করতে ওঁর ভীষণ ভালো লাগে। উদ্ভিদতত্ত্ব বুঝি না, তবে ওঁর গাছপালার নমুনা-টমুনা সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখি। ফুলগুলো নষ্ট হয়ে যাবার আগে ব্লটিং কাগজ জোগাড় করে ঐ-সব দামী ফুলগুলোকে শুকিয়ে রাখতে হবে।"

এগিয়ে যেতে ব্রুনো বললে, "তাতে কোনো লাভ হবে না।" সে এতক্ষণ আমাদের জন্যে বাগানে অপেক্ষা করছিল।

আমি বললুম, "কেন হবে না ব্রুনো? কী করব বল, প্রশ্নের ঠ্যালা সামলাতে ফুলগুলো ওঁকে না দিয়ে উপায় ছিল না যে।"

সিল্‌ভি বললে, "তা সত্যি, উপায় ছিল না। তবে ওঁরা যখন দেখবেন, ফুলগুলো হাওয়া হয়ে গেছে, তখন খুব দুঃখ পাবেন!"

"কিন্তু কী করেই-বা হাওয়া হবে?"

"দেখ, কী করে হবে তা বলতে পারি না। তবে, হবে। তোড়াটা একটা 'ফ্লিজ', বুঝলে। ব্রুনো তৈরি করেছিল।"

শেষ কথাগুলো ফিস্‌ফিস্ করে বললে, যাতে আর্থারের কানে না যায়। তবে তার কোনো দরকার ছিল না, কারণ সিল্‌ভি বা ব্রুনোর দিকে ওর নজরই নেই, চুপচাপ আনমনে পথ চলছে; জঙ্গলের মুখে এসে ওরা বিদায় নিয়ে চলে যেতে, মনে হল, যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল।

সিল্‌ভির কথাই ফলে গেল, ফুলের তোড়াটা হাওয়া হয়ে গেল। দু-এক দিন বাদে আর্থার আর আমি 'হল'-এ গিয়ে দেখলাম, আর্ল এবং মুরিয়েল তাদের পুরনো রাত-দিনের ঝিকে নিয়ে বাগানে বেরিয়ে বসবার ঘরের জানলাগুলোর ছিটকিনি পরীক্ষা করে দেখছে।

লেডি মুরিয়েল আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, "সরেজমিনে তদন্ত করছি। অপরাধের আগেকার ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ছিল, কাজেই সেই সুবাদে ঐ ফুলগুলো সম্বন্ধে যা জানেন, সব আপনাদের বলতে হবে।"

আমি গম্ভীর হবার ভান করে বললুম, "ঘটনার সঙ্গে আমার যোগ আছে বলছেন, কিন্তু তবু, আমরা কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে রাজি নই। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করব।"

আর্থারের দিকে ফিরে মুরিয়েল বললে, "বেশ, তা হলে, দয়া করে সরকার-পক্ষের সাক্ষী হয়ে যান। রাত্তির বেলা ফুলগুলো উবে গেছে। বাড়ির কেউ যে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে নি, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে কেউ ঢুকেছিল—"

আর্ল বললেন, "কিন্তু জানলার ছিটকিনিগুলো তো আস্ত রয়েছে।"

ঝি বললে, "আপনারা যখন খেতে বসেছিলেন, নিশ্চয়ই সেই সময়ে হয়েছে ব্যাপারটা।"

আর্ল বললেন, "তাই-ই হয়েছে।" আমার দিকে ফিরে বললেন, "চোর নিশ্চয়ই তোমাকে ফুল নিয়ে ঢুকতে দেখেছে, লক্ষ্য করেছে যে, বেরবার সময় তোমার হাতে ফুল নেই। নিশ্চয়ই জানত ফুলগুলো কত দামী—অমূল্য জিনিস একেবারে!" উত্তেজনায় তাঁর গলায় আবেগ এসে গেল।

লেডি মুরিয়েল বললে, "কী করে ফুলগুলো পেলেন, তা কিছুতেই বললেন না।"

আমি আমতা আমতা করে বললুম, "কোনো-এক দিন হয়তো বলতে পারব। এখন দয়া করে রেহাই দিন।"

আর্ল হতাশ হলেন, তবু সদয়কণ্ঠে বললেন, "ঠিক আছে, আর জিগেস করব না।"

যেতে যেতে মুরিয়েল রসিকতা করে বললে, "তবে সরকার-পক্ষের সাক্ষী হিসেবে আপনি অতি যাচ্ছেতাই। কাজেই, আপনাকে দুষ্কর্মের

সহযোগী বলে রায় দেওয়া হল ; শাস্তি হল, একা ঘরে কয়েদ, আর খাওয়া বলতে শুধু রুটি আর মাখন। চিনি খান ?"

চা-টা নিয়ে ঘরের ভেতর যখন বেশ আরাম করে বসা গেল, তখন মুরিয়েল আবার বলতে শুরু করলে, "এইরকম বেপোট জায়গায় বাড়িতে চোর ঢুকেছে জানলে সত্যি বড়ো অশান্তি লাগে। ফুলগুলো যদি খাবার জিনিস হত, তা হলে নাহয় অন্য কোনো জাতের চোরের কথা ভাবতুম—"

আর্থার বললে, "তার মানে যা-কিছু হারাক, সেই এক ওজর—'বেড়ালে খেয়েছে', তাই তো ?"

মুরিয়েল বললে, "হ্যাঁ। সব চোরেরই যদি একরকম চেহারা হত, কত সুবিধে হত তা হলে ? কোনো চোর চার-পেয়ে, কোনো চোর দু-পেয়ে—ভারি গোলমেলে ব্যাপার !"

লেডি মুরিয়েল কথাটা শেষ করে আর্থারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে, আর্থার বললে, "প্রত্যেক ঘটনার মূল বা আদি কারণ—শাস্ত্রে যাকে বলে 'পরম কারণ'—সেই বিচারে ব্যাপারটার কথা আমি ভেবেছি—আমার কাছেও হেঁয়ালির মতো ঠেকেছে।"

"পরম কারণটা তা হলে—?"

"ধরুন, ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলেছে, যাকে বলে ঘটনাক্রম। সেই ঘটনাক্রমের মধ্যে প্রতিটি ঘটনা তার পরের ঘটনার কারণ হয়ে রয়েছে। সব প্রথম ঘটনাটা না-ঘটলে শেষের ঘটনাটা ঘটত না। তা হলে দেখা যাচ্ছে শেষ ঘটনাটা ঘটাবার জন্যেই ঐ অতগুলো ঘটনা ঘটল। কাজেই, বলা যেতে পারে, কোনো ঘটনাক্রমের শেষ ঘটনাটাই পরম কারণ বা আদি কারণ।"

"কিন্তু শেষের ঘটনাটা তো প্রথম ঘটনার ফল বা পরিণাম, তাই-না ? তবু সেটাকেই আপনি কারণ বলছেন ?"

আর্থার খানিকক্ষণ চিন্তা করলে, তার পর বললে, "কথাটা গোলমেলে হয়ে গেল, স্বীকার করছি। আচ্ছা, দেখুন তো এবার হয় কি-না।—শেষের ঘটনাটা প্রথম ঘটনার ফল বা পরিণাম ; তবে, সেই ঘটনাটা ঘটার যে-প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজন মেটাতেই তো প্রথম ঘটনার প্রয়োজন হয়েছে ; অর্থাৎ শেষ ঘটনার প্রয়োজনের কারণেই প্রথম ঘটনার সৃষ্টি।"

মুরিয়েল বললে, "বুঝলুম। এবার সমস্যাটার কথা বলুন।"

"ব্যাপারটা হল—বিভিন্ন মাপের প্রাণীদের যে বিশেষ ধরনের চেহারা হয়, সেটা কেন? কী উদ্দেশ্যে? যেমন সব মানুষের চেহারার একই বৈশিষ্ট্য- দুটো পা। আর এক ধরনের প্রাণী, সিংহ থেকে শুরু করে ইঁদুর পর্যন্ত, সব চার-পেয়ে। আরো এক বা দুধাপ পরের দিকে দেখুন, পোকামাকড়দের ছটা করে পা। কিন্তু, লক্ষ্য করবেন, যতই নীচের দিকের প্রাণীর দিকে তাকাবেন, দেখবেন, যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি, সেটা ক্রমশই কমছে। ভগবানের কোনো জীবকেই 'কুৎসিত' বলব না, তবে দেখবেন, ক্রমশই তাদের চেহারা বেখাপ্পা ধরনের হয়ে আসছে। আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখলে আরো এমন সব ক্ষুদে-ক্ষুদে প্রাণীদের সন্ধান পাবেন, যাদের চেহারা আরো বেখাপ্পা, আর পায়ের সংখ্যা অগণ্য!"

আর্ল বললেন, "এ ছাড়া যদি অন্য কোনো পথ থাকে, তা হলে সেটা হল—একই ধরনের চেহারা বজায় রেখে, কেবল ধাপে ধাপে আকারে ছোটো হওয়া! বৈচিত্র্য নাহয় না-ই রইল, তবু দেখা যাক কী রকম দাঁড়ায়: মানুষের কথা দিয়েই শুরু করা যাক, তার সঙ্গে সেই-সব প্রাণীর কথাও ধরা যাক, যাদের ছাড়া মানুষের চলবে না; যেমন ধর, ঘোড়া, গোরু, মোষ, ভেড়া আর কুকুর—ব্যাঙ বা মাকড়সা না-হলেও চলবে তো, না-কি, মুরিয়েল?"

লেডি মুরিয়েল পরিষ্কার শিউরে উঠল। গম্ভীর হয়ে বললে, "অনায়াসে বাদ দিতে পার!"

"বেশ, তা হলে দ্বিতীয় একজাতের মানুষ পাওয়া যাচ্ছে, যাদের উচ্চতা হবে এক হাতটাক। তার পর তৃতীয় একদল মানুষ হবে, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, চতুর্থ—এক ইঞ্চি—"

লেডি মুরিয়েল বাধা দিয়ে বললে, "তাদের তো কিন্তু সাধারণ গোরু-ভেড়ার মাংস খাবার উপায় থাকছে না!"

"ঠিক বলেছ মা, ভুলে গিয়েছিলুম। প্রত্যেক মানুষ-জাতের নিজের নিজের মাপের উপযোগী গোরু, ছাগল, মোষ-টোষ সব থাকা দরকার।"

আমি ফুট কাটলুম, "আর, তরি-তরকারি ফল-ফসলও দরকার। বিরাট-বিরাট ঘাস মাথা ছাড়িয়ে আকাশে লক্‌লক্ করলে এক ইঞ্চি মাপের গোরুর কী লাভ হবে বলুন?"

"ঠিক কথা ব্যাপারটা হবে, মাঠের মধ্যে মাঠ। এক ইঞ্চি গোরুর কাছে সাধারণ মাপের ঘাসগুলো হবে তালগাছের বন; আর ঐ লম্বা ঘাসের গোড়ার গোড়ায় খুব ক্ষুদে-ক্ষুদে ঘাস কার্পেটের মতো বিছিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, আমাদের পরিকল্পনাটা উতরে যাবে মনে হচ্ছে। আমাদের ঠিক নীচের ধাপের প্রাণীদের সঙ্গে দেখা-শোনা হলে, বেশ ভালোই লাগবে। এক ইঞ্চি মাপের বুল-ডগগুলো কী মিষ্টি দেখতে হবে! মুরিয়েলও বোধ হয় আর বুল-ডগ দেখে ছুটে পালাবে না!"

লেডি মুরিয়েল বললে, "আর, ধাপে ধাপে বড়ো হবে এমন ব্যবস্থা হবে না বুঝি? একশো গজ লম্বা হতে কেমন লাগবে কে-জানে! হাতিকে ধরে কাগজ-চাপা বানাও, কুমিরকে ধরে কাঁচি কর!"

আমি জিগেস করলুম, "এই যে সব বিভিন্ন জাতের মানুষ হল, এদের মধ্যে কি কথাবার্তা, খবরাখবর, এ-সবের আদান-প্রদান থাকবে? ওরা কি যুদ্ধ-টুদ্ধ করবে; বা ধরুন, সন্ধি বা চুক্তি-টুক্তিও হবে?"

"যুদ্ধটা বাদ দিতে হবে। এক ঘুষিতে যেখানে একটা পুরো জাত ধ্বংস হতে পারে, তাকে ঠিক সমানে-সমানে যুদ্ধ বলা যায় না। আমাদের ঐ আদর্শ জগতে কেবল মনের বিরোধ থাকতে পারে—কারণ আকারে যে যাই হোক, মানসিক ক্ষমতা কিন্তু সকলকেই দিতে হবে। আকারে যারা সবচেয়ে ছোটো, জ্ঞান-বুদ্ধির দৌড় তাদেরই হবে সবচেয়ে বেশি—এইরকম একটা নিয়ম করলেই বোধ হয় সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত হবে!"

লেডি মুরিয়েল বললে, "তার মানে, বলতে চাও, ঐ বাঁটকুলগুলো আমার সঙ্গে তর্ক করবে?"

আর্ল বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! যে তর্ক করছে, তার চেহারার মাপের ওপর তো আর যুক্তির জোর নির্ভর করে না!"

মাথা ঝাঁকিয়ে মুরিয়েল বললে, "ছ ইঞ্চির কম মাপের কারও সঙ্গে আমি তর্কই করব না! কান ধরে কাজ করিয়ে নেব তাকে দিয়ে!"

আর্থার এতক্ষণ হাসিমুখে এই-সব উদ্ভট আলোচনা শুনছিল, এবার বললে, "কী কাজে লাগাবেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মুরিয়েল জবাব দিলে, "বাহারে সেলাইয়ের কাজ করাব। কী সূক্ষ্ম সব সেলাইয়ের নক্সা হবে বলুন তো?"

আমি বললাম, "সেলাইয়ে যদি ভুলও করে, তুমি তাই নিয়ে বচসা

করতে পারবে না। কেন করতে পারবে না, বলা শক্ত, তবে, আমি জানি করতে পারবে না।"

লেডি মুরিয়েল বললে, "কারণ হল, তাতে মান থাকবে না ; মান খোয়াতে তো আর কেউ চায় না!"

আর্থার সায় দিয়ে বলে উঠল, "ঠিকই তো, কেউই চায় না। যেমন, ধর না, আলুর সঙ্গে কি তর্ক করা যায় ? মান থাকে না!"

আমি বললুম, "কী জানি, ঠিক মানতে পারলুম না।"

লেডি মুরিয়েল বললে, "বেশ, তাই যদি না-হয়, তা হলে আপনিই বলুন, কারণটা কী ?"

প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু কিছুই যেন বুঝতে পারলুম না ; মৌমাছিদের অবিশ্রান্ত গুন্‌গুন্ শব্দে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল, আর, ঝিম-ধরা হাওয়ার ছোঁয়ায় আমার ভাবনাগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠবার আগেই একে একে যেন ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারলুম, "সেটা নির্ভর করবে আলুর মাপের.ওপর।"

বুঝলুম, যা চাইছিলুম, আমার কথাটা তেমন বুদ্ধিমানের মতো শোনাল না। কিন্তু লেডি মুরিয়েল কথাটাকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়ে বললে, "তা-ই যদি হয়, সে-ক্ষেত্রে—" কিন্তু এই অবধি বলেই চমকে উঠে কান পেতে কী যেন শুনলে ; বললে, "শুনতে পাচ্ছেন না ? ও কাঁদছে। যে করে হোক, ওর কাছে যাওয়া দরকার।"

আর, আমি মনে মনে ভাবলুম, 'ভালো রে ভালো ! আমি কোথায় ভাবছি লেডি মুরিয়েল কথা বলছে, অথচ এযে দেখছি সিল্‌ভি !' আবার একবার কিছু একটা বলবার আপ্রাণ চেষ্টা করলুম, যার কিছু মানে হয়। বললুম, "আলুর মাপ নিয়ে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে না-কি ?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

গজদন্তের দরজা দিয়ে

সিল্‌ভি বললে, "ঠিক জানি না। একটু থামুন তো, ভেবে দেখি। আমার পক্ষে ওখানে যাওয়াটা শক্ত কিছু নয়, কিন্তু আপনাকেও যে সঙ্গে নিতে চাই।"

বললুম, "তা তোমার সঙ্গেই যাই চল; তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারব নিশ্চয়ই।"

সিল্‌ভি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল, "কী বাজে বকছ একটুও হাঁটতে পারবে না। তুমি তো চিৎপাত খেয়ে শুয়ে আছ। এ-সব তুমি বুঝবে না।"

আবার বললুম, "তুমি যদি হাঁটতে পার, আমিই-বা পারব না কেন?" বলে কয়েক পা হেঁটে দেখতে গেলুম, কিন্তু যতই চেষ্টা করি-না কেন, আমি যতই তাড়াতাড়ি পা ফেলি, রাস্তাটাও তত তাড়াতাড়ি পেছন দিকে সরে সরে যায়, একটুও এগোতে পারি না। সিল্‌ভি আবার হেসে উঠল।

"দেখলে তো, বললুম! শূন্যে পা নাড়াচ্ছ, যেন সত্যিই হাঁটছ, কী অদ্ভুত যে তোমায় দেখাচ্ছে, ধারণা করতে পারবে না। দাঁড়াও, প্রফেসরকে জিগেস করে দেখি, কী করা উচিত হবে।" প্রফেসরের পড়বার ঘরের দরজায় টোকা মারতে লাগল।

দরজা খুলে গেল, প্রফেসর বাইরে উঁকি মারলেন। জিগেস করলেন,

"এক্ষুনি কার একটা কান্নার আওয়াজ কানে এল। কোন প্রাণীর? মানুষের কি?"

সিল্‌ভি বললে, "ছোটো ছেলের।"

"ওর পেছনে লেগেছিলে তো!"

সিল্‌ভি খুব আন্তরিকভাবে বললে, "মোটেই না, আমি কক্ষনোও ওর পেছনে লাগি না।"

"বেশ, তা হলে অন্য প্রফেসরের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।" বলে তিনি ঘরের ভেতর চলে গেলেন; শুনলুম তিনি ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন, "ছোটো মানুষ-প্রাণী—বললে তো তার পেছনে লাগে নি—ঐ, যে-ধরনের প্রাণীকে ছোটো ছেলে বলা হয় আর-কি—"

নতুন একটা গলা পেলুম, "ওকে জিগেস কর, কোন ছেলে।" প্রফেসর আবার বাইরে এলেন।

"যার পেছনে তুমি লাগ নি, সে কোন ছেলে?"

সিল্‌ভি আমার দিকে তাকালে, চোখদুটো ঝিক্‌মিক্ করছে। "আমার মিষ্টি দাদুরে!" বলে প্রফেসরকে চুমু খাবার জন্যে ডিঙি মেরে উঁচু হল, প্রফেসরও সামনে ঝুঁকে পড়ে নিচু হলেন। "আমাকে কী ধাঁধায় যে ফেলেন আপনি! কত ছেলের পেছনেই তো আমি লাগি নি!"

প্রফেসর আবার তাঁর জুড়িদারের কাছে ফিরে গেলেন। এবার শোনা গেল, "ওকে বল তাদের সব এখানে নিয়ে আসতে—সব্বাইকে।"

প্রফেসর ফিরে আসতেই সিল্‌ভি বলে উঠল, "আমি পারব না, আমি ডেকে আনব না। যে কাঁদছে, সে হল ব্রুনো, আর সে আমার ভাই। আমরা দুজনেই ওর কাছে যেতে চাই; অথচ এ হাঁটতে পারে না, জানেন; আসলে ও—ও স্বপ্ন দেখছে, বুঝলেন (এটা ফিস্‌ফিস্ করে বললে, যাতে শুনে আমি দুঃখ না-পাই) দয়া করে আমাদের হাতির দাঁতের দরজাটা দিয়ে যেতে দিন।"

"ওঁকে জিগেস করি" বলে প্রফেসর আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বললেন, "উনি বললেন, তোমরা যেতে পার। আমার সঙ্গে এস, পা টিপে টিপে চল।"

পা টিপে টিপে না-হাঁটাই তখন আমার পক্ষে মুস্কিলের ব্যাপার। সিল্‌ভি যখন পড়ার ঘরের মধ্যে দিয়ে আমায় হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগল, তখন মাটিতে পা ঠেকাতেই যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

হাতির দাঁতের দরজার চাবি খোলবার জন্যে প্রফেসর আমাদের ছেড়ে এগিয়ে গেছেন। আমাদের দরজা দিয়ে বাইরে বার করে দিয়ে দরজায় আবার চাবি লাগাবার ফাঁকে অন্য প্রফেসরকে দেখলুম, আমাদের দিকে পেছন করে বসে বসে পড়ছেন। দরজা বন্ধ হতেই সামনে দেখলুম দুহাতে মুখ ঢেকে ব্রুনো আকুল হয়ে কাঁদছে।

দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে সিল্‌ভি বললে, "কী হয়েছে, মানিক ?"

ক্ষুদুবাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "খুব ভালো মতন লাগিয়ে ফেলেছি নিজে নিজে !"

সিল্‌ভি বললে, "আহা রে, বেচারি ! কিন্তু কাণ্ডটা বাধালে কী করে ?"

ব্রুনো বললে, "কেন বাধাব না, তুমিই শুধু করতে পার না-কি !"

ব্রুনো যখন তর্ক করতে শুরু করেছে, তখন অবস্থাটা ভালোর দিকেই যাচ্ছে, বলতে হবে। বললুম, "কী হয়েছিল, খুলে বল তো সব !"

ব্রুনো বলতে লাগল, "হড়কে গিয়ে আমার পাটা মাথা গুঁজড়ে—"

সিল্‌ভি বললে, "পায়ের মাথা হয় না ব্রুনো !" কিন্তু ব্রুনোকে থামায় কার সাধ্যি।

"আমি পাড় থেকে পা ছিপ্‌লে নীচে পড়ে গেলুম। একটা পাথরের গায়ে হুড়মি খেলুম। একটা পাথর আমার পায়ে এসে লাগল। একটা মৌমাছির গায়ে পা পড়ল। মৌমাছিটা আঙুলে হুল ফুটিয়ে দিলে !" বেচারি ব্রুনো আবার কেঁদে ফেললে। অতগুলো দুর্ভোগ কি ওর সয় ? দুর্দশার বর্ণনাটা চরমে নিয়ে এসে ব্রুনো বললে, "মৌমাছিটা তো জানত যে, ইচ্ছে করে মাড়াই নি !"

আমি খুব কড়া গলায় বললুম, "মৌমাছিটার লজ্জা করে না ! আর, সিল্‌ভি ব্রুনোকে জড়িয়ে ধরে বার বার চুমু খেতে লাগল, ব্রুনোর চোখের জল শুকিয়ে গেল।

ব্রুনো বললে, "আমার আঙুলে এখন আর হুল ফুটছে না। এত সব পাথরই-বা থাকে কেন ? মশাইবাবু তুমি জান, কেন পাথর থাকে ?"

সিল্‌ভি ধমকের সুরে বললে, "ব্রুনো ! 'মশাই' আর 'বাবু' একসঙ্গে বলতে হয় না ! কী বলেছিলুম, মনে নেই !"

"তুমি বলেছিলে, যখন ওঁর কথা বলব, তখন বলব 'মশাই', আর যখন ওঁর সঙ্গে কথা বলব, তখন বলব 'বাবু' !"

"এই দেখ তুমি তার একটাও মানছ না!"

"কিন্তু আমি দুটোই করছি, কুমারী খুঁৎখুতুনী!" ব্রুনো বিজয়গর্বে বলে উঠল, "আমি ওঁর কথাও বলতে চাই, আবার ওঁর সঙ্গেও কথা বলতে চাই। তাই তো বলছি, 'মশাইবাবু'!"

আমি বললুম, "ঠিক আছে ব্রুনো!"

ব্রুনো বললে, "ঠিক-ই তো আছে। সিল্‌ভিটা কিছু জানে না!"

সিল্‌ভি এমন ভুরু কোঁচকালে যে, তার বড়ো-বড়ো চোখদুটো প্রায় ঢাকাই পড়ে গেল। বললে, "এরকম দুর্বিনীত ছেলে হয় না!"

ব্রুনো চট্‌পট্ জবাব দিলে, "এরকম মূর্খু মেয়েও আর হয় না। এস, ডিঙুল্‌ডাম্ ফুল তুলি।" তার পর বেশ জোরে জোরে অথচ চুপি-চুপি বলার ঢঙে জানালে, "ঐ একটা কাজই ও ভালো পারে!"

"কিন্তু তুমি 'ডিঙুল্‌ডাম্' বলছ কেন, ব্রুনো। আসলে কথাটা হল 'ড্যাণ্ডিলাইয়্যান'।"

সিল্‌ভি হেসে উঠে বললে, "ওরকম বলবেই তো। দিন-রাত যা লাফায়!"

ব্রুনো সায় দিয়ে বললে, "তাই-ই তো! সিল্‌ভি আমায় এক-একটা কথা শেখায়, তার পর যেই আমি লাফাই, আর আমার মগজের মধ্যে কথাগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়!"

এমন ভাব দেখালুম, যেন ওর এই ব্যাখ্যা শুনে আমার সব সংশয় ঘুচে গেছে। "কিন্তু, কই, আমায় গোটাকতক ডিঙুল্‌ডাম্ তুলে দেবে তো, না-কি?"

ব্রুনো বলে উঠল, "নিশ্চয়ই দেব! এস তো সিল্‌ভি!" তার পর, হরিণের মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে লাফাতে লাফাতে মাঠের ওপর দিয়ে ছুট লাগাল দুটিতে।

প্রফেসরকে বললুম, "অচিন দেশের রাস্তা তা হলে খুঁজে পান নি?"

প্রফেসর বললেন, "হ্যাঁ, পেয়েছিলুম তো। আজব সরণি খুঁজে পাই নি বটে, তবে অন্য একটা রাস্তার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলুম। তার পর থেকে তো কতবার এখান-ওখান করতে হল। নতুন যে মুদ্রা-আইন হল, তার রচয়িতা হিসেবে আমায় নির্বাচনের সময় উপস্থিত থাকতে হল, বুঝলেন তো! সম্রাট মহানুভব, তাই তিনি চাইলেন যে, কৃতিত্বটা যেন আমিই পাই। সম্রাট যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার কথাগুলো

পরিষ্কার মনে আছে। বলেছিলেন, 'যা হবার, তাই হোক ; যদি দেখা যায়, ওয়ার্ডেন জীবিত আছেন, তা হলে তোমরাই সাক্ষী থাকবে যে, মুদ্রার যে বদল ঘটান হল, সেটা প্রফেসরের কীর্তি, আমার নয়!' জীবনে আর কখনো নিজেকে এত গৌরবান্বিত মনে হয় নি!" সেই গৌরবের কথা মনে পড়ে যেতে, তাঁর দুগাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। অবশ্য ব্যাপারটা যে ওঁর পক্ষে খুব শুভ হয় নি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

"ওয়ার্ডেন বেঁচে নেই বলে মনে করা হচ্ছে না-কি?"

"দেখুন, তাই মনে করা হচ্ছে বটে, আমি কিন্তু মোটেই বিশ্বাস করছি না। প্রমাণ যা পাওয়া গেছে, খুবই সামান্য, সবই শোনা-কথা। একটা ভবঘুরে সঙ, তার সঙ্গে একটা নাচিয়ে ভাল্লুক ; (একদিন দুটোতে প্রাসাদেও ঢুকে পড়েছিল) সে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে, তারা না-কি পরীর দেশ থেকে আসছে, আর ওয়ার্ডেন না-কি সেখানেই মারা গেছেন। ভাইস-ওয়ার্ডেনকে দিয়ে তাকে জেরা করাতে চাইলুম, কিন্তু এমনই কপাল যে, যখনই সেই সঙটা আর ভাল্লুকটা আসে, ঠিক তখনই ভাইস-ওয়ার্ডেন আর দেবী-সাহেবা বেড়াতে বেরিয়ে যান। হ্যাঁ, ওয়ার্ডেন মারা গেছেন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে!" বেচারি বৃদ্ধের চোখ দিয়ে আরো বেশি করে জলের ধারা নেমে এল।

"নতুন মুদ্রা-আইনটা কী?"

প্রফেসরের মুখ-চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, "ব্যাপারটা শুরু করলেন সম্রাট নিজেই। নতুন সরকারকে যাতে সবাই পছন্দ করে, তাই তিনি চাইলেন যে, দেশের সবাই আগের চেয়ে ডবল বড়োলোক হয়ে যায়। তবে, তাতে যত অর্থ দরকার, রাজকোষে তত ছিল না। তখন আমিই পরামর্শ দিলুম যে অচিন দেশে যত মুদ্রা আর নোট আছে তার মূল্য দ্বিগুণ করে দেওয়া হোক। এর চেয়ে সোজা-সরল উপায় আর কিছু হতে পারে না। ভেবে অবাক লাগে যে, আগে এটা কারও মাথাতেই আসে নি। চারিদিকে সে যে কী আনন্দের ঢেউ, আপনি কক্ষনো দেখেন নি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দোকানে-দোকানে ভিড় লেগেই আছে। সব্বাই সব কিছু কিনছে!"

"আর, আপনাকে সম্মানটা দেখান হল কী ভাবে?"

প্রফেসরের হাসি-খুশি মুখটা হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল। করুণ

গলায় বললেন, "নির্বাচন হয়ে যাবার পর ওরা কাণ্ডটা করলে। ভালো ভেবেই করেছিল—কিন্তু আমার পছন্দ হয় নি! এমনভাবে আমার চারিদিকে নিশেন ওড়াতে লাগল যে, চোখে অন্ধকার দেখলুম; এমন ঘণ্টা বাজাতে লাগল যে, কানে তালা লেগে গেল; রাস্তায় এমন পুরু করে ফুল ছড়িয়ে দিলে যে, পথ হারিয়ে ফেললুম!" বৃদ্ধ দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লেন।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললুম, "অচিন দেশ এখান থেকে কত দূর?"

"প্রায় পাঁচ দিনের পথ। তবে মাঝে মাঝে যাওয়া নেহাত-ই দরকার হয়ে পড়ে। দরবারের প্রফেসর হিসেবে সব সময়ে রাজকুমার আগ্‌গাগের দিকে আমায় নজর রাখতে হয়। এক ঘণ্টার জন্যেও যদি নজর-ছাড়া করি, সাম্রাজ্ঞী ভীষণ চটে যান।"

"কিন্তু যখনই এখানে আসেন, দশ দিন অন্তত কামাই হয় তো বটেই?"

"তার চেয়ে বেশি; কখনো কখনো পনেরো দিন লেগে যায়। তবে, যখন ওখান থেকে বেরোই, সেই সময়টা একেবারে নির্ভুলভাবে টুকে রাখি, যাতে ফিরে গিয়ে সরকারি সময়টাকে একেবারে সেকেণ্ড মিলিয়ে ঠিক সেই সময়ে পিছিয়ে দিতে পারি!"

বললুম, "কিছু মনে করবেন না, ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

কিছু না-বলে প্রফেসর পকেট থেকে একটা চৌকো সোনার ঘড়ি বার করলেন, তার ছটা-আটটা কাঁটা। দেখাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আমার সামনে ধরে বললেন, "এটা হল অচিন দেশের ঘড়ি—"

"আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"—বিশেষত্ব হল, সময় অনুযায়ী এ-ঘড়ি চলে না, বরং এই ঘড়ি অনুযায়ী সময় চলে। এবার আমার কথা বুঝতে পেরেছেন, আশা করি?"

আমি মন্তব্য করলুম, "এ-ধরনের ঘড়ির কথা আমি জানি।"

"অবশ্য, অন্য ঘড়ির মতো সাধারণ তালেই চলে। কেবল সময়কে এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। কাজেই, ঘড়ির কাঁটা ঘোরান মানেই, সময় বদলে দেওয়া। আসল সময়কে ছাড়িয়ে গিয়ে কাঁটা এগিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব নয়, তবে কাঁটা ঘুরিয়ে সময়কে এক মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া যায়—এক মাস, তার বেশি নয়। তখন, পুরনো ঘটনাগুলোই আবার ঘটতে থাকবে। আগের অভিজ্ঞতায় যদি ঘটনা-গুলোকে একটু বদলে দেওয়া দরকার মনে হয়, তাও দেওয়া যাবে।"

মনে মনে ভাবলুম, 'বাস্তব জীবনে এ-ঘড়ি কী আশীর্বাদই না বয়ে আনতে পারে! মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাওয়া কত কথা না-বলা রাখা যায় —হঠাৎ আবেগে করে-ফেলা কত কাজ না-করা রাখতে পারি!—' "সময় পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা একবার করে দেখান যেতে পারে, তা হলে একটু দেখতুম?"

ভালোমানুষ প্রফেসর বলে উঠলেন, "স্বচ্ছন্দে!" ঘড়িতে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঘড়ির কাঁটা এইখানে আনলে, কালের ইতিহাস পনেরো মিনিট পিছিয়ে যাবে!"

উত্তেজনায় শিউরে উঠতে উঠতে আমি দেখলুম, প্রফেসর নির্দিষ্ট জায়গায় কাঁটাটাকে পিছিয়ে আনলেন। কানে এল:

"খুব ভালো মতন লাগিয়ে ফেলেছি নিজে নিজে!"

হঠাৎ তীরের মতো কানে এসে বিঁধল কথাগুলো, আর আমি চমকানি যতই ঢাকতে চাই-না কেন, কে কথা বললে দেখবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালুম।

হ্যাঁ, ঐ তো ব্রুনো দাঁড়িয়ে আছে, আর তার দুগাল বেয়ে জলের

ধারা—ঠিক পনেরো মিনিট আগে যেমন দেখেছিলাম ; আর, সিল্‌ভিও তেমনি রয়েছে ব্রুনোর গলা জড়িয়ে ধরে।

বেচারা ক্ষুদুবাবুকে আবার সেই-সব যন্ত্রণা সইতে হয়, সেটা ভালো লাগল না, তাই তাড়াতাড়ি কাঁটাদুটোকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রফেসরকে অনুরোধ করলুম। পরক্ষণেই সিল্‌ভি আর ব্রুনো সেখান থেকে মিলিয়ে গেল, খুব দূরে দেখতে পেলুম ওরা 'ডিগুল্‌ডাম্' তুলছে।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠলুম, "অপূর্ব, সত্যিই অদ্ভুত!"

প্রফেসর বললেন, "এর আরো একটা গুণ আছে, সেটা আরো অদ্ভুত। এই ছোট্টো উঁচু গোঁজের মতো জিনিসটা দেখছেন। ওটা যদি ভেতর দিকে চাপেন, তা হলে আগামী এক ঘণ্টার সমস্ত ঘটনা উল্টো দিক থেকে ঘটতে দেখতে পাবেন। এখন করে দেখার দরকার নেই। কয়েক দিনের জন্যে ঘড়িটা আপনাকে রাখতে দিচ্ছি, খুশিমতো ঘরিয়ে-ফিরিয়ে নানারকম মজা করতে পারবেন।"

তিনি ঘড়িটা আমায় দিলেন। নিয়ে বললুম, "অনেক ধন্যবাদ। আমি খুব যত্ন করে রাখব। আরে! ওরা দুটিতে আবার এসে হাজির হয়েছে যে!"

আমার হাতে ফুল দিয়ে ব্রুনো বললে, "মাত্র ছটা ডিগুল্‌ডাম্ জোগাড় হল! কারণ, সিল্‌ভি বললে ফেরার সময় হয়ে গেছে। আর, এই একটা বড়ো ব্ল্যাকবেরি নাও। দুটোর বেশি পেলুম না!"

বললুম, "ধন্যবাদ, খুব সুন্দর ব্ল্যাকবেরি। অন্যটা নিশ্চয়ই তুমিই খেয়েছ, ব্রুনো?"

ব্রুনো আনমনে বললে, "না, আমি খাই নি। ডিগুল্‌ডামগুলো সুন্দর না, মশাইবাবু?"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর। কিন্তু তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন গো বাবু?"

কাতরকণ্ঠে ব্রুনো বললে, "পায়ে আবার লাগছে!" বলে মাটিতে বসে পড়ে পায়ে হাত বোলাতে লাগল।

প্রফেসর দুহাতে মাথাটা চেপে ধরেছিলেন। ঐ ভঙ্গির মানে আমি জানি ; উনি মন ঠিক করতে পারছেন না। বললেন, "একটু বিশ্রাম নাও। তাতে ভালোও হতে পারে, খারাপের দিকেও যেতে পারে।

হাতের কাছে যদি কয়েকটা ওষুধ-পত্র থাকত !" শুধু আমাকে শুনিয়ে বললেন, "জানেন তো, আমি হচ্ছি দরবারের বদ্যি ।"

ব্রুনোর গলা জড়িয়ে ধরে সিল্‌ভি চুপিচুপি বললে, "তোমার জন্যে কয়েকটা ব্ল্যাকবেরি জোগাড় করে আনব, মানিক ?" চুমু দিয়ে সে ব্রুনোর গালের একফোঁটা জল মুছে নিলে ।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো চনমনে হয়ে উঠল। উদ্ভাসিত মুখে বললে, "খুব ভালো কথা ! আমার মনে হচ্ছে, আমার পায়ের ব্যথা তা হলে একদম না হয়ে যাবে, যদি একটা ব্ল্যাকবেরি খেতে পাই—দুটো কি তিনটে ব্ল্যাকবেরি—ছটা বা সাতটা ব্ল্যাকবেরি খেতে পাই—"

সিল্‌ভি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আমাকে আড়ালে বললে, "দশ বা কুড়ির ঘরে যাবার আগে তাড়াতাড়ি রওনা দিই !"

বললুম, "তোমার সঙ্গে যাই, চল-না। তোমার চেয়ে উঁচুতে আমার হাত যাবে ।"

আমার হাতের মধ্যে হাত গুঁজে সিল্‌ভি বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন-না !" আমরা দুজনে চলতে শুরু করলুম ।

একটা বেশ লম্বা ঝোপের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলুম, কারণ, দেখে মনে হল ওখানে ব্ল্যাকবেরি পাবার আশা আছে। যেতে যেতে সিল্‌ভি বললে, "ব্রুনো ব্ল্যাকবেরি খুব ভালোবাসে, অথচ, কী মিষ্টি ছেলে—ব্ল্যাকবেরিটা আমাকে না-খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না !"

"ও, তা হলে ওটা তুমিই খেয়েছ ? ব্রুনো আমায় কথাটা বলতে চায় নি মনে হল ।"

"না ; আমিও লক্ষ্য করেছি, ও বলতে চায় নি। পাছে কেউ ওর সুখ্যাতি করে, ওর সেই ভয়। কিন্তু, সত্যিই ও আমায় না-খাইয়ে ছাড়ল না ! ও নিজে খেলে আমি—আরে, ওটা কী ?" একটু যেন ভয় পেয়ে সিল্‌ভি আমার হাত আঁকড়ে ধরলে। জঙ্গলে ঢোকবার মুখে একটা খরগোস কাত হয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, তাই দেখেই সিল্‌ভি চমকে গেছে ।

"একটা খরগোস-মা ; বোধ হয় ঘুমচ্ছে ।"

ভালো করে দেখবার জন্যে একটু এগিয়ে গিয়ে সিল্‌ভি ভয়ে ভয়ে বললে, "না, ঘুমচ্ছে না তো ; চোখ খোলা রয়েছে।" আতঙ্কে ওর গলাটা চাপা ফিস্‌ফিসানির মতো শুনতে লাগল : "ও কি—ও কি মরে গেছে তা হলে ?"

হেঁট হয়ে ভালো করে দেখে বললুম, "হ্যাঁ, মরেই গেছে। বেচারি! আমি জানি, কালকে শিকারির দল কুকুরের পাল নিয়ে বেরিয়েছিল। খরগোসটা সেই শিকারি-কুকুরদের তাড়া খেয়েই মরেছে। কিন্তু কুকুরগুলো এই খরগোসটাকে ছোঁয় নি পর্যন্ত। বোধ হয় অন্য কোনো খরগোস দেখতে পেয়ে সেইদিকেই তাড়া করে গেছে; এদিকে ভয়ে, আর দৌড়ের ধকল সহ্য করতে না-পেরে, এ-বেচারা এইখানেই মরে পড়ে আছে।"

খুব নিচু গলায় আর ধীরে ধীরে সিল্‌ভি বললে, "তাড়া খেয়ে মরেছে? আমি ভাবতাম, শিকার হল একটা আমোদের ব্যাপার—খেলার মতো। ব্রুনোতে আমাতে শামুক ধরতে বেরই; যখন ধরি, তখন কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি করি না তো!"

হাত ধরাধরি করে দুজনে মরা খরগোসটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সিল্‌ভিকে বোঝাবার জন্যে বললাম, "বাঘ, সিংহ, এই-সব হিংস্র বন্য প্রাণীর কথা জান তো?" সিল্‌ভি ঘাড় নাড়লে। "তা, এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে মানুষকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওদের মারতে হয়, বুঝলে।"

সিল্‌ভি বললে, "হ্যাঁ, আমাকে যদি কেউ মেরে ফেলতে চায়, ক্ষমতা থাকলে ব্রুনো নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলত।"

"এখন, তাই থেকে মানুষরা—শিকারিরা—এই-সব জানোয়ার শিকার করতে আনন্দ পায়: ছোটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, বিপদের ভয়—এ-সব তাদের ভালো লাগে।"

সিল্‌ভি বললে, "হ্যাঁ, ব্রুনোও বিপদ ভালোবাসে।"

"এখন, ব্যাপার হচ্ছে এ-দেশে বাঘ বা সিংহ নেই—ছাড়া অবস্থায় কোথাও নেই; তাই এখানকার মানুষ অন্য প্রাণীকে শিকার করে, বুঝলে তো?" ভেবেছিলুম এতেই ও প্রবোধ মানবে, আর কোনো প্রশ্ন তুলবে না! কিন্তু তা হল না।

সিল্‌ভি ভাবতে ভাবতে বললে, "ওরা খ্যাঁক্‌শিয়াল শিকার করে। বোধ হয় মেরেও ফেলে। খ্যাঁক্‌শিয়াল খুব হিংস্র। স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, মানুষ ওদের ভালোবাসে না। খরগোস কি হিংস্র?"

বললুম, "না। খরগোস ভারি মিষ্টি, নরম আর নিরীহ জানোয়ার—ভেড়ার মতোই শান্তশিষ্ট!"

"মানুষ যদি খরগোস ভালোই বাসে, তা হলে কেন—কেন—" বলতে বলতে ওর গলা কেঁপে গেল, চোখ দুটিতে জল ছাপিয়ে উঠল।

"তা হলে নিশ্চয়ই ভালোবাসে না—এ ছাড়া তো আর কিছু বলবার নেই, মা!"

সিল্‌ভি বললে, "ছোটো ছেলেমেয়েরা সব্বাই ভালোবাসে, মহিলারা সব্বাই ভালোবাসেন।"

"কী বলব বল, মহিলারাও মাঝে মাঝে খরগোস শিকার করতে বের হন।"

সিল্‌ভি শিউরে উঠে কাতরকণ্ঠে বললে, "না, না, মহিলারা নন! লেডি মুরিয়েল নন।"

"না, উনি খরগোস শিকার করেন না, এ আমি ঠিক জানি—কিন্তু, এখানে আর তোমার থাকা ঠিক হচ্ছে না; সইতে পারবে না। চল, বরং খুঁজে দেখি—"

কিন্তু সিল্‌ভি তখনো আরো অনেক জবাব শুনতে চায়। হাতের মধ্যে হাত রেখে, সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে অস্ফুটে গম্ভীর স্বরে সে চূড়ান্ত প্রশ্নটি উচ্চারণ করলে, "ভগবান কি খরগোসদের ভালোবাসেন?"

বললাম, "বাসেন! আমি জানি, নিশ্চয় তিনি ভালোবাসেন! সমস্ত প্রাণীকে তিনি ভালোবাসেন। এমন-কি, পাপী মানুষকেও। তা হলে জীবজন্তুদের আরো কত বেশি ভালোবাসবেন, কারণ তারা তো পাপ করতে জানে না!"

সিল্‌ভি বললে, " 'পাপ' বলতে কী বোঝায়, আমি জানি না।" আমি বোঝাবার চেষ্টাও করলুম না।

ওকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললুম, "এস, মা। বেচারি খরগোসটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, চল, এবার ব্ল্যাকবেরির খোঁজে যাই।"

ঘাড় ফিরিয়ে খরগোসটার দিকে তাকিয়ে সিল্‌ভি আমার কথামতো বললে, "বিদায়, বেচারি খরগোস!" আর, পরমুহূর্তেই তার সমস্ত মনের জোর যেন এক নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। আমার হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটাকে একটানে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই খরগোসটার কাছে ছুটে গেল সে, তার পর কী গভীর মর্মবেদনায় যে সেই মরা খরগোসটার পাশে আছড়ে পড়ল, ঐটুকু বাচ্চা মেয়ের পক্ষে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

মাটি থেকে মুখ তুললে না, কেবল মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে খরগোসটার গায়ে বোলাতে লাগল, আর আবার দুহাতে মুখ ঢেকে এমন কাঁদতে লাগল যে, মনে হল ওর বুকটা বুঝি ফেটে যাবে।

ভয় পেলুম, শেষকালে নিজে না অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পর ভেবে দেখলুম, শোকের প্রথম ধাক্কাটা বরং কেঁদে কেঁদেই সামলে নিক, বুকটা হাল্কা হবে। কিছুক্ষণ বাদে কান্না থামল, উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত চোখে আমার দিকে চাইলে—তখনো গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে চলেছে।

এখনি আবার কোনো কথা বলতে ভরসা হল না। ওখান থেকে চলে যাবার জন্যে সিল্‌ভির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলুম।

"হ্যাঁ, এবার যাব।" বলে, সিল্‌ভি খুব সসম্ভ্রমে হাঁটুগেড়ে বসে খরগোসটার গায়ে একটা চুমু খেলে; তার পর উঠে আমার হাতের মধ্যে হাত রাখলে, আমরা চুপচাপ হাঁটতে লাগলুম।

ছোটোদের দুঃখ খুব তীব্র হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। একটু বাদেই সিল্‌ভির গলা প্রায় স্বাভাবিক শোনাল, "আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও! ভারি সুন্দর ক'টা ব্ল্যাকবেরি রয়েছে!"

হাত-ভরে ব্ল্যাকবেরি নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম; উঁচু পাড়ের ওপর বসে ব্রুনো আর প্রফেসর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়ার আগেই আমায় থামিয়ে সিল্‌ভি বললে, "ব্রুনোকে দয়া করে খরগোসটার কথা বলো না!"

"বেশ, বলব না, মা! কিন্তু কেন?"

ওর মিষ্টি চোখ দুটি আবার জলে চিক্‌চিক্ করে উঠল! মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, "শান্ত, নিরীহ প্রাণীদের ও খুব ভালোবাসে। ও বড়ো—বড়ো কষ্ট পাবে। আমি চাই না যে, ও কষ্ট পাক!"

ফলগুলো পেয়ে ব্রুনো এমন নিবিষ্ট মনে তার সদ্ব্যবহার করতে লাগল যে, সিল্‌ভির অস্বাভাবিক গম্ভীরভাব তার নজরেই পড়ল না।

বললুম, "আমাদের বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে, প্রফেসরমশাই!"

প্রফেসর বললেন, "অবশ্যই দেরি হয়ে গেছে। আবার সবাইকে গজদন্তের দরজা পার করিয়ে দিই, চলুন। থাকার সময় পেরিয়ে গেছে।"

সিল্‌ভি বললে, "আর একটু থাকা যায় না?"

ব্রুনো পোঁ ধরলে, "কেবল এক মিনিট আর ?"

কিন্তু প্রফেসর কিছুতেই বাগ মানলেন না। বললেন, "গজদন্তের দরজা দিয়ে আসতে পারাটাই একটা সৌভাগ্য, বুঝলে! এবার যেতেই হবে।"

কাজেই, পরম অনুগতের মতো আমরা তাঁর পিছন পিছন যেতে লাগলুম; প্রফেসর গজদন্তের দরজা খুলে ধরে আগে আমাকে যেতে ইশারা করলেন।

সিল্‌ভিকে বললুম, "তুমিও তো আসছ, তাই-না ?"

সে বললে, "হ্যাঁ, আসছি, কিন্তু দরজা পার হবার পর তুমি আর আমাদের দেখতে পাবে না।"

দরজায় ঢুকতে ঢুকতে জিগেস করলুম, "কিন্তু, ধর ঠিক দরজার ওদিকেই যদি অপেক্ষা করি ?"

সিল্‌ভি বললে, "সেক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, আলু তোমার ওজন জানতে চাইতে পারে; আর সেটা কিছু অন্যায় হবে না। সত্যিকারের উঁচু জাতের বিরাট একটা আলু পনেরো স্টোনের কম ওজনের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে যদি আপত্তি করে, তাতে মোটেই আশ্চর্য হব না!"

অনেক কষ্টে আমার ভাবনার হারান সূত্রটা খুঁজে পেলুম। বললুম, "দেখতে না-দেখতে আমরা কেমন অসম্ভবের দেশে চলে যাই! কত চট্‌পট্‌ আজগুবির পালা শুরু হয়ে যায়!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রেল-লাইন পার হওয়া

লেডি মুরিয়েল বললে, "সেক্ষেত্রে, আসুন, ফের একবার চায়ের পালা শুরু করা যাক। মন্দ কথা নয়, কী বলেন ?"

আমি মনে মনে ভাবলুম, 'মুরিয়েল কথার মাঝখানে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল, একটা ছোট্টো 'কমা' থাকলে যেমন থামতে হয়, আর তারই মধ্যে এত-সব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেল !' (নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলুম, ঠিক যে-সময় থেকে ঘুমতে আরম্ভ করেছিলুম, প্রফেসর দয়া করে সময়টাকে ঠিক সেইখানে ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন।)

কয়েক মিনিট বাদে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই আর্থার বললে, "মাত্র কুড়ি মিনিট মুরিয়েলদের বাড়িতে ছিলুম, তোমরা কথা বলছিলে, সারাক্ষণ কেবল শুনেছি। অথচ, কেন জানি না, মনে হচ্ছে, মুরিয়েলের সঙ্গে আমি অন্তত ঘণ্টাখানেক ধরে কথা বলেছি !"

সত্যিই যে বলেছে, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই; কেবল, আমি আর মুরিয়েল যখন কথাবার্তা বলছিলাম, সময়টা ঠিক সেই জায়গায় ফিরে আসার ফলে, মাঝখানের সমস্তটা (যখন আর্থার আর মুরিয়েল কথা বলেছিল, আর আমি ঘুমিয়েছিলাম) একেবারে উবে গেছে, কিচ্ছু নেই ! পাছে আমার মাথার গোলমাল হয়েছে বলে ভেবে বসে, তাই ব্যাপারটা ওকে খুলে বললুম না।

বাড়ি যাবার পথে আর্থারকে অস্বাভাবিক গম্ভীর আর চুপচাপ দেখলুম, কারণ বুঝতে পারলুম না। এরিক লিণ্ডনের জন্যে নয়, কারণ দিনকয়েকের জন্যে সে লণ্ডনে গেছে। লেডি মুরিয়েলের সঙ্গে ও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলতে পেয়েছে শুনে ভালোই লাগল—ওর তো এখন বিশেষ করে খুশি হবার কথা, ভালো লাগার কথা। মনে মনে ভাবলুম, 'তা হলে কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছে না-কি?' আমার মনের কথাটা শুনতে পেয়েই যেন আর্থার বলে উঠল, "আজকের শেষ ট্রেনে সে ফিরে আসছে।" এমনভাবে বললে, যেন এতক্ষণ আমরা কথাই বলছিলাম।

"সে, মানে ক্যাপ্টেন লিণ্ডনের কথা বলছ তো?"

আর্থার বললে, "হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন লিণ্ডন। আমি 'সে' বললুম, কারণ এতক্ষণ যেন তোমার সঙ্গে তার কথাই হচ্ছিল বলে মনে হল। আর্ল বললেন যে, আজ রাত্তিরেই ও ফিরে আসছে, অথচ, সৈন্যবিভাগে ও যে-বিশেষ সম্মানের পদটা পাবে বলে আশা করে আছে, তার পাকা খবরটা আগামী কাল পাবার কথা। আর্ল বলেন, খবরটার জন্যে ও না-কি ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে আছে; তাই-ই যদি হয়, তা হলে আর-একদিন লণ্ডনে থাকল না কেন, সেটাই আশ্চর্য!"

আমি বললুম, "হয়তো টেলিগ্রামে খবর আসবে। তবে খারাপ খবরের ভয়ে এরকমভাবে পালিয়ে আসাটা ওর পক্ষে ঠিক সৈনিকের উপযুক্ত কাজ হল না!"

আর্থার বললে, "ও লোক ভালো, তবে ও যদি ঐ উঁচু পদটা পায় আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে কাজে ডেকে পাঠান হয়, তা হলে খুব খুশি হই—এ কথা অকপটে স্বীকার করছি! ওর কপালে সব সুখ জুটুক—কেবল একটা ছাড়া। আচ্ছা, শুভরাত্রি! (ততক্ষণে আমরা বাড়ির সামনে এসে গেছি) আজ আর আমার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পাবে না, একাই থাক বরং।"

পরের দিনও একই অবস্থা। আর্থার বললে যে, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার মতো তার মনের অবস্থা নেই, কাজেই বিকেলের দিকে একা একাই বেড়াতে বার হলুম। স্টেশনের রাস্তা ধরলুম। 'হল'-এ যাবার রাস্তাটা যেখানে এসে মিশেছে, সেই জায়গাটায় এসে ওঁদের দেখতে পেলুম, স্টেশনের দিকেই চলেছেন। থামতে হল।

কাছাকাছি এসে নমস্কার-টমস্কার সারা হবার পর আর্ল বললেন, "একসঙ্গে যাবে না-কি? এরিকের একটা টেলিগ্রাম আসার কথা আছে, ছেলেটা বড্ডো অস্থির হয়ে পড়েছে। তাই আমরা স্টেশনে যাচ্ছি আনতে।"

লেডি মুরিয়েল বললে, "শুধু ছেলেটা নয়, এ-ব্যাপারে একটা মেয়েও অস্থির হয়েছে।"

আর্ল বললেন, "সে তো জানা কথাই, মা। মেয়েরা সব সময়েই অস্থির!"

মুরিয়েল বললে, "গুণের কদর করতে বাবাদের জোড়া নেই, তাই-না এরিক?"

এর পর, কথাবার্তায় ভাগাভাগি হয়ে গেল; এরিক আর মুরিয়েল কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল, আর আমরা দুজন বয়স্ক মানুষ মন্থর পায়ে চলতে থাকলুম।

আর্ল বললেন, "তোমার সেই বাচ্চা বন্ধুদুটির সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে আমাদের? ভারি ফুটফুটে দুটিতে।"

বললুম, "সুবিধে পেলেই নিয়ে আসব। কিন্তু, মুস্কিল হচ্ছে, আবার যে কবে দেখা হবে, নিজেই জানি না!"

আর্ল বললেন, "আমি অবশ্য তোমায় কোনো কথা জিগেস করছি না, কিন্তু, বলতে বাধা নেই, মুরিয়েল তো কৌতূহলে ফেটে পড়ছে! আশ-পাশের সবাইকেই আমরা চিনি, অথচ মুরিয়েল কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না, ওরা কাদের বাড়ির হতে পারে।"

"একদিন হয়তো ওর কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারব; তবে, এখন কিন্তু—"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ। যতটা পারা যায় কৌতূহলের ভার ওকে বইতেই হবে। আমি ওকে বলেছি, ধৈর্য ধরতে শেখার কেমন চমৎকার একটা সুযোগ পেলে।, কিন্তু ও কিছুতেই সেভাবে দেখছে না ব্যাপারটাকে। আরে, ঐ তো সেই ছেলেমেয়েদুটি!"

সত্যি ওরাই; একটা বেড়ার ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক মুহূর্ত আগেও নিশ্চয়ই ওখানে ছিল না, কারণ লেডি মুরিয়েল আর এরিক পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ওদের দেখে নি। দেখতে পেয়েই ব্রুনো একছুটে আমাদের কাছে এসে একটা ছুরির বাঁট দেখতে দিলে—ফলাটা ভেঙে পড়ে গেছে—রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে।

বললুম, "এটা নিয়ে কী করবে, ব্রুনো ?"

ব্রুনো আনমনে বললে, "জানি না ; ভেবে দেখি।"

আর্ল তাঁর সেই বিশেষ ধরনের মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, "জীবনের প্রতি বাচ্ছাদের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটা হল, যা-কিছু পাওয়া যায়, সব জমিয়ে রাখাই যেন এই বয়েসের একমাত্র উদ্দেশ্য। বয়স যতই বাড়ে, দৃষ্টিভঙ্গিটাও তত বদলাতে থাকে।" বলতে বলতে তিনি সিল্‌ভির দিকে হাত বাড়ালেন। সিল্‌ভি তখন একটু লজ্জা পেয়ে আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

তবে ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কাছে বাচ্ছাদের লজ্জা বেশিক্ষণ থাকে না—তা সে মানুষই হোক আর পরীই হোক। কাজেই একটু বাদেই আমাকে ছেড়ে সে আর্লের হাত ধরে চলতে লাগল—ব্রুনোই কেবল পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে না। স্টেশনে পৌঁছবার মুখেই আমরা মুরিয়েল আর এরিককে ধরে ফেললাম, ওরা সিল্‌ভি আর ব্রুনোকে ডেকে আলাপ করলে। এরিক বললে, "তা হলে শেষ-পর্যন্ত বাতির আলোয় ব্যাবিলন পাড়ি দিলে ?"

ব্রুনো বললে, "হ্যাঁ, ফিরেও এলুম !"

মুরিয়েল অবাক হয়ে এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। শেষ অবধি থাকতে না-পেরে বলে উঠল, "তার মানে, তুমি ওদের চেন না-কি এরিক ? দিন দিন রহস্য বেড়েই চলেছে দেখছি !"

এরিক বললে, "তার মানে নাটকের তৃতীয় অঙ্ক চলছে এখন। পঞ্চম অঙ্কের আগে রহস্য ভেদ হবে, এমন আশা করছ না নিশ্চয়ই ?"

মুরিয়েল করুণস্বরে বললে, "কিন্তু, বড্ডো লম্বা নাটক যে ! এতক্ষণে তো পঞ্চম অঙ্কে আসা উচিত ছিল !"

এরিকের কিন্তু দয়ামায়া নেই ; সোজা উত্তর দিলে, "বলেছি তো, তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় অঙ্কে রেল-স্টেশনের দৃশ্য। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবে গেল। রাজকুমার (ছদ্মবেশে অবশ্য) এবং তাঁর ভৃত্যের প্রবেশ। তার পর ব্রুনোর হাত ধরে বললে, "এই হল রাজকুমার, আর এই হল তাঁর অনুগত ভৃত্য ! এবার কী আজ্ঞা হয়, কুমার-বাহাদুর ?" হতভম্ব ব্রুনোর সামনে দরবারি কায়দায় নিচু হয়ে সে কুর্নিশ করলে।

ব্রুনো বিরক্ত হয়ে বললে, "তুমি মোটেই ভিত্য নও, তুমি তো ভদ্দরলোক।"

"বিশ্বাস করুন, আমি ভৃত্য বৈ আর কিছুই নই, কুমারবাহাদুর! যদি অভয় দেন তো কুমারবাহাদুরের কাছে আমার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অবস্থার কথা নিবেদন করি।"

এবার ব্রুনো রসিকতায় যোগ দিলে, বললে, "পথমে কী করতে? জুতো পালিশ করতে?"

"আরো নিচু কাজ, কুমারবাহাদুর। অনেক বছর আগে আমি ক্রীতদাসের কাজের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম— 'একান্ত ব্যক্তিগত ক্রীতদাস'।" তার পর মুরিয়েলের দিকে ফিরে বললে, "তাই বলে না?"

মরিয়েলের দস্তানাটায় কী হয়েছিল, তাই নিয়েই সে ব্যস্ত, কাজেই এদিকে তার মন নেই, কথাটা যেন কানেই গেল না।

ব্রুনো বললে, "চাকরিটা হল?"

"দুঃখের কথা বলব কী কুমারবাহাদুর, হল না! তাই গত কয়েক বছর ধরে হুকুমের চাকর হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছি, রয়েছি না?" বলে আবার সে মুরিয়েলের দিকে তাকালে।

লেডি মুরিয়েল চাপা গলায় বললেন, "সিল্‌ভি, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার দস্তানার বোতামটা লাগিয়ে দাও তো!" বলে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে দাঁড়াল, কথাটায় কান দিল না।

ব্রুনো বললে, "এর পর কী হবে?"

"আশা করছি, এর পর বিয়ের বর হব। আর তার পর—"

লেডি মুরিয়েল বাধা দিয়ে বলে উঠল, "কেন অমন করে বাচ্ছাটার মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছ! আজেবাজে কথা যত-সব!"

এরিক বলেই চলল, "—তারও পর, আশা আছে, সংসারের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে—" তার পর হঠাৎ গলার সুর পাল্টে বলে উঠল, "চতুর্থ অঙ্ক। আলো জ্বলে উঠল। লাল আলো। সবুজ আলো। দূরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ। রেলগাড়ির প্রবেশ!"

দেখতে না-দেখতে প্ল্যাটফর্মের গায়ে ট্রেন এসে লাগল, আর টিকিট-ঘর আর বিশ্রামাগার থেকে হুড়্‌হুড়্‌ করে যাত্রীরা বেরিয়ে আসতে লাগল।

আর্ল বললেন, "জীবনের সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে কখনো নাটক বানিয়েছ? একবার করে দেখো। আমি নিজে করি মাঝে মাঝে,

খুব মজা পাই। মনে কর, এই প্ল্যাটফর্মটা অভিনয়ের মঞ্চ। দেখছ তো, দুদিকেই প্রবেশ আর প্রস্থানের পথ খোলা। পেছনের দৃশ্যপটটিও চমৎকার : সত্যিকার ইঞ্জিন যাওয়া-আসা করছে। এই-সব হৈ-হল্লা, লোকজনের যাওয়া-আসা, এ-সব নিশ্চয়ই অনেক মহড়া দিয়ে করতে হয়েছে! কী স্বাভাবিকভাবে যে-যার ভূমিকা করে চলেছে বল তো! দর্শকদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখছে না! আর দেখ, যারা আসছে-যাচ্ছে, তারা সবাই নতুন নতুন লোক। পুনরাবৃত্তির বালাই নেই!"

আর্লমশাইয়ের দৃষ্টিতে যেই দেখতে আরম্ভ করলুম, সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই আমারও তারিফ করতে ইচ্ছে হল। একটা কুলি ঠ্যালাগাড়ি বোঝাই করে মাল-পত্তর নিয়ে যাচ্ছে, সেও কী সত্যিকারের মতো নিখুঁত, হাত-তালি দিতে ইচ্ছে করে। তার পেছন পেছন এক গিন্নীবান্নি মা দুটো বাচ্ছার নড়া ধরে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছেন; রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে ফেটে পড়ছে। বাচ্ছাদুটো চিল-চীৎকার করে কাঁদছে, আর তাদের মা-জননী পেছনকার কাকে উদ্দেশ করে সমানে হাঁক পেড়ে চলেছেন, "জন! তাড়াতাড়ি এস-না!" জনের প্রবেশ; অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারা, অতি চুপচাপ, মাল-পত্তরে বোঝাই হয়ে রয়েছে। তার পেছনে আবার রয়েছে একটি ভীত-ত্রস্ত কচি ছেলের ঝি, কোলে নাদুস-নুদুস একটি শিশু, সেও কেঁদে রসাতল করছে। সবকটা বাচ্ছাই চ্যাঁচাচ্ছে।

আর্ল আমায় একান্তে বললেন, "মূল নাটকের মধ্যে ছোট্টো একটি উপনাটক, কাহিনীর মধ্যে ছোট্টো একটি ঘটনা। ঐ ঝির মুখ-চোখে ভয়ের ভাবটা লক্ষ্য করেছ? একেবারে নিখুঁত!"

বললুম, "আপনি একটা নতুন স্বাদের সন্ধান দিলেন। আমাদের অধিকাংশের কাছেই জীবনটা যেন প্রায়-ফুরিয়ে-যাওয়া একটা খনির মতো মনে হয়।"

আর্ল বললেন, "ফুরিয়ে যাওয়া! যার মধ্যে নাটকীয় বোধের লেশমাত্রও আছে, তার কাছে নাটকের কখনো শেষ নেই; শেষ যা হয়, ফুরিয়ে যা যায়, তা শুধু নাটকের প্রস্তাবনা! আসল মজার এই তো সবে শুরু! তুমি থিয়েটারে যাও, দশ শিলিং দাম দিয়ে একটা বসবার জায়গা কেন—তার বদলে কী পাও? হয়তো দুটি চাষীতে মিলে কথা-বার্তা বলছে—চাষীর পোশাক অতিরিক্ত নিখুঁতভাবে নকল করতে গিয়ে হাস্যকর বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে—তাদের পাখি-পড়া

ভাবভঙ্গি আর ধরন-ধারণের জন্যে আরো অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে—আর, সবচেয়ে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে কথা আওড়াবার সময়ে তাদের সহজ আর স্বাভাবিক হবার আপ্রাণ চেষ্টার জন্যে। তার চেয়ে বরং রেলের থার্ড-ক্লাশ একটা কামরায় গিয়ে বস, ঐ-সব কথাবার্তাই শুনতে পাবে সত্যিকারের জীবনের ভাষায়! একেবারে মঞ্চের সামনের আসনে—আড়াল করবার কেউ নেই—দাম? তাও লাগবে না!"

এরিক বললে, "ভালো কথা মনে পড়ল, টেলিগ্রাম পেতেও তো দাম লাগে না! খোঁজ করে দেখলে তো হয়?" এরিক আর লেডি মুরিয়েল টেলিগ্রাফ-অফিসের দিকে চলে গেল।

বললুম, "এই-সব কথা মনে করেই সেক্সপীয়র ঐ কথাটা লিখেছিলেন কি-না, কে জানে—'পুরো দুনিয়াটাই একটা রঙ্গমঞ্চ'!"

বৃদ্ধ আর্ল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সত্যিই তাই, যে-ভাবেই দেখ-না কেন। জীবনটা সত্যিই একটা নাটক—এ-নাটকে দর্শকদের অনুরোধে এক কথা দুবার বলবার বা এক ঘটনা দুবার অভিনয় করে দেখবার সুযোগ খুবই কম—আর, অভিনয়ের তারিফে ফুলের তোড়া? বিলকুল না!" স্বপ্নাবিষ্টের মতো আবার বললেন, "অর্ধেক জীবন ধরে যা করি, বাকি অর্ধেকটা তার জন্যে আক্ষেপ করতেই কেটে যায়!"

একটু পরে তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে এল। তখন বললেন, "জীবনের রস উপভোগ করবার গোপন রহস্যটি হল, গভীরতা! তার মানে চিন্তার গভীরতা—মনের একাগ্রতা। শুধু একাগ্রতার অভাবে আমরা জীবনের অর্দ্ধেক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে পারি। যে-কোনো একটা উদাহরণ ধর: সে-আনন্দ যতই তুচ্ছ হোক—আসল ব্যাপারটা একই। ধরা যাক, ক আর খ দুজন লোক সাধারণ একটা লাইব্রেরির দ্বিতীয় শ্রেণীর একই উপন্যাস পড়ছে। ক হয়তো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রটার দিকে যথেষ্ট মন দিল না, অথচ তারই ওপর হয়তো পুরো কাহিনীটার সার্থকতা নির্ভর করছে; কোথাও যদি নিসর্গ বর্ণনা থাকে, বা কোনো জায়গাটা যদি তার নীরস লাগে, সে-সব সে বাদ দিয়ে যায়; যা পড়ছে, তাতেও তার পুরোপুরি মন নেই; তবু সে পড়ছে—শুধু অন্য কোনোভাবে সময় কাটাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না বলে—বই রেখে দেওয়া উচিত ছিল, তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা

পড়ল ; যখন 'সমাপ্ত'-র জায়গায় পৌঁছল, তখন সে ক্লান্ত, তখন সে মনমরা ! খ তার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে বইয়ের মধ্যে—তার নীতি হল, 'যা-কিছু করণীয়, তা ভালোভাবে করণীয়' ; সে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কার সঙ্গে কী সম্পর্ক, তা মনে রেখেছে, কোনো দৃশ্যের বর্ণনা পড়বার সময়ে মনে মনে তার ছবি এঁকে নিয়েছে ; আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ইচ্ছে করেই কোনো-একটা পরিচ্ছেদে পৌঁছে প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে বই মুড়ে রেখে অন্য দরকারি কাজে মন দিয়েছে, যাতে এর পর যখন সে আবার পড়বার সময় পাবে, তখন অভুক্ত লোকে যেমন পরম আগ্রহে খাবার পাতে গিয়ে বসে, তেমনই আকুল আগ্রহ নিয়ে সে পড়তে বসবে ; আর, যখন তার পড়া শেষ হবে, নবীন উৎসাহে সে ফিরে যেতে পারবে তার প্রাত্যহিক জীবনের কর্মজগতে !"

"কিন্তু ধরুন, বইটা যদি একেবারে রাবিশ হয়—মন দেবার মতো কিছুই যদি তাতে না-থাকে ?"

আর্ল বললেন, "তাই-ই ধর। তা হলেও নিয়মটা খাটবে, জোর গলায় বলছি। ক বইটাকে রাবিশ বলে বুঝতেই পারছে না, ভালো লাগছে বলে ভাবতে চেষ্টা করছে, আর মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে পড়েই যাচ্ছে। খ পাতা-দশেক পড়েই বই বন্ধ করে দেবে, তার পর লাইব্রেরিতে গিয়ে পাল্টে অন্য বই নেবে ! জীবনের আনন্দ সম্বন্ধে আমার আরো একটা মত আছে, সেটা হল—অবশ্য তোমার যদি শোনার ধৈর্য থাকে, তবেই বলি। ভাবছ, বুড়ো বড্ডো বক্‌বক্‌ করে—তাই-না ?"

আমি মন থেকেই বললাম, "আজ্ঞে না, একদম নয় !"

"আমার মতবাদটা হল, আনন্দকে তাড়াতাড়ি আর বেদনাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে শেখা দরকার আমাদের।"

"কিন্তু কেন ? আমি হলে তো ঠিক উল্টোটা করি।"

"নিজে নিজে তৈরি-করা কোনো অলীক বেদনা—সেটা তোমার ইচ্ছেমতো খুব হাল্কা করে নিতে পার—যদি খুব ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে অভ্যাস করা যায়, তার ফলে সত্যিকারের বেদনার সময়ে, যত গভীর বেদনাই হোক, তোমায় আর কিছু করতে হবে না ; শুধু সেটাকে স্বাভাবিক সময় নিয়ে আপনা থেকে পার হয়ে যেতে দাও, মনে হবে, খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল !"

বললুম, "খাঁটি কথা। কিন্তু আনন্দের ব্যাপারটা ?"

"বুঝছ না, তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারলে, জীবন থেকে আরো কত বেশি রস নিঙড়ে নিতে পারবে? একটা ভালো বাজনা শুনে, তার রস উপভোগ করতে তোমার সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে। ধর, আমি আধঘণ্টার মধ্যে সেই মজা পাই। তুমি যতক্ষণে একটা শুনছ, আমি ততক্ষণে সাতটা শুনে সাতগুণ বেশি আনন্দ পেয়ে গেলুম!"

"কিন্তু একটা পুরো গান বা সুর অত তাড়াতাড়ি বাজাবার মতো বাজিয়ের দল আছে, এটা কল্পনা করে নিতে হচ্ছে তো ?"

বৃদ্ধ একটু মুচকি হেসে বললেন, "আমি একটা চেনা সুর, তিন সেকেণ্ডে বাজতে শুনেছি—খুব ছোটো নয়, আর কাট-ছাঁটও করা হয় নি!"

"কখন ? কী করে ?" পরম কৌতূহলে প্রশ্ন করলাম, আর মনে মনে সন্দেহ হতে লাগল, আবার বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি।

খুব শান্তভাবেই তিনি জবাব দিলেন, "চাবি ঘুরিয়ে দম দিলে আপনা-আপনি টুংটাং করে বাজনা বাজে, এইরকম বাক্সের মতো দেখতে যে যন্ত্র পাওয়া যায়, যাকে মিউজিক্যাল-বক্স বলে ? একবার ঐরকম একটা মিউজিক্যাল-বক্সে দম দেবার পর, ভেতরে কোনো কিছু আলগা হয়ে বা ভেঙে যাবার ফলেই হোক কিম্বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, যন্ত্রটা সাঁ করে এত তাড়াতাড়ি চলতে লাগল যে, তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই দম শেষ। কিন্তু, ভেবে দেখ, সমস্ত সুরটায় যে যে পর্দা ছিল, সবই বেজেছিল নিশ্চয়ই!"

উকিলের মতো জেরার ভঙ্গিতে বললাম, "শুনে ভালো লেগেছিল ?"

অকপটে স্বীকার করলেন তিনি, "না, লাগে নি! কিন্তু, তার কারণ হল, ঐ ধরনের বাজনা শোনার উপযুক্ত কান তৈরি হয় নি তো!"

বললুম, "আপনার মতলবটা একবার খাটিয়ে দেখবার ইচ্ছে রইল।"

সিল্ভি আর ব্রুনো এই সময়ে ছুটে আমাদের কাছে এসে পড়ল। আর্লমশাইকে ওদের জিম্মায় রেখে আমি প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করে দেখতে লাগলুম, শুধু আমারই দেখার জন্যে সেখানে কত নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে, তার পাত্র-পাত্রী বা ঘটনা, কোনো কিছুই আগে থেকে মহড়া দিয়ে তৈরি করা হয় নি।

হঠাৎ সিল্ভি আর ব্রুনোকে আমার পাশ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে যেতে

দেখে জিগেস করলুম, "কী হল, এর মধ্যেই আর্লমশাই ব্যাজার হয়ে গেলেন ?"

সিল্‌ভি খুব জোর দিয়ে বললে, "না ! আজকের সন্ধের খবরের কাগজ একখানা ওঁর দরকার। তাই ব্রুনো যাচ্ছে কাগজ আনতে। ব্রুনো খবরের কাগজওলা হতে চায় !"

ওদের পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললুম, "বেশ চড়া মজুরি নিতে ভুলো না যেন !"

আবার যখন প্ল্যাটফর্মের সেই জায়গাটায় ফিরে এলুম, সিল্‌ভি তখন একা।

বললুম, "কী হল ? তোমার কাগজওলাটি গেল কোথায় গো ? সন্ধের একখানা কাগজ জোগাড় করতে পারল না ?"

সিল্‌ভি বললে, "লাইনের ওপারে বইয়ের দোকান থেকে আনতে গেছে, ঐ যে কাগজ নিয়ে লাইন পার হয়ে এবার এদিকে আসছে— ওহ্‌, ব্রুনোরে ! ওভার-ব্রীজের ওপর দিয়ে এলি না কেন !" এক্সপ্রেস ট্রেনের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ বেশ স্পষ্ট কানে আসছে তখন। পরক্ষণেই আকস্মিক আতঙ্কে সিল্‌ভির চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"ব্রুনো লাইনের ওপর পড়ে গেল যে !" এই বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে এমন ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গেল যে, ধরে রাখবার চেষ্টা করে কোনো ফল হল না।

বুড়ো হেঁপো স্টেশন-মাস্টারমশাই আমার পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। বুড়ো মানুষ, বিশেষ কাজের নন বটে, তবে দেখা গেল, এ-ক্ষেত্রে সত্যিই কাজে লাগলেন ; ঘাড় ফেরাতে না-ফেরাতে দেখলুম তিনি সিল্‌ভিকে খপ্‌ করে ধরে ফেলেছেন—অবধারিত মৃত্যুর দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, তা থেকে রক্ষা করেছেন। এমন তন্ময় হয়ে এই কাণ্ড দেখছিলাম যে, এদিকে প্ল্যাটফর্মের পেছন দিক থেকে ছাই রঙের স্যুট-পরা একজন লোক যে তীরের বেগে ছুটে গিয়ে লাইনের ওপর পৌঁছে গেছে, তা নজরই করি নি। এইরকম একটা আতঙ্কের মধ্যে হিসেব করা যতখানি সম্ভব, তাতে বোঝা গেল, যে হাতে আর দশ সেকেণ্ডের বেশি সময় নেই ; ট্রেনের তলায় পড়বার আগে লাইন পার হয়ে ব্রুনোকে সেখান থেকে তুলে নিতে হলে, দশ সেকেণ্ডের বেশি লাগলে চলবে না। তা সম্ভব হল কি হল না, তা ঠিকমতো বুঝতে পারার আগেই এক্সপ্রেস

ট্রেন ধুলোর ঝড় তুলে ত্বরিত বেগে স্টেশন পার হয়ে চলে গেল, বুঝলুম, হয় জীবন, নাহয় মৃত্যু—যা ঘটবার ঘটে গেছে। ধুলোর মেঘ কেটে গেল, লাইনগুলো আবার দেখা যেতে লাগল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমরা দেখলুম, ব্রুনো, আর তার পরিত্রাতা সেই লোকটি, দুজনেই নিরাপদ।

লাইন পার হয়ে আমাদের দিকে এগোতে এগোতে খুশির গলায় এরিক চেঁচিয়ে বললে, "সব ঠিক আছে! যত-না লেগেছে, ভয় পেয়েছে তার চেয়ে বেশি!"

ব্রুনোকে হাত বাড়িয়ে মুরিয়েলের কোলে তুলে দিয়ে এরিক নিজে এমন সহজ প্রফুল্লতায় প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে এল, যেন কিছুই হয় নি; কিন্তু তাকে তখন মড়ার মতো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ভয় হল, অজ্ঞান হয়ে না-পড়ে; ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই, তার ওপর দেহের ভার এলিয়ে দিলে, আচ্ছন্নের মতো বললে, "একটু—একটুখানি বসে নিই; সিল্‌ভি কোথায়?"

সিল্‌ভি দৌড়ে এগিয়ে এসে এরিকের গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এরিকের চোখে তখন অদ্ভুত এক দৃষ্টি। বললে, "অমন করতে নেই! এখন আর কাঁদবার কী আছে, বল? কিন্তু, আর একটু হলেই তুমি শুধু শুধু নিজের প্রাণটি দিতে!"

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সিল্‌ভি বললে, "ব্রুনোর জন্যে! আমার হলে ব্রুনোও তাই করত। করতে না ব্রুনো?"

ব্রুনো বেশ হতভম্ব হয়ে আছে; বললে, "নিশ্চয় করতুম!"

কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে লেডি মুরিয়েল ব্রুনোকে একটি চুমু খেল। তার পর সিল্‌ভিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ব্রুনোর হাত ধরিয়ে দিয়ে ওদের আর্লের কাছে যেতে ইশারা করলে। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "ওঁকে গিয়ে বল—সব ঠিক আছে!" তার পর সে, আজকের ঘটনার নায়ক, এরিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "আমি ভেবে নিয়েছিলাম, অবধারিত মৃত্যু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার কিছু হয় নি। সর্বনাশ কত কাছে ঘনিয়ে এসেছিল; দেখতে পেয়েছিলে?"

এরিক হাল্কা গলায় বললে, "আমি শুধু দেখেছিলাম, টায়ে টায়ে সময় আছে, বাড়তি একটুও নেই। যোদ্ধাকে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে

চলা-ফেরা করতে শিখতে হয়, বুঝলে। এবার আমি সুস্থ বোধ করছি। আর একবার টেলিগ্রাফ-অফিসটা ঘুরে আসি-না? এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসেছে।"

আমি আর্লমশাইদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কারোরই যেন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ব্রুনো সিল্‌ভির কোলে বসে ঢুলছে—এইভাবে চুপচাপ অপেক্ষা করতে করতে ওরা ফিরে এল। টেলিগ্রাম আসে নি।

মনে হল, এবার আর আমাদের এখানে থাকাটা ঠিক নয়; বললাম, "বাচ্চাদুটোকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। সন্ধের দিকে একবার ঢুঁ মারব এখন।"

একটু এগোতেই সিল্‌ভি বললে, "আমাদের বনে ফিরে যেতে হবে। এই মাপের হয়ে থাকা আর চলবে না।"

"পরে আবার যখন দেখা হবে, তখন, আবার সেই ক্ষুদে পরী?"

সিল্‌ভি বললে, "হ্যাঁ, তবে যদি সুযোগ দাও, আবার আমরা সাধারণ ছেলেমেয়ের মতো হব। লেডি মুরিয়েলের সঙ্গে আবার দেখা করার জন্যে ব্রুনোর ভীষণ আগ্রহ।"

ব্রুনো বললে, "উনি খুব ভালো!"

বললুম, "বেশ তো, খুশি হয়েই নিয়ে যাব তোমাদের। ভালো কথা, প্রফেসরের ঘড়িটা তোমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলে হত; তাই-না? কিন্তু ক্ষুদে পরী হয়ে গেলে তো অত বড়ো ঘড়ি তোমরা বইতেই পারবে না!"

ব্রুনো খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। দেখে ভালো লাগল যে তার মনে সেই ভীষণ ঘটনার কোনো ছাপই এখন আর নেই। বললে, "না, না, মোটেই তা নয়। আমরা যেই ছোটো হব, ঘড়িটাও ছোটো হবে!"

সিল্‌ভি খেই ধরে বললে, "আর তখন ঘড়িটা আপনা থেকেই সোজা প্রফেসরের কাছে চলে যাবে, তুমি আর ব্যবহার করতে পারবে না। কাজেই এখুনি এখুনি যত পার কাজে লাগিয়ে নাও। সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ছোটো হতে হবে। চলি, বিদায়!"

ব্রুনোও চেঁচিয়ে বললে, "বিদায়!" কিন্তু তার গলার আওয়াজটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল। ফিরে তাকিয়ে ওদের আর দেখতেই পেলুম না।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলুম, 'সূর্য ডুবতে আর দুঘণ্টা মাত্র বাকি। এই সময়টুকুর যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে হবে!'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অচিন দেশের ঘড়ি

শহরে ঢোকবার মুখেই, দুটি জেলে-বৌকে দেখলুম, তখন তাদের 'আসি, ভাই ; যাই, ভাই'-এর পালা শুরু হয়েছে ; এবং যথারীতি, আবার নতুন করে আলাপ শুরু হচ্ছে, সারা আর হচ্ছে না। ওদের কথাবার্তা শেষ হবার পর, সেই জাদু-ঘড়িটা দিয়ে ফের গোড়া থেকে শুরু করান যায় কি-না, পরীক্ষা করে দেখবার একটা মতলব মাথায় খেলে গেল।

"আচ্ছা, সই চললুম! তোমার মার্থার ঠেঙে চিটি পেলে আমাদের এট্টা খপর দিতে যেন ভুলে যেউ নি।"

"না, না, ভুলবু নি গো! যেতি ওর বিয়ে না-হয়, তাইলে এস্‌তে পারে। চলি, সই!"

যদি কেউ মনে করে, ওদের কথা শেষ হল, তা হলে সে ভয়ানক ভুল করবে।

"ওখেনকার নোকজনেদের ওর ভালোই নাগবে গো, দেকে নিও! ওরা ভালো ব্যাভারই করবে, নিচ্চিন্দি থাক। বড়ো সোন্দর মানুষ হয় ওরা! যাই, ভাই!"

"তা, ওরা সোন্দরই বটে! আসি, ভাই!"

"হ্যাঁ, ভাই, চলি! চিটি নিক্‌লে এট্টা খপর দিও কিন্তুন্!"

"নিশ্চয় দোব, নিশ্চিন্দি থাক! চললুম, ভাই!"

শেষ অবধি সত্যিই চলে গেল ওরা। হাত-চল্লিশেক যেই গেছে, অমনি আমি ঘড়ির কাঁটাটা একমিনিট পিছিয়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে আবার আগের আগের জায়গায় ফিরে এল।

'যেতি ওর বিয়ে না-হয়, তাইলে এস্তে পারে। চলি, সই!' এইখান থেকে আবার শেষপর্যন্ত সবটা শোনা গেল। দ্বিতীয়বার কথা শেষ করে যখন বিদায় নিলে, তখন ওদের যার যার রাস্তায় যেতে দিলুম। তার পর শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

ভাবলুম, 'এই জাদুর দৌলতে সবচেয়ে বড়ো যে-কাজ করা যায়, তা হল কোনো ক্ষতিকর ব্যাপার, কোনো দুঃখের ঘটনা বা কোনো দুর্ঘটনা বিলকুল উড়িয়ে দেওয়া। জাদু-ঘড়ির এই গুণটি পরখ করে দেখবার সুযোগের জন্যে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; চিন্তাটা তখনো মাথায় ঘুরছে, তার মধ্যেই আমার কল্পনার দুর্ঘটনা সত্যিই বাস্তবে ঘটে গেল। মেয়েদের টুপির দোকান, 'গ্রেট মিলিনারি ডিপো'-র সামনে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স-বোঝাই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আর গাড়ির চালকটি সেই-সব বাক্স একটা একটা করে দোকানের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। একটা বাক্স রাস্তায় পড়ে গেল, কিন্তু তক্ষুনি তোলবার দরকার আছে বলে তার মনে হল না, কারণ এক্ষুনিই তো আবার ফিরে আসছে। আর, ঠিক সেই সময়ে একটি ছোকরা সাইকেল চালিয়ে একটা গলির মুখে থেকে বেরিয়ে সাঁ করে বাঁক নিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়েই সেই বাক্সটাকে বাঁচাতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলে না— সাইকেল উল্টে সোজা সেই গাড়ির চাকার গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল। গাড়ির চালকটি দোকান থেকে সাহায্যের জন্যে ছুটে এল; আমাতে আর তাতে মিলে ধরাধরি করে বেচারিকে দোকানের ভেতরে নিয়ে গেলুম। মাথা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে; একটা হাঁটু বেশ বিচ্ছিরি রকম জখম হয়েছে। এখানে ডাক্তারখানা বলতে একটিই; ঠিক হল, এক্ষুনি ওকে সেখানে নিয়ে যাওয়া দরকার। ওদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে গাড়িটাকে খালি করে ফেললুম, কয়েকটা বালিশ রাখা হল, যাতে আহত লোকটি আরাম করতে পারে। তার পর চালকটি যখন তার জায়গায় বসে ডাক্তারখানার দিকে গাড়ি চালাতে যাচ্ছে, ঠিক সেই

সময়ে আমার মনে পড়ে গেল যে, সমস্ত ঝঞ্ঝাট নিরসন করার আজব ক্ষমতা তো আমার হাতেই রয়েছে!

মনে মনে বললুম, 'এইবার মওকা পেয়েছি!' তার পর ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিলুম। দেখলুম, ঠিক যখন আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, বাক্সটা রাস্তায় পড়ে গেছে, সবকিছু ঠিক সেই সময়কার অবস্থায় ফিরে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি রাস্তায় নেমে বাক্সটাকে তুলে গাড়িতে রেখে দিলুম; ঠিক পরমুহূর্তেই সাঁ করে সাইকেলটা গলির মুখ থেকে মোড় ঘুরল, বিনা বাধায় গাড়িটাকে পাশ কাটালে, তার পর ধুলো উড়িয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

ভাবলুম, 'জাদুর কী চমৎকার ক্ষমতা! মানুষের কতটা দুর্দশাই না আমি—শুধু লাঘবই করলাম না—বেমালুম লোপ পাইয়ে দিলুম!' জাদু-ঘড়িটা আমার হাতের ওপর খুলে রেখে দেখতে লাগলুম, চালকটি মাল খালাস করছে; যে-সময়ে কাঁটা পিছিয়েছিলুম, ঠিক সেই সময়টা ফিরে এলে কী ঘটে, তাই দেখবার জন্যে কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে আছি।

ফল যা দাঁড়াল, একটু ভালো করে চিন্তা করলে, আগেই তা আন্দাজ করা যেত: গাড়িটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর ঠিক সেই সময়ে ঘড়ির কাঁটা যেই না আগের জায়গায় ফিরে আসা, অমনি সে-গাড়ি আবার যেমনকার তেমনি সেই দোকানের দরজায় ফিরে এসেছে, ডাক্তারখানার দিকে চলতে শুরু করলেই হয়। আর—বিশ্বসুদ্ধ লোকের উপকার করার সোনালি স্বপ্ন আমার চুলোয় যাক—আর, সেই আহত ছোকরাটি আবার বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে রয়েছে, মুখে-চোখে প্রাণপণে যন্ত্রণা সহ্য করার সেই পরিষ্কার কাতর ভঙ্গি।

শহর পার হয়ে সমুদ্দুরের রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবলুম, 'ঘোড়ার ডিমের জাদু-ঘড়ি! কতই-না ভালো করব বলে কল্পনা করলুম, সে-সব কোথায় তলিয়ে গেল, এই ঝঞ্ঝাট-ভরা পৃথিবীর যত কিছু মন্দই রইল সত্যি হয়ে! সব ভুয়ো!'

এবারে এমন একটা উদ্ভট অভিজ্ঞতার বিবরণ দেব, যেটা বলবার আগে, কাহিনীর এই অংশটুকু বিশ্বাস করবার বাধ্যবাধকতা থেকে পরম সহিষ্ণু পাঠকদের মুক্তি দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়।

অকপটে স্বীকার করছি যে, চাক্ষুস না-দেখলে আমার নিজেরই বিশ্বাস হত না; কাজেই, পাঠকদের কাছে সেটা আশা করি কী করে— বিশেষত, যখন জানি যে, এ-ধরনের ঘটনা দেখবার সুযোগ খুব সম্ভব, তারা কখনোই পায় নি ?

রাস্তার পাশে, একটু ভেতর দিকে জমিওলা একটি সুন্দর ছোট্টো বাড়ি; সামনের জমিতে রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে—লতানে গাছ দেওয়াল বেয়ে উঠে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঢাকা বারান্দার মতো জানলার আশে-পাশে মাথা নাড়ছে—বাগানে কে যেন একটা আরাম-কেদারা রেখে তুলতে ভুলে গেছে, তার কাছে একটা খবরের কাগজ পড়ে রয়েছে— একটা ছোট্টো কুকুর তার সামনে থেবড়ি খেয়ে বসে আছে, যেন জীবন দিয়েও ঐ দুটি সম্পত্তি রক্ষা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে—সদর দরজাটা আধ-খোলা, যেন বলছে, 'আস্তাজ্ঞে হোক!' ভাবলুম, 'জাদু ঘড়ির সেই ভবিষ্যৎ ঘটনা উল্টে দেবার ক্ষমতাটা যাচাই করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেল এবার!' গোঁজের মতো সেই জিনিসটা টিপে দিয়ে বাগানে ঢুকে গেলুম। অন্য কোনো বাড়ি হলে অজানা লোক দেখে সবাই অবাক হয়—রেগেও যেতে পারে, এমন-কি, মার-ধোর করে তাড়িয়েও দিতে পারে; কিন্তু আমি জানতুম, এখানে ও-সব কিছুই হবে না। সাধারণত যা ঘটে থাকে—প্রথমে, আমার উপস্থিতির কথা জানতে না-পারা; তার পর, আমার পায়ের শব্দ পাওয়া, মুখ তুলে আমায় দেখা; তার পর, বাড়ির ভেতরে এসেছি কেন, তাই ভেবে আশ্চর্য হওয়া—আমার ঘড়ির দৌলতে এ-সমস্ত কিছুই উল্টে যাবে। প্রথমে আমায় চিনতে না-পেরে অবাক হবে, তার পর আমার দিকে দেখবে, তার পর মুখ নিচু করবে, তার পর আমার উপস্থিতির কথা আর টের পাবে না। আর, মার-ধোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা সবচেয়ে আগে হবার কথা। কাজেই,. মনে মনে বললুম, 'একবার যদি ভেতরে ঢুকতে পারি, খেদিয়ে দেবার আশঙ্কা থাকতেই পারে না!'

কাছ দিয়ে যাবার সময়ে কুকুরটা উঠে বসে তৈরি হয়ে নিলে; কিন্তু তার আগলান সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকালুম না দেখে আমায় নির্বিবাদে যেতে দিলে, আপত্তি জানাবার জন্যে একবার ঘেউ ঘেউও করলে না। সাঁই সাঁই নিশ্বাসের শব্দে যেন আপনমনে বললে, 'যে

আমার জীবন নেবে সে পাবে রদ্দিমাল ; কিন্তু যে ঐ 'ডেলি টেলিগ্রাফ' খবরের কাগজখানা নেবে—!' কিন্তু আমায় সে সম্ভাবনার মোকাবিলা করতে হল না।

বসবার ঘরে দেখলুম—বুঝতেই পারছ, ঘণ্টাও বাজাই নি, সাড়াও দিই নি, একেবারে সোজা ভেতরে ঢুকে গেছি—দেখলুম, দশ থেকে চোদ্দো বছরের হাসি-খুশি, গোলাপি চেহারার চারটি মেয়ে দরজার দিকে আসছে (আমি দেখলুম পিছু হেঁটে আসছে,) আর তাদের মা, সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম কোলে নিয়ে আগুনের সামনে বসে বলছেন, "আচ্ছা, মেয়েরা, এবার তোমরা বেড়াতে যাবার জন্যে সাজগোজ করতে যেতে পার।"

ভীষণ অবাক হয়ে দেখলুম—কারণ এখনো তো ঘড়ির কাণ্ড-কারখানা দেখে দেখে রপ্ত হই নি—সবাইকার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, এক-একটা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসে গেল সবাই। একটা চেয়ার নিয়ে বসে লক্ষ্য করতে লাগলুম ; কেউ আমার টিকিটিও দেখতে পেলে না।

সেলাইয়ের কাপড়গুলোর ভাঁজ খুলে ওরা যখন সেলাই করার জন্যে তৈরি, সেই সময়ে ওদের মা বললেন, "যাক, এতক্ষণে শেষ হল! এবার পাট করে তুলে রাখ।" কিন্তু মেয়েরা সে কথায় কানই দিলে না ; বরং সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করতে লেগে গেল—যদি অবশ্য তাকে 'সেলাই করা' বলা যায় ; কারণ ওরকম সেলাই এর আগে আমি তো অন্তত কখনো দেখি নি। কাপড়ের সঙ্গে লাগান সুতোর ছোটো একটা মুখ নিয়ে যে যার ছুঁচে পরিয়ে নিলে ; সুতোটা এক অদৃশ্য শক্তির টানে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে সড়্‌সড়্‌ করে চলে গেল, ছুঁচটাকে টেনে নিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ; খুকিরা চঞ্চল আঙুলে কাপড়ের ওপিঠে ছুঁচগুলোকে ধরে নিলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ছেড়ে দিলে। এইভাবে যতই কাজ চলতে থাকে, ততই সেলাই খুলতে থাকে, আর পরিপাটি করে সেলাই করা ছোটো-ছোটো জামা, না-কী সব, একটু একটু করে আলগা হয়ে হয়ে টুকরো হয়ে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে হয়তো কোনো মেয়ের ছুঁচের সুতোটা এত লম্বা হয়ে যায় যে, সেলাই থামিয়ে তাকে সুতোটা কাটিমে গুটিয়ে রাখতে হয়। তার পর কাপড়ে লাগান অন্য একটা ছোট্টো সুতো নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করে।

শেষকালে সমস্ত সেলাইয়ের কাপড় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে

সেগুলো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তুলে রাখা হল, এবং ভদ্রমহিলা পিছু হেঁটে হেঁটে মেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরের দিকে যেতে লাগলেন ; যেতে যেতে প্রলাপ বকলেন, "এখন নয়, বাছা ; আগে সেলাইটা সেরে ফেলা দরকার।" তার পর এটা দেখে আর খুব একটা অবাক হলুম না যে, মেয়েরা তার মায়ের পেছনে পেছনে লাফাতে লাফাতে দূরে চলে যেতে যেতে বলছে, "ও মা, কী সুন্দর দিনটা, মা ; এমন দিনেই তো বেড়াতে যেতে হয় !"

খাবার ঘরের টেবিলের ওপর কেবল এঁটো প্লেট আর খালি ডিস্। তবু সবাই—মা, চার মেয়ে আর তার সঙ্গে এক ভদ্রলোক—মেয়েদের মতোই হাসিখুশি আর গোলাপি চেহারার ভদ্রলোক—বেশ পরিতৃপ্ত অবস্থায় টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে।

লোকে যখন আলুবখরার চাটনি খায়, দেখেছ তো, মাঝে মাঝে ঠোঁটের ফাঁক থেকে আলুবখরার বিচি নিয়ে কেমন পাতে ফেলে দেয় ? এই অদ্ভুত—না-কি ভূতুড়ে বলব ? খাওয়ার আসরের আগা-গোড়াই তেমনি ব্যাপার চলতে লাগল। ফাঁকা কাঁটা-চামচ ঠোঁটের কাছে গিয়ে পৌঁছয়, অমনি ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেশ পরিষ্কার একটা মাংসের টুকরো তার ওপর এসে পড়ে ; কাঁটা-চামচ সেটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে প্লেটের ওপর রেখে দেয়, আর তিনিও অমনই সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের ওপর রাখা মাংসের বড়ো টুকরোটার গায়ে সেঁটে একাকার হয়ে যান। একটু বাদেই মাংসের একটা পুরো দাগা আর দুটো আলু সাজান একটা প্লেট ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে ধরতেই তিনি অম্লানবদনে মাংসের দাগাটা নিয়ে একটা বড়ো পাত্রের মধ্যে বিরাট একখণ্ড মাংসের গায়ে সেটাকে মিশিয়ে দিলেন, আর, আলুদুটোকে একটা ডিশে সাজিয়ে রেখে দিলেন।

খাবার রকম-সকমের চেয়ে ওদের কথাবার্তা আরো উদ্ভট। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সবচেয়ে ছোটো মেয়েটি তার বড়ো দিদিকে বললে, "পাজি, দুষ্টু, খালি বানিয়ে বানিয়ে বলা !"

দিদি খুব একটা কড়া কথা বলবে আশঙ্কা করেছিলাম ; কিন্তু তার বদলে হাসতে হাসতে বাপের দিকে চেয়ে, থিয়েটারে যেমন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে চুপিচুপি কথা বলে, তেমনি করে বললে, "কনে হতে চায় !"

এই কথাবার্তার মধ্যে এবার বাবার বক্তব্য যা শুনতে পেলুম, তা

কেবল পাগলের মুখেই সাজে; তিনি বললেন, "কানে কানে বলে দাও তো মা!"

কিন্তু সে কানে কানে বললে না (মেয়েগুলো কেউই একবারও কথা শুনছে না); বরং বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠল, "তা চাইবে কেন, নিশ্চয়ই চাইবে না! ডলি যে সত্যি কী হতে চায়, তা কি আর জানতে কারও বাকি আছে?"

ছোট্টো ডলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে খুব মিষ্টি রাগ-রাগ ভাব দেখিয়ে বললে, "দেখ, বাবা, আমার পেছনে লাগবে না বলে দিচ্ছি! জানই তো, আমি কক্ষনোও কারও নিত-কনে হতে চাই না!"

বাবা বোকার মতো জবাব দিলেন, "ডলি হবে চার নম্বর নিত-কনে!"

এতক্ষণে সেজো মেয়ে যোগ দিলে। "জান মা, সব পাকাপাকি হয়ে গেছে, সত্যি! মেরি নিজেই আমাদের সব খুলে বললে। আর চার সপ্তাহ পরের মঙ্গলবার দিন হবে—ওর তিন পিসতুতো বোন আসছে নিত-কনে হতে—আর—"

এবার মা হাসতে হাসতে বললেন, "মেরি কিন্তু ভুলবে না নিশ্চয়ই, বুঝলি মিনি! পাকাপাকি হয়ে গেলেই ভালো! কথাবার্তা হবার পর বিয়ে বেশি দিন আটকে থাকাটা ভালো লাগে না বাপু!"

তখন মিনি এই বলে আলোচনায় ইতি টানল—যদি অবশ্য এই উদ্ভুট্টে কথাবার্তাকে আলোচনা বলা যায়— "ভাব একবার! সকাল-বেলা ওদের বাড়ির কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছি, ঠিক তখন-না, মেরি সেই তাকে—মিস্টার কী যেন, ভুলে যাচ্ছি—এগিয়ে দিতে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। আমরা অবশ্য অন্য দিকে তাকিয়ে রইলুম! ভদ্রলোকের নামটা কী যেন, ভুলে যাচ্ছি!"

ইতিমধ্যে আমার এমন ধাঁধা লাগতে আরম্ভ করেছে যে, আর শোনবার চেষ্টা না-করে, রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলুম।

কিন্তু, সে-সব কথা তোমাদের কাছে বলে লাভই-বা কী হবে! তোমরা বাইরে যতই বিশ্বাস করার ভান কর-না কেন, আমি তো জানি, আসলে আমার এই অদ্ভুত কাহিনীর একটা কথাও বিশ্বাস করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ তোমরা! বিরাট মাংসের খণ্ডটা কাবাব সেঁকবার শিকের গায়ে বিঁধিয়ে রাখবার পর কেমন আস্তে আস্তে সেটা কাঁচা হয়ে যেতে লাগল—আলুগুলো কেমন খোসায় মোড়া হয়ে যাবার

পর বাগানে পুঁতে দেবার জন্যে মালির হাতে দেওয়া হল—মাংসটা পুরোপুরি কাঁচা হয়ে যাবার পর আগুনটা গন্‌গনে অবস্থা থেকে কেমন আস্তে-আস্তে শুধু একটুখানি তেতে-ওঠা অবস্থায় এসে পৌঁছল, আর হঠাৎ এমন আচমকা নিবে গেল যে, রাঁধুনিটা কোনোরকমে শেষ ফুলকিটা থেকে দেশলাইয়ের কাঠিটা ধরিয়ে নিলে—কিম্বা ঝি শিক থেকে মাংসটা তুলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে (পিছু হেঁটে অবশ্য) রাস্তায় পড়ে কিছু দূর গিয়ে কী করে মাংসওলার দেখা পেল ; মাংসওলাটাও কেমন (পিছু হেঁটে) বাড়ির দিকেই আসছিল—এ-সব তোমাদের বলে কী লাভ ? বিশ্বাসই তো করবে না, ঠিক করেছ !

যতই ভাবি, রহস্যটা যেন ততই জটিল হয়ে ওঠে ; শেষকালে রাস্তায় আর্থারের সঙ্গে দেখা হতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। 'হল'-এ গিয়ে টেলিগ্রামের খোঁজ নিয়ে আসার কথা বলতে, ও রাজি হল। যেতে যেতে ওকে স্টেশনের ঘটনার কথা বললুম, কিন্তু তার পর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, আপাতত তা নিয়ে কোনো উচ্যবাচ্য না-করাই ভালো বলে মনে হল।

ওদের বাড়িতে ঢুকতেই দেখলুম, আর্ল একলা বসে আছেন। বললেন, "একা পড়ে গেছি, তোমরা এলে, ভালোই হল। মুরিয়েল শুয়ে পড়েছে—স্টেশনের ঐ মারাত্মক ব্যাপারটার পর থেকে এখনো ঠিক সামলে উঠতে পারে নি। এরিক হোটেলে গেছে জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে নিতে, ভোরের ট্রেনেই লণ্ডন যাবে।"

বললুম, "টেলিগ্রাম এসেছে তা হলে ?"

"শোন নি ! ও, আমি ভুলেই গেছি ; তুমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়বার পরই টেলিগ্রাম এল। সব ঠিকই আছে, এরিক সেনাবিভাগের সেই কমিশনটা পেয়েছে। মুরিয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে, কাজেই, লণ্ডনে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা কাজ না-সারলেই নয়।"

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ; আর্থারের মনের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সেই আশঙ্কায় বুক দুরদুর করতে লাগল। জিগেস করলাম, "কিসের ব্যবস্থার কথা বলছেন ?"

বৃদ্ধ আর্ল নরম গলায় বললেন, "ওদের বিয়ে হবে, এমন একটা কথা প্রায় বছরদুয়েক হল ঠিক হয়ে আছে ; মুরিয়েল বাগ্‌দত্তা।

আমি কথা দিয়েছিলাম, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার মতো পাকা কোনো একটা কাজ পেলেই, আমি মত দেব। জীবনে বেঁচে থাকার কোনো লক্ষ্য নেই, এমন-কি, দরকার হলে প্রাণ দেবারও কোনো লক্ষ্য নেই, এমন কারও সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হলে, কিছুতেই খুশি হতে পারতাম না!"

অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন বললে, "আশা করি, ওরা সুখী হবে।" ঘরের মধ্যে থেকেই এল কথাটা, কিন্তু কেউ এলে তো দরজা খোলার আওয়াজ পেতুম! অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। আর্ল-মশাইও কম অবাক হন নি। বলে উঠলেন, "কে কথা বললে?"

আর্থার বললে, "আমি।" আমাদের দিকে তাকালে; দেখলুম তার মুখখানা যেন ভেঙে দুমড়ে গেছে, চোখ থেকে জীবনের আলো যেন নিবে গেছে এক লহমায়। করুণ দৃষ্টিতে আর্লের দিকে তাকিয়ে, তেমনই প্রাণহীন ফাঁপা গলায় বললে, "আপনিও আনন্দে থাকুন, এই কামনা করি!"

বৃদ্ধ আর্ল স্বাভাবিক স্বরে খুশি মনে বললেন, "ধন্যবাদ।"

এর পর খানিকক্ষণ কেউই আর কোনো কথা বলতে পারলুম না। বুঝতে পারলুম, আর্থার এখন নিশ্চয়ই একা থাকতে চায়; তাই আর্লকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। আর্থার তাঁর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলে, কোনো কথা বললে না। পথেও কোনো কথা হল না। বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের বাতি জ্বেলে বসার পর আর্থার বললে, আমাকে শুনিয়ে নয় আত্মগত ভাবেই বললে—" 'মনের তিক্ততা শুধু মনই জানে।'—কথাটার মানে এর আগে বুঝতে পারি নি।"

এর পরের কয়েকটা দিন বড়ো বিচ্ছিরি কাটল। একা একা আর্ল-মশাইয়ের বাড়ি যেতে মন উঠল না; আর্থারকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা উত্থাপন করা তো আরো অসম্ভব। সময়—আমাদের গভীরতম বেদনার উপশম, সকল ব্যথার আরাম—সময় অতিবাহিত হোক, আর্থারের জীবনের সব আলো-নিবিয়ে-দেওয়া এই বিফল প্রত্যাশার প্রথম আঘাতটা সে সামলে উঠুক; ততক্ষণ অপেক্ষা করাই ভালো।

কাজের তাগিদে লণ্ডনে ফেরার প্রয়োজন হয়ে পড়ল; আর্থারকে জানালুম, কিছু দিনের জন্যে ওকে একা রেখে চলে যেতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে বললুম, "মাসখানেকের মধ্যে ফিরে আসতে পারব, মনে হচ্ছে।

উপায় থাকলে, থেকেই যেতুম। এখন তোমার একা না-থাকাই ভালো।"

আর্থার বললে, "সত্যিই, খুব বেশি দিন নিঃসঙ্গতা সইতে পারব না, বিশেষ করে এল্‌ভেস্টনে। কিন্তু, আমার জন্যে চিন্তা কোর না। ভারতে একটা চাকরির প্রস্তাব আছে, সেটাই নেব ঠিক করেছি। বেঁচে থাকবার মতো কিছু একটা হয়তো খুঁজে পাব সেখানে। আপাতত কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছি না। 'ঈশ্বরের মহান দাক্ষিণ্যের প্রসাদে এই জীবন পেয়েছি আঘাত আর অন্যায় থেকে আড়াল করে সন্তর্পণে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে; দুঃখে ভেঙে পড়ে অবহেলায় হারাবার জন্যে নয়'!"

বললাম, "হ্যাঁ, তোমারই নামের একজন এমনই কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন, তবু সে-আঘাত সয়েছিলেন নির্বিকারে।"

আর্থার বললে, "আমার চেয়ে আরো অনেক কঠিন আঘাত। যাকে ভালোবেসেছিলেন, দেখা গেল, তার আসল পরিচয় ভিন্ন। আমার স্মৃতিতে তেমন কোনো মলিনতা নেই, আমি যার কথা—" কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তাড়াতাড়ি বললে, "তুমি কিন্তু ফিরে এস; আসবে তো?"

"হ্যাঁ, অল্প কয়েকদিনের জন্যে আসব।"

আর্থার বললে, "তা-ই এস, আর আমাদের এখানকার বন্ধু-বান্ধবদের কথা আমায় চিঠিতে জানিও। ওখানে গিয়ে গুছিয়ে বসেই তোমায় আমার ঠিকানা পাঠিয়ে দেব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙেদের জন্মদিনের আনন্দমেলা

সিল্‌ভি আর ব্রুনো সাধারণ ছেলেমেয়ের মতো চেহারা নিয়ে সেই যে বিদায় নিয়ে গেল, তার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এল্‌ভেস্টন ছেড়ে যাবার আগে সেই বনের মধ্যে শেষবারের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি আবার ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ঘাসে-ভরা সমতল জমির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে আড় হতেই সেই 'ছম্‌ছমানি' ভাবটা টের পেলুম।

ব্রুনো বললে, "তোমার কানটা একটু ভালো মতন কাছে নিয়ে এস, একটা গোপন কথা বলি! আজকে ব্যাঙেদের জন্যে জন্মদিনের উৎসব হবে, অথচ খোকাকেই পাওয়া যাচ্ছে না!"

কথাটা শুনে ভারি গোলমেলে মনে হল, বললাম, "খোকা? কোন খোকা?"

ব্রুনো বললে, "রানীর খোকা, আবার কোন খোকা! টাইটানিয়ার খোকা। আমাদের ভালো মতন খারাপ লাগছে। আর সিল্‌ভি—তার তো ভীষণ মন খারাপ!"

আমি দুষ্টুমি করে জিগেস করলুম, "কতখানি মন খারাপ?"

ব্রুনো বেশ গম্ভীর হয়েই জবাব দিলে, "পৌনে এক গজ। আমারও একটু একটু মন খারাপ হয়েছে!" বলে, মুখের হাসিটুকু যাতে চোখে না-পড়ে, তার জন্যে নিজেই চোখ বুজে ফেললে।

"তা খোকার জন্যে কী ব্যবস্থা করছ ?"

"সৈন্যরা সব খুঁজে দেখছে—সব জায়গায়—আঁতি-পাতি করে খুঁজছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সৈন্যরা ?"

ব্রুনো বললে, "সৈন্যরাই তো। লড়াই-টড়াই না থাকলে সৈন্যরা ছোটোখাটো সবরকম কাজই করে, জান-না ?"

রাজার ছেলেকে খুঁজে বার করাটা যে 'ছোটোখাটো' কাজ, জেনে ভারি মজা লাগল। জিগেস করলুম, "তা, তাকে হারালে কী করে ?"

ইতিমধ্যে সিল্‌ভি এসে পড়েছিল ; সে উত্তর দিলে, "আমরা তাকে একটা ফুলের ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না, কোন ফুলটায় রেখেছি !" সিল্‌ভির চোখে জল এসে পড়ল।

ব্রুনো বলে উঠল, "পাছে আমার দোষ হয়, তাই সিল্‌ভি বলছে, 'আমরা'। আসলে কিন্তু ওকে ফুলের ভেতর রেখেছিলুম আমিই। সিল্‌ভি ডিগুল্‌ডাম তুলছিল।"

বললুম, "এস, আমিও একটু খুঁজে দেখি, যদি তোমাদের কিছু সুরাহা হয়।" এই বলে সিল্‌ভিতে আমাতে ফুলে ফুলে তল্লাসি চালাতে লাগলুম। কিন্তু খোকার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

খোঁজার পালা শেষ করে ব্রুনোকে দেখতে না পেয়ে বললুম, "ব্রুনো গেল কোথায় ?"

সিল্‌ভি বললে, "ঐ যে, ঐ গর্তটার মধ্যে ; একটা বাচ্ছা ব্যাঙের সঙ্গে মজা করছে।"

বাচ্ছা ব্যাঙের সঙ্গে কী করে মজা করতে হয়, তাই দেখবার জন্যে ভারি কৌতূহল হচ্ছিল, তাই হাতে-পায়ে ভর দিয়ে নিচু হয়ে ব্রুনোকে খুঁজতে লাগলুম। মিনিট খানেকের মধ্যেই দেখতে পেলুম, সেই গর্তটার কিনারায় ছোটো একটা ব্যাঙের পাশে ব্রুনো খুব ব্যাজার মুখ করে বসে রয়েছে।

"কেমন চলছে গো ব্রুনো ?" কথার আওয়াজে ব্রুনো মুখ তুলে তাকালে। খুব হতাশ স্বরে বললে, "ও আর একটুও মজা পাচ্ছে না। কী করতে চায়, তা বলছেই না মোটে, তা কী করব। কত পানা দেখলুম, কত মাছির ডিম দেখালুম—কিছুই বলে না !" তার পর ব্যাঙটার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে চীৎকার করলে, "কী—ইচ্ছে—করছে ?" কিন্তু ব্যাঙটা নির্বিকার, ওকে গ্রাহ্যই করলে না। একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মুখ ফিরিয়ে বললে, "কালা বোধ হচ্ছে! যাক, থিয়েটারের জোগাড় করার সময় হল।"

"থিয়েটার দেখবে কারা?"

ব্রুনো বললে, "কেবল ব্যাঙেরা। তবে সবাই এখনো আসে নি। ভেড়াদের মতো তাড়িয়ে না-আনলে ওরা আসতে চায় না।"

বললুম, "তুমি যতক্ষণ থিয়েটারের জোগাড় করবে, ততক্ষণ সিল্‌ভির

সঙ্গে যদি আমি ঘুরে ঘুরে ব্যাঙেদের তাড়িয়ে নিয়ে আসি, তা হলে কি সময় বাঁচান যায় ?”

ব্রুনো বললে, “বেশ ভালো কথা। কিন্তু সিল্‌ভি কই ?”

পাড়ের এক ধার থেকে সিল্‌ভি বললে, “এই যে, এখানে! দুটো ব্যাঙ দৌড়ের রেস দিচ্ছিল, তাই দেখছিলুম।' ”

ব্রুনো সাগ্রহে জানতে চাইলে, “কোনটা জিতল ?”

সিল্‌ভি কী বলবে, ভেবে পেল না। আড়ালে আমায় বললে, “এমন অসুবিধেয় ফেলে !”

জিগেস করলুম, “থিয়েটারে কী হবে ?”

সিল্‌ভি বললে, “প্রথমে ব্যাঙেরা জন্মদিনের ভোজ খাবে, তার পর ব্রুনো সেক্সপীয়রের নাটক থেকে খানিকটা খানিকটা অভিনয় করে দেখাবে, তার পর গল্প শোনাবে।”

“ভোজটাই, মনে হচ্ছে, সবচেয়ে ভালো লাগবে ওদের। তাই-না ?”

“মুস্কিল হচ্ছে, ভোজ খেতে পাচ্ছেই-বা কজন। এমন শক্ত করে মুখ বন্ধ করে রাখে না! তবে একপক্ষে ভালোই করে, কারণ ব্রুনো সখ করে নিজেই রাঁধে তো; আর, ভারি উদ্ভুট্টে রান্না রাঁধে। যাক, সব্বাই এসে গেছে। যেদিকে নাটক হবে, সেইদিকে ওঁদের মুখ ফিরিয়ে বসিয়ে দিতে হবে; আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাবে ?”

ওদের একদিকে মুখ ফিরিয়ে বসিয়ে দিতে বেশি সময় লাগল না, যদিও সারাক্ষণই ব্যাঙগুলো অসন্তোষের সুরে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করতে লাগল।

সিল্‌ভিকে জিগেস করলুম, “কী বলতে চাইছে ওরা ?”

বলতে বলতেই ব্রুনো একটা এপ্রন পরে এসে উপস্থিত—যাতে বোঝা যায় যে সে-ই রাঁধুনি। তার হাতে একটা হাণ্ডা, তাতে অদ্ভুত দেখতে একরকমের স্যুপ। ব্যাঙেদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গিয়ে যখন সে ঘুরতে লাগল, আমি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলুম; কিন্তু কোনো ব্যাঙকেই খাবার জন্যে মুখ খুলতে দেখলুম না—কেবল একটা খোকা-ব্যাঙ হাঁ করেছিল বটে, কিন্তু আমি প্রায় জোর করেই বলতে পারি, সেটা হঠাৎ হাই তুলতে গিয়ে। সে যাই হোক, ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে বড়ো এক চামচে স্যুপ ঢেলে দিলে, আর সে বেচারি বেশ কিছুক্ষণ ধরে খক্‌খক্‌ করে কাশতে লাগল।

তার পর বাকি স্যুপটুকু সিল্‌ভিতে আমাতে মিলে শেষ করতে হল,

আর খেয়ে ভালো লাগার ভাবও দেখাতে হল—সত্যিই কী উদ্ভুট্টে রান্না

সাহস করে এক চামচ খেয়েই টের পেয়েছিলুম যে, খেতে খুবই খারাপ। অতিথি-অভ্যাগতরা সবাই যে জোর করে মুখ বন্ধ করে বসেছিল, দেখলুম, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সিল্‌ভি চামচটা ঠোঁটে ঠেকিয়েই মুখ বিকৃত করে জিগেস করলে "কিসের স্যুপ রে ব্রুনো?"

ব্রুনোর উত্তর শুনে খাবার উৎসাহ কিছু বাড়ল না; বললে, "এটা-সেটা নানারকম জিনিসের টুকরো-টাকরা দিয়ে।"

সিল্‌ভির কথামতো এবার ব্রুনোর সেক্সপীয়রের নাটক থেকে অভিনয় করে দেখাবার কথা; তাই সিল্‌ভি তখন ব্যাঙগুলোকে স্টেজের দিকে ফিরিয়ে বসাবার কাজে লেগে গেল। অভিনয় হয়ে গেলে ব্রুনো ওদের গল্প শোনাবে।

ব্রুনো তখন ঝোপের আড়ালে গিয়ে নাটকের জন্যে সাজগোজ করছে; সেই ফাঁকে সিল্‌ভিকে জিগেস করলুম, "ব্রুনো যে-গল্প বলবে, তার কি কোনো নীতি-উপদেশ থাকবে?"

সিল্‌ভি একটু অনিশ্চয়তার সঙ্গে বললে, "মনে তো হয়, থাকবে। ওর গল্পে সচরাচর নীতি-উপদেশ থাকে, তবে বড্ডো গোড়ার দিকেই দিয়ে ফেলে।"

"সেক্সপীয়রের নাটকের সবটাই করবে না-কি?"

সিল্‌ভি বললে, "না, শুধু অঙ্গভঙ্গি করবে। নাটকের কথা তো ও কিছুই জানে না। ওর পোশাক দেখে ব্যাঙেদের জানিয়ে দেব, কোন চরিত্রের অভিনয় করছে। ব্যাঙগুলো শুরু থেকেই আন্দাজে সেটা ধরে ফেলবার জন্যে এত তাড়াহুড়ো করে না! শুনছ না, কেবলই বলছে "কং? কং?" মানে, "কী? কী?" সত্যিই, ব্যাঙগুলো ঐরকম করে ডাকছিল! আগে গ্যাঙ গ্যাঙ আওয়াজ বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু সিল্‌ভি ঐ কথা বলার পর, পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, বলছে "কং? কং?"

"কিন্তু দেখবার আগেই জানবার জন্যে এত তাড়া কিসের?"

সিল্‌ভি বললে, "কি জানি, কিন্তু বরাবর ওরা ঐরকম করে। অনেক সময়ে থিয়েটারের বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই করে।"

(বুঝতে পারছ তো, এবার থেকে যখনই শুনতে পাবে, ব্যাঙেরা

একটা বিশেষ ধরনের করুণস্বরে ডাকছে, অমনি ধরে নেবে যে, ওরা সেক্সপীয়রের নাটকে ব্রুনোর ভূমিকা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে। কী মজার ব্যাপার বল তো ?)

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ ব্যাঙেদের জটলার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে ব্রুনো আবার নতুন করে তাদের গুছিয়ে বসাতে শুরু করতেই অবশ্য তাদের সরব কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

সবচেয়ে ধেড়ে আর গোব্দা ব্যাঙটাকে কিছুতেই স্টেজের দিকে ফিরিয়ে বসান যায় নি বলে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, আর তাইতে বিরক্ত হয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে অন্য-সব ব্যাঙকে ইতিমধ্যে এলোমেলো করে দিয়েছে, কয়েকটাকে আবার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাই জন্যেই ব্রুনোকে আবার হাত লাগাতে হল। চায়ের কাপে চামচ নাড়ার মতো করে একটা কাঠি দিয়ে সে ব্যাঙগুলোকে নাড়াতে লাগল ; আর তার ফলে সবকটা ব্যাঙেরই অন্তত একটা করে বোকা-মার্কা ড্যাবড্যাবে চোখ স্টেজের দিকে ফেরান রইল।

হাল ছেড়ে দিয়ে ব্রুনো শেষকালে বললে, "তোমাকেও ওদের সঙ্গে এসে বসতে হবে, সিল্‌ভি। এই দেখ-না, এই দুটোকে একই দিকে নাক করে কতবার যে পাশাপাশি বসালুম, কিন্তু কেবলই নড়বড় করে সরে সরে যাচ্ছে !"

সিল্‌ভিকেই আবার ব্যবস্থাপনার ভার নিতে হল। ব্রুনো সাজ-গোজ করবার জন্যে আবার ঝোপের পেছনে গা-ঢাকা দিল।

সিল্‌ভির পরিচিত মিষ্টি গলা শুনতে পেলুম, "হ্যামলেট !" সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙদের গ্যাঙানি থেমে গেল ; আর, সেক্সপীয়রের নাটকের বিখ্যাত চরিত্র, হ্যামলেটকে ব্রুনো কী ছাঁচে ঢেলেছে, তাই দেখবার কৌতূহল নিয়ে আমিও স্টেজের দিকে তাকালুম।

দেখা গেল, আমাদের ক্ষুদে নাট্যবিশারদের কল্পনা অনুযায়ী হ্যামলেটের পরনে একটা খাটো আলখাল্লা (বেশির ভাগ সময়েই ব্রুনো সেটা দিয়ে মুখে চাপা দিচ্ছে, দাঁত কন্‌কন্ করলে লোকে যেমন গালে কাপড় চেপে ধরে)। ব্রুনো স্টেজে এসেই পর পর কয়েকটা ডিগবাজি খেলে, আর তাইতে তার আলখাল্লাটা খুলে পড়ে গেল।

ব্রুনো যেভাবে হ্যামলেটের চরিত্রকে উপস্থিত করলে, তাতে হ্যামলেটের মর্যাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে মনে হল ; একটু হতাশ

হলুম। সিল্‌ভিকে কানে-কানে জিগেস করলুম, "কথা কিছু বলবে না?"

সিল্‌ভিও ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দিলে, "মনে তো হয় না। কথা জানা না-থাকলেই ও ডিগবাজি খায়।"

সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে ব্রুনো ততক্ষণে স্টেজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর ব্যাঙেরা সবাই সমস্বরে পরের ভূমিকার পরিচয় জিগেস করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

"এক্ষুনি জানিয়ে দেওয়া হবে!" বলে সিল্‌ভি দু-তিনটে ব্যাঙকে আবার সোজা করে বসিয়ে দিলে; তারা ইতিমধ্যে গোঁত্তা মেরে মেরে উল্টো হয়ে বসেছিল।

ম্যাকবেথ সেজে ব্রুনোর প্রবেশ। কী একটা কাপড় কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে অন্য দিকের বগলের তলা দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে, বুঝলুম, স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা 'প্লেড' বলে যে চাদরের মতন জিনিস কাঁধে ফেলে, ব্রুনো তারই নকল করতে গেছে। গাছের একটা কাঁটা মুঠোয় ধরা; হাতটা এমনভাবে সামনে বাড়িয়ে রেখেছে, যেন কাঁটাটাকে তার নিজেরই ভয় করছে। দ্বিধাভরে ম্যাকবেথ প্রশ্ন করলে, "এটা কি ছোরা?" ব্যাঙেদের তরফ থেকে সমস্বরে জবাব এল, "কাঁটা! কাঁটা!" (ইতিমধ্যে আমি ব্যাঙেদের ভাষা শিখে ফেলেছি।)

সিল্‌ভি কর্তৃত্বের সুরে বলে উঠল, "ওটা ছোরা! একদম মুখ বন্ধ করে থাক!" সঙ্গে সঙ্গে গ্যাঙানি বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যাকবেথের যে বাড়িতে ডিগবাজি খাবার পাগলামি ছিল, সেক্সপীয়র এমন কোনো কথা যদিও বলে যান নি, তবু, দেখা গেল, ডিগবাজি খাওয়াটাকে ব্রুনো ম্যাকবেথ চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছে— ডিগবাজি খেতে খেতেই সে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল। যাই হোক, কিছুক্ষণ বাদেই আবার যখন স্টেজে নামল, তখন দেখা গেল থুতনিতে একগোছা পশমের থোপা লাগিয়ে এসেছে (ঘুরতে ঘুরতে কোনো ভেড়ার গায়ের লোম বোধ হয় গাছের কাঁটায় আটকে গিয়েছিল), তাতে খুব সুন্দর দাড়ির মতো হয়েছে, পা পর্যন্ত লোটাচ্ছে।

সিল্‌ভি চেঁচিয়ে বলে দিলে, "শাইলক!—না, না, মাফ করবেন! কিং লীয়র! মুকুটটা দেখতে পাই নি।" (একটা ড্যাণ্ডিল্যায়ন ফুলের

মাঝখানটায় মাপসই গর্ত করে মাথা খাটিয়ে ব্রুনো বেশ চমৎকার মুকুটটি তৈরি করেছে।)

কিং লীয়র বুকের ওপর আড়াআড়ি করে হাত রাখলেন (তাতে দাড়িটার খুবই দুরবস্থা হল), তার পর যেন দর্শকদের সন্দেহ

নিরসনের জন্যে মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আগাপাশতলা একেবারে রাজা!" তার পরে এমনভাবে থেমে গেলেন, যেন মনে হল কথাটা কী করে প্রমাণ করা যায়, তাই ভাবছেন। ব্রুনোর সঙ্গে আমার মতে মিলবে না, জানি, তবু এইখানে আমি একটা মন্তব্য না-করে থাকতে পারছি না: তাঁর বিয়োগান্ত নাটকের এই তিনটি নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের চাল-চলনে যে এমন অবিশ্বাস্য মিল থাকবে, সেক্সপীয়র নিশ্চয়ই তা চান নি, আর ডিগবাজি খাওয়ার ক্ষমতাটা যে রাজবংশে জন্মাবার কোনোরকম প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে, এমন ধারণাও তিনি বোধ হয় মেনে নিতে রাজি হতেন না! তবু, দেখা গেল, অমন গভীর চিন্তার পরেও কিং লীয়র ডিগবাজি খাওয়া ছাড়া রাজ-পরিচয়ের প্রমাণ দেবার অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না; এবং যেহেতু সেক্সপীয়র থেকে অভিনয়ের এইটাই শেষ মওকা (সিল্ভি কানে কানে জানিয়ে দিয়েছে, 'একসঙ্গে তিনটের বেশি আমরা কক্ষনো করি না'), তাই ব্রুনো বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুধু ডিগবাজিই খেতে লাগল এবং ডিগবাজি খেতে খেতেই স্টেজ থেকে বিদায় নিলে। বিমুগ্ধ ব্যাঙেরা "আরো হোক! আরো হোক।" বলে চীৎকার জুড়ে দিলে। কিন্তু, যথা নির্দিষ্ট সময়ে গল্প বলার আগে ব্রুনো আর দেখা দিল না।

শেষপর্যন্ত নিজের স্বাভাবিক চেহারায় যখন আবার সে স্টেজে এল, তখন তার চাল-চলনে বিশেষ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। একবারও ডিগবাজি খেলে না। বোঝা গেল, ব্রুনোর মতে, হ্যামলেট বা কিং লীয়রের মতো আজে-বাজে চরিত্রের পক্ষে ডিগবাজি খাওয়াটা অশোভন না-হলেও, ব্রুনোর মতো ব্যক্তির পক্ষে ডিগবাজি খেয়ে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তবে, সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার বোঝা গেল যে, কোনোরকম সাজগোজের আড়াল না-পেয়ে, একদম একা স্টেজে দাঁড়িয়ে সে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না। "একটা নেংটি ইঁদুর ছিল—" বলে বেশ কয়েকবার অবশ্য আরম্ভ করার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঐপর্যন্ত বলে ওপর-নীচ, এপাশ-ওপাশ—চারিদিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল, মনে হল যেন গল্প বলবার জন্যে আর-একটু জুতসই কোনো জায়গার সন্ধান করছে। স্টেজের একপাশটা খানিক আড়াল করে একটা ফক্স-গ্লাভ ফুলের গাছ ছিল, সন্ধেবেলাকার বাতাসে সেটা এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে—সেইটাই মনে হল কথক-ঠাকুরের মনে

ধরেছে। মন স্থির করার পর আর বিশেষ সময় লাগল না ; কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে কাঠবিড়ালির মতো তর্‌তর্‌ করে গাছটার ডাল বেয়ে হেলে-পড়া ডগাটায় গিয়ে দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল ; সেখানে ঘণ্টার মতো ফুলগুলো গোছা হয়ে ঝুলছে। আর, দর্শকদের চেয়ে অত উঁচুতে বসতে পেয়ে তার সমস্ত সঙ্কোচও উধাও হয়ে গেছে ; বেশ খুশি হয়ে সে গল্প বলতে শুরু করে দিলে।

"এক সময়ে, একটা নেংটি ইঁদুর ছিল আর কুমির ছিল আর একটা লোক ছিল আর ছাগল ছিল আর সিংঘ ছিল।" একটা গল্পের শুরুতেই যে অতগুলো পাত্রপাত্রী থাকে, এবং অমন তড়্‌বড়্‌ করে যে তারা সব এক জায়গায় এসে জড়ো হয়ে যায়, এ আমি আগে কখনো শুনি নি, তাই আমার তো প্রায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। এমন-কি, সিল্‌ভি পর্যন্ত সড়াৎ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিয়ে ফেললে, আর, তিনটে ব্যাঙ, বোধ হয় ব্যাজার হয়েই, লাফাতে লাফাতে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল, তাদের আটকাবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না।

"সেই ইঁদুরটা একটা জুতো দেখতে পেলে ; ভাবলে, ওটা বুঝি ইঁদুর-ধরা কল। তাই ভেবে, সে সেই জুতোর ভেতর ঢুকে পড়ল, আর দিনের পর দিন সেখানেই রয়ে গেল।"

সিল্‌ভি জিগেস করে ফেললে, "কেনই-বা রয়ে গেল ?"

ব্রুনো বুঝিয়ে দিলে, "কারণ ও ভেবেছিল, ওখান থেকে আর বেরতে পারবে না। ইঁদুরটা খুব চালাক ছিল তো, তাই জানত যে, কল থেকে বেরতে পারবে না !"

সিল্‌ভি জিগেস করলে, "তা হলে ভেতরে ঢোকবারই-বা কী দরকার ছিল ?"

প্রশ্নটাতে কান না-দিয়ে ব্রুনো বলে চলল, "ইঁদুরটা খালি লাফায় আর লাফায় আর লাফায় ; লাফাতে লাফাতে শেষকালে আবার বাইরে বেরিয়ে এল। তখন সে জুতোর গায়ের ছাপটা দেখলে। সেখানে লোকটার নাম লেখা ছিল। তখন সে বুঝতে পারলে যে, জুতোটা তার নিজের নয়।"

সিল্‌ভি বললে, "আগে নিজের বলে ভেবেছিল না-কি ?"

বিরক্ত হয়ে কথক-ঠাকুর বললেন, "আগে বললুম না, ও জুতোটাকে ইঁদুর-ধরা কল ভেবেছিল ? মশাইবাবু, সিল্‌ভি যাতে মন দিয়ে শোনে,

তার ব্যবস্থা করুন তো!" সিল্‌ভি মুখ বন্ধ করে মন দিতে লাগল। আসলে শ্রোতার মধ্যে তখন সিল্‌ভি আর আমিই বলতে গেলে সম্বল, কারণ সামান্য কয়েকটা ছাড়া আর সব ব্যাঙই থপ্‌থপিয়ে কেটে পড়েছে।

"কাজেই ইঁদুর তখন সেই লোককে জুতোটা দিয়ে দিলে। আর সেই লোকটা খুব ভালো মতন খুশি হয়ে গেল, কারণ ওর তো একটাই জুতো ছিল, আর এক পাটি পাবার জন্যে খুব থপ্‌থপ্‌ করছিল।"

একটা প্রশ্ন করে বসলুম, " 'থপ্‌থপ্‌' না 'ছট্‌ফট্‌', কী বলতে চাইছ?"

ব্রুনো বললে, "দুই-ই। তখন সেই লোক ছাগলটাকে থলে থেকে বার করলে।" (আমি বললুম, "আগে তো থলের কথা শুনি নি।" ব্রুনো জবাব দিলে, "পরেও আর শুনবে না।") "আর, লোকটা ছাগলকে বললে, 'আমি যতখন ফিরে না আসি, তুমি এইখানে বেড়াও।' লোকটা যেই না চলে যাওয়া, আর ছাগলটা গত্তের ভেতর পড়ে গেছে। গত্তের ভেতর খালি পাক খাচ্ছে আর পাক খাচ্ছে। তাপ্পর ছাগলটা গাছতলায় এসে বেড়াতে লাগল। ন্যাজ নাড়তে লাগল। ঘাড় উঁচু করে গাছের দিকে চাইল। একটা খুব কান্নার গান গাইল। এমন কান্নার গান তোমরা কখনো শোন নি!"

জিগেস করলুম, "গানটা গেয়ে শোনাতে পার, ব্রুনো?"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "হ্যাঁ, পারি। কিন্তু গাইব না। গাইলে সিল্‌ভি কেঁদে ফেলবে।"

চটে উঠে সিল্‌ভি বললে, "না, গান শুনে মোটেই কাঁদব না! আর, ছাগলে গান গেয়েছে, এ কথা একদম বিশ্বাস করি না!"

ব্রুনো বললে, "কিন্তু গাইল তো! সবটা গেয়েছে। আমি দেখেছি, লম্বা দাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গান গেয়েছে—"

ওকে ভ্যাবাচাকা খাওয়াবার জন্যে ইচ্ছে করেই বললাম, "দাড়ি কাঁপিয়ে গান গাইবে কী করে, ব্রুনো? গলা কাঁপিয়ে—"

আমায় থামিয়ে দিয়ে বিজয়গর্বে ব্রুনো বলে উঠল, "তা হলে সিল্‌ভিকে নিয়ে বেড়াও কী করে? লোকে তো লাঠি নিয়ে বেড়াতে যায়!"

বুঝলুম, সিল্‌ভির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। ব্রুনোর কাছে চালাকি খাটবে না।

"সব গানটা গেয়ে ছাগলটা তখন দৌড়ে পালিয়ে গেল—সেই লোকটাকে খোঁজবার জন্যে, বুঝলে? আর, সেই কুমিরটা ওর পেছন পেছন ধাওয়া করলে—ওকে কামড়াবে বলে, বুঝলে? আর, ইঁদুরটা সেই কুমিরের পেছন পেছন ধাওয়া করলে।"

সিল্‌ভি জানতে চাইলে, "কুমিরটা দৌড়ুচ্ছিল তো?" আমাকে সালিসী মানলে, "কুমির তো দৌড়তে পারে, তাই-না?"

আমি বললুম যে, 'হামাগুড়ি' বলাই ভালো।

ব্রুনো বললে, "কুমিরটা দৌড়েও ছিল না, হামাগুড়িও দিয়েছিল না। খুব গোব্‌দা থলের মতো ধেবড়ে ধেবড়ে এট্টু এট্টু করে এগোচ্ছিল। আর থুতনিটাকে খুব উঁচু করে রেখেছিল—"

সিল্‌ভি বললে, "সেটা আবার কেন?"

ব্রুনো বললে, "দাঁতের ব্যাতা করছিল না বলে, আবার কেন? আমি বুঝিয়ে না-দিলে কি কিছুই মাথায় ঢোকে না! আরে, দাঁতে ব্যাতা করলে তো মুখ নিচু করেই থাকত, আর গাদা গাদা গরম চাদর জড়িয়ে রাখত!"

সিল্‌ভি ছাড়বার পাত্রী নয়; বললে, "গরম চাদর থাকলে তো!"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "গরম চাদর তো ছিলই! তুমি কি মনে কর, কুমিররা গরম চাদর না-নিয়েই বেড়াতে যায়? কুমিরটা তখন ভুরু কোঁচকালে। আর, তখন, সেই ভুরু দেখে ছাগলটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল!"

সিল্‌ভি বললে, "আমি হলে ভুরু দেখে কখনো ভয় পেতাম না!"

"কেমন ভয় পেতে না দেখতুম, যদি ভুরুর সঙ্গে একটা কুমির লাগানো থাকত; এ-ভুরুটার তো তাই ছিল!—তখন সেই লোকটা লাফাতে লাগল, লাফাতে লাগল, আর লাফাতে লাফাতে গত্তের বাইরে বেরিয়ে গেল।"

আবার একবার সিল্‌ভির দম আটকে আসার উপক্রম হল। গল্পটা এমন এলোপাথাড়ি বিভিন্ন পাত্রপাত্রীতে ঢুঁ মারতে মারতে এগোচ্ছে, যে হাঁফ ধরে গেছে বেচারির।

"তাপ্পর সে দৌড়ে চলে গেল—ছাগলটার খোঁজ করতে, বুঝলে? তাপ্পর শুনতে পেলে যে, সিংঘটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে—"

সিল্‌ভি বললে, "সিংহ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে না।"

ব্রুনো বললে, "এ-সিংঘটা করেছিল। এর মুখটা একটা আলমারির মতন বড়ো। মুখের ভেতর অনেক জায়গা। সিংঘটা লোকটার পেছনে ধাওয়া করলে—খাবে বলে, বুঝলে? ইঁদুরটা তখন সিংঘের পেছনে ধাওয়া করলে।"

বললুম, "নেংটি ইঁদুরটা কিন্তু কুমিরের পেছনে ধাওয়া করেছিল একসঙ্গে দুজনের পেছনে ধাওয়া করবে কী করে?"

দর্শকদের ভীড় একেবারে পাতলা হয়ে গেছে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেও পরম ধৈর্যে ব্রুনো বুঝিয়ে দিলে, "দুজনের পেছনেই ছুটছিল ইঁদুরটা। কেননা, তিনজনে একই দিকে যাচ্ছে তো! প্রথমে কুমিরটাকে ধরে ফেললে, তার পর সিংঘটাকে ধরে ফেললে না। যখন কুমিরটাকে ধরলে, তখন কী করলে বল দিকিনি—ওর পকেটে একটা সাঁড়াশি ছিল কিনা, তাই দিয়ে কী করলে বল দিকিনি?"

সিল্‌ভি বললে, "ধরতে পারছি না।"

ব্রুনো আনন্দে আটখানা হয়ে উঠে বললে, "কেউ ধরতে পারে নি! আরে, বুঝতে পারছ না—কুমিরের দাঁত উপড়ে নিলে!"

আমি ভরসা করে জিগেস করে ফেললুম, "কোন দাঁত?"

ব্রুনো কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালে না। "যে-দাঁত দিয়ে সে ছাগলটাকে কামড়াতে যাচ্ছিল, সেই দাঁতটা, আবার কোন দাঁত!"

বললুম, "একটা দাঁত ওপড়ালে কি সে-ভয় মিটতে পারে? তা হলে তো সব কটা দাঁত তুলে ফেলতে হয়!"

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে, সামনে-পিছনে হেলে-দুলে ব্রুনো সুর করে বলতে লাগল, "ছাগলটা—সবকটা দাঁত—তুলে ফেলল—গো!"

সিল্‌ভি বললে, "কুমিরটা অতগুলো দাঁত তোলবার সময় দিল কেন?"

ব্রুনো বললে, "বসে বসে সময় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না যে!"

আমি আর একটা প্রশ্ন করে ফেললুম, "সেই যে লোকটা ছাগলকে বলে গেল, 'আমি যতক্ষণ ফিরে না-আসি, ইচ্ছে করলে তুমি এইখানে বেড়াতে পার'—তার কী হল?"

ব্রুনো বললে, "লোকটা 'বেড়াতে পার' বলে নি; বলেছিল, 'বেড়াও'। যেমন সিল্‌ভি আমায় বলে, 'তুমি বারোটা পর্যন্ত পড়বে।' ওহ্‌, সিল্‌ভি যদি বলত, 'তুমি ইচ্ছে করলে বারোটা পর্যন্ত পড়তে পার, তা হলে কী ভালোই হত!' এ-নিয়ে আলোচনা করতে সিল্‌ভির ভরসা

হল না, তাই গল্পের খেই ধরিয়ে দিয়ে বললে, "কিন্তু সেই লোকটার কী হল ?"

"সিংঘটা ওকে তাগ করে লাফ দিলে। কিন্তু এত আস্তে লাফ দিলে যে, খুব দেরি করে এগোতে লাগল—কয়েক হপ্তা ধরে হাওয়ায় ভেসেই রইল—"

বললুম, "আর, সেই লোকটা ততক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল ?"

মাথা নীচের দিকে করে সড়্‌সড়্‌ করে ফক্স-গ্লাভ গাছের ডাঁটি বেয়ে নামতে নামতে ব্রুনো জবাব দিলে, "মোটেই নয় !" বোঝা গেল গল্প শেষ হয়ে এসেছে। "সিংঘটা যখন লাফ দিয়ে আসছে, তার মধ্যে লোকটা তার বাড়ি বেচে দিলে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ফেললে, তাপ্পর অন্য শহরে গিয়ে ঘরকন্না করতে লাগল। কাজেই সিংঘ একটা ভুল লোককে খেয়ে ফেললে।"

বোঝা গেল, এইটাই গল্পের নীতি-উপদেশ। তাই সিল্‌ভি ব্যাঙেদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলে, "গল্প শেষ ! এ-থেকে যা শেখবার মতো কথা, সেটা হল—" বাকিটা আমার কানে কানে শেষ করলে, "—আমার একদম জানা নেই !"

আমি নিজেও কোনো হদিশ পাই নি, তাই কোনোরকম ইঙ্গিত দিতে পারলুম না। নীতি থাকুক আর না-ই থাকুক, ব্যাঙেরা বেশ খুশি। থপ্‌থপ্‌ করে লাফিয়ে চলে যেতে যেতে ঘ্যাঁসঘ্যাঁসে গলায় বলতে লাগল, "গচ্ছং ! গচ্ছং !"

আর্থার, মুরিয়েল আর আর্লের কাছে বিদায় নিয়ে লণ্ডনের ট্রেনে চড়ে বসলাম নির্দিষ্ট দিনে। ট্রেন যতই লণ্ডনের দিকে এগোতে লাগল, এল্‌ভেস্টনের জন্যে ততই মন-কেমন করতে লাগল। আমার ছেড়ে-আসা বন্ধুদের সঙ্গে—বিশেষ করে, সিল্‌ভি আর ব্রুনোর সঙ্গে—আবার কবে দেখা হবে, কে জানে !

ট্রেনের চাকার মাপা-মাপা একঘেয়ে শব্দ কানে এসে বাজছে ; মনে হচ্ছে, বলছে, "গচ্ছং ! গচ্ছং ! গচ্ছং ! গচ্ছং !"

[মূল রচনায় এর পরেও আরো একটি পরিচ্ছেদ আছে ; এবং তার পরেও আছে 'সিল্‌ভি-ব্রুনোর উপসংহার' নামে এই কাহিনীরই পরবর্তী পর্যায় ; আকারে প্রথম পর্যায়ের চেয়ে কিছু বড়োই হবে।

প্রথম পর্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে সিল্‌ভি বা ব্রুনোর কোনো প্রসঙ্গ নেই ; ঘটনার নতুন কোনো 'পরিণতিও নেই। যা আছে, তা কথোপকথনের মাধ্যমে ধর্ম এবং ধর্মাচরণ সম্বন্ধে জটিল দার্শনিক আলোচনা। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে আমরা এই পরিচ্ছেদেই প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তিরেখা টানলাম। সম্পূর্ণতা দেবার জন্য শেষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি জুড়ে দিতে হল।

'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র মূল শেষ পরিচ্ছেদটি এই খণ্ডের শেষে আলাদাভাবে সংকলিত হল 'সিল্‌ভি-ব্রুনোর উপসংহার' দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে।]

ছোটোগল্প

লুইস ক্যারল ছদ্মনামে বিখ্যাত হবার আগেও চার্লস ডজ্‌সন কয়েকটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন, সেগুলি তেমন বিখ্যাত নয়। 'ব্রুনোর প্রতিহিংসা' নামে যে ছোটো গল্পটি আলাদা প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি পরে 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেইরকম, 'ট্যাঙ্গল্‌ড টেল' নামে একটি ছোটোগল্প আলাদা বের হয়েছিল, সেটি অ্যালিস-কাহিনীর ঐ চোখের-জলে-সাঁতার-কাটা ইঁদুরের পরিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়েছে। ছোটোগল্প হিসাবে এই খণ্ডে সেগুলিকে স্থান দেওয়া হল না।

'ক্রাগুল ক্যাসেল'-এর 'গাগি' আর 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র আংগাগ্‌-এর মধ্যে সাদৃশ্য খুবই প্রকট।

অভিনব ফোটোগ্রাফি

মানুষের মনের ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা, ইত্যাদির ব্যাপারে ফোটোগ্রাফির যে নতুন একটি পদ্ধতি খুব সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে, তাতে গল্প-উপন্যাস লেখা-টেখা একেবারে নেহাত গতর-খাটানোর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের ফোটোগ্রাফ যিনি তুলেছিলেন, সেই শিল্পী ভদ্রলোক দয়া করে তাঁর পরীক্ষার সময়ে সেখানে আমাদের থাকতে দিয়েছিলেন, তবে এই নতুন উদ্ভাবন বা কৌশলটি তো এখনো সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় নি, তাই কী ভাবে বা কোন কোন ওষুধ-বিষুধ ব্যবহার করে তিনি পরীক্ষার কাজ করলেন, সে-সব আমাদের গোপন রাখতে হবে, শুধু ফলাফলটাই জানাতে পারি।

প্রথমেই তিনি বলে রাখলেন যে, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি খুবই অল্প, তাদের মনের ভাবনার ছাপ যদি বিশেষভাবে-তৈরি কাগজের ওপর ধরে রাখা যায়, তা হলে সেটাকে ডেভেলপ করে, অর্থাৎ আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলে যতখানি ইচ্ছে জোরাল করে তোলা না-কি সম্ভব। আমরা যখন জানালুম যে, আমরা চাই, খুব দুর্বল-বুদ্ধির কোনো লোক নিয়ে যেন তিনি পরীক্ষা করেন, তখন তিনি পাশের ঘর থেকে একটি ছোকরাকে ডেকে আনলেন। দেখে মনে হল লোকটির শরীর যেমন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমনি কমজোর। লোকটির সম্বন্ধে আমাদের

অভিমত জানতে চাওয়া হলে আমরা সোজা বলে দিলুম যে, এক ঘুমনো ছাড়া এর দ্বারা আর কিছু সম্ভব বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। শিল্পী-বন্ধুটি দেখলাম আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

যন্ত্রপাতি সাজানো হল, লোকটির মন আর ক্যামেরার নেগেটিভের মধ্যে একটা অদৃশ্য জাদুর সম্পর্ক গড়ে উঠল ; তখন তাকে জিগেস করা হল, সে কিছু বলতে চায় কি-না। খুব মৃদু গলায় সে বললে, "কিছু না।" এবার জিগেস করা হল, সে কী ভাবছে ; এবারেও উত্তর হল, "কিছু না।" শিল্পী বললেন যে, এই অবস্থাটা না-কি তাঁর কাজের পক্ষে চমৎকার। বলেই কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

নির্দিষ্ট সময় ধরে কাগজের ওপর ছাপ ফেলা হল, তার পর আমাদের দেখতে দেওয়া হল। দেখলাম কাগজে খুব আবছা আবছা কী সব দেখা যাচ্ছে, এত অস্পষ্ট যে, বোঝাই যায় না। তার পর খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে যে-ছবি চোখে পড়ল, তা এইরকম :

'ভারি স্নিগ্ধ, ভারি মধুর সন্ধ্যা ; বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর দিয়ে পশ্চিমী হাওয়া বয়ে চলেছে, শুকনো মাটির ওপর হাল্কা বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা বর্ষণ হয়ে গেছে। পথের দুই ধারে প্রিমরোজ ফুলের সারি, তারই মাঝখান দিয়ে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে মন্থর গতিতে চলেছে একজন প্রিয়-দর্শন শান্তশিষ্ট তরুণ, হাতে তার একটি বেতের ছড়ি। ঘোড়াটি পথের ধারের ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে দুলকি চালে আরোহীকে বহন করে নিয়ে চলেছে ; আরোহীর সুন্দর চেহারার সঙ্গে বড়ো খাপ খেয়েছে তার মুখের প্রশান্ত হাসিটি আর চোখের ক্লান্ত চাহনি ; মৃদু অথচ অতি মধুর কণ্ঠে সে তার মনের দুঃখের কথা গেয়ে চলেছে :

হায় রে, আমার প্রার্থনা হল না-মঞ্জুর !
তবু আফসোসে চুল ছিঁড়ে আর লাভ কি ?
দেখতে আমায় লাগবে তো আরো কুচ্ছিত।

আমার কথায় কান দিলে না, করল খুবই ভুল।
একটা সময় ছিল, যখন মানত আমার কথা ;
ঘটল এমন কী, যাতে বদলে গেল এমন ?

'তার পর এক মুহূর্তের জন্যে সব চুপচাপ ; হঠাৎ টাট্টু ঘোড়াটা রাস্তার একটা পাথরে হোঁচট খেতেই, ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল সে। শুকনো পাতা মচমচিয়ে উঠল ; তরুণ যুবাপুরুষটি উঠে দাঁড়াল ; বাঁ দিকের কাঁধের ওপরটা একটু ছড়ে গেছে, গলায় বাঁধা রুমালটা এলোমেলো হয়ে গেছে—এ ছাড়া এই সামান্য দুর্ঘটনায় আর কিছুই হয় নি।'

ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে আমরা বললাম, "এটা একেবারে অতি কাঁচা জাতের দুর্বল কাহিনীর মতো শোনাচ্ছে।"

উত্তরে বন্ধু বললেন, "ঠিকই বলেছ ; এই অবস্থায় এই কাহিনী ছাপালে আজকের বাজারে মোটেই কাটবে না। তবে, আমরা দেখতে পাব যে, ছবিটাকে আর একধাপ যদি ফুটিয়ে তোলা যায়, তা হলে ব্যাপারটা বেশ কড়া গোছের আর বাস্তব ধাঁচের হয়ে দাঁড়াবে।" তার পর বন্ধুটি ছবিটাকে অনেকরকম ওষুধ-বিষুধে চুবিয়ে আবার যখন আমাদের হাতে দিলেন, তখন দেখা গেল ছবিটা এইরকম :

'সচরাচর যেমন হয়, সন্ধ্যাটা সেইরকমের ; বনের মধ্যে হাওয়ার ঝাপটা, একটু একটু বৃষ্টি পড়তে শুরু হল ; চাষীদের পক্ষে গতিক ভালো নয়। ঘোড়া-চলা পথ বেয়ে নড়বড়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে এক ভদ্রলোক আসছেন, হাতে তাঁর মুণ্ডি-লাগান গাঁট্টাগোঁট্টা একটা লাঠি ; অশ্বারোহী ভদ্রলোকের মুখ-চোখের ভাবে বোঝা যায়, করনীয় কাজ ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। শিস্ দিতে দিতে এগোচ্ছিলেন তিনি। বোধ হয় লাগসই কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই খানিক বাদে কথা খুঁজে পেয়ে বেশ খুশিখুশি গলায় বলতে লাগলেন :

"শুনলে না সে আমার কথা! বটে!
মুখের ওপর শুনিয়ে দিলাম—বয়েই গেল আমার।
'না' বলে যে ভুল করেছে, টেরটা পাবে পরে!

"এ ব্যাপারের এই খানেতেই ইতি।
চাইব না আর, ফিরেও যদি আসে ;
আরও অনেক জুটবে না কি আর?"

'ঠিক সেই সময়ে একটা গর্তে পা পড়ে যাওয়ায় ঘোড়াটা উল্টে পড়ল ; আরোহী কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন ; অনেক জায়গায় কেটেকুটে গেছে, পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে ; এই বিচ্ছিরি দিনটার কথা বহুকাল তিনি ভুলতে পারেন নি।'

অত্যন্ত তারিফ করে ছবিটা বন্ধুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমরা তাকে অনুরোধ করলাম যে, ছবিটাকে এবার যতখানি সম্ভব ফুটিয়ে তোলা হোক ; বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। তার পর ছবিটাকে চরমে ফুটিয়ে তুলে যখন আমাদের হাতে দিলেন, তখন বিস্ময়ে আর আনন্দে অবাক হয়ে দেখলাম :

'ভীষণ ঝোড়ো রাত—অন্ধকার গভীর বনের মধ্যে দামাল বাতাসের মাতামাতি—যন্ত্রণাকাতর ধরিত্রীর মাটিতে প্রবল বৃষ্টিধারার চাবুক। খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে একটা গিরিপথ—তারই মধ্যে দিয়ে সোজা ছুটে আসছে এক অশ্বারোহী, সারা দেহ অস্ত্রশস্ত্র আর বর্মে ঢাকা, এমন-কি, দাঁত পর্যন্ত। ঘোড়াটা তাকে পিঠে নিয়ে পাগলের মতো হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে—তার স্ফুরিত নাসা দিয়ে আগুনের শিখা লক্‌লক্ করছে। আরোহীর কুঞ্চিত ভ্রূ—ঘূর্ণিত চোখ—চেপে-ধরা দাঁত—বোঝা যাচ্ছে তার মনে নিদারুণ যন্ত্রণা—উত্তপ্ত মস্তিষ্কে কত রহস্যময় ছবি ভেসে উঠছে—তখন, অমানুষিক একটা চীৎকার করে তার ফুটন্ত আবেগ সে উজাড় করে দিলে এইভাবে :

"দুর্মদ আমি ! মুঠোতে বাগানো ছোরা !
কোনো আশা নেই, বেঁচে থেকে কী-বা লাভ ?
মাথায় জ্বলছে আগুন, আমার বুকেতে সীসের ভার !
হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে তার।—আমি ?
সামনে কেবল অসীম আঁধার, শূন্য !"

'মাত্র মুহূর্তেকের বিরতি। কী ভয়ংকর ! পথ এসে ঠেকেছে এক অতল গহ্বরের প্রান্তে···একটা দমকা—একটা ঝলক—একটা হুড়্‌মুড়্ শব্দ—তার পর সব শেষ। সেই ঘোড়সওয়ার তার অন্তিম নিয়তির সঙ্গে শেষবারের জন্যে মুখোমুখি হয়েছিল যেখানে, তার হদিশ দেবার জন্যে পড়ে রইল শুধু তিন ফোঁটা রক্ত, দুটো দাঁত, আর ঘোড়ার রেকাব।

সম্মোহিত করা আমাদের সেই ছোকরাটির সম্বিত ফিরিয়ে এনে তার মনের ক্রিয়াকলাপের পরিণামটি দেখাতেই সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ফটোগ্রাফির এই অভিনব কায়দাটি এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি, তাই এই অভূতপূর্ব আবিষ্কার সম্পর্কে আর কোনো মন্তব্য না-করাই উচিত, তবে বিজ্ঞানের ক্ষমতা যে এর দৌলতে কতখানি বৃদ্ধি পাবে, সে কথা চিন্তা করলে মাথা ঘুলিয়ে যায়।

ব্রাণ্ডল ক্যাসেল

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিসেস কগ্‌স্‌বি—বড়ো সদাশয়, বড়ো প্রসন্ন ভদ্রমহিলা, মিসেস কগ্‌স্‌বি—সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাগানের কাজ করছিলেন; বেশ বড়ো-সড়ো রক্তখেকো-মার্কা একটা ছুরি দিয়ে কয়েকটা মরা গোলাপের চারা ছেঁটে ফেলছিলেন। ছুরিটাকে দেখলেই যদিও বেশ বোঝা যায় যে, কুমির-টুমির খুন করার মতো অদ্ভুত ধরনের কাজের উদ্দেশ্যেই আসলে ওটা তৈরি হয়েছিল, তবু সেটাকে মেয়েদের ব্যবহারের ছোট্টো পেন্সিল-কাটা ছুরির মতো অনায়াসে বাগিয়ে ধরে অবলীলায় কাজ করতে তাঁর কোনোই অসুবিধা হচ্ছিল না। এইভাবে বাগানের কাজ করতে করতে গেটের দিকে চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেন, "ভাই, মিস প্রিমিন্স, আমার বাড়িতে না এসে আর এক পাও যেন নড়বেন না, ভাই, এক গ্লাস শরবৎ না খেয়ে যেন চলে যাবেন না, তা ছাড়া আমার গাগি-সোনা এখন এই বয়েসে কেমনটি হয়েছে, তাও তো আপনি দেখেন নি, দেখেন নি তো, আরো কত গুণের গুণনিধি হয়েছে সে।" ঐ গাগি-সোনাটি হল বছর ছয়েকের অতি-বাড়ন্ত গড়নের একটি খোকা—মায়ের বুকভরা ধন, আর পাড়াপ্রতিবেশীর দুচক্ষের বালাই, কারণ মিসেস কগ্‌স্‌বির পাল্লায় পড়ে দিনের পর দিন পুরো সন্ধেটা ধরে তাঁদের বসে বসে গাগির তারিফ করতে হয় আর তার কীর্তিকলাপের সুখ্যাতি

করতে হয়। মায়ের একান্ত ইচ্ছানুসারে বরাবর তাকে কোলে করে ঘরে নিয়ে আসা হয়ে থাকে, তবে মিসেস কগ্‌স্‌বির অতিথিদের মধ্যে যাঁদের দৃষ্টি একটু বেশি তীক্ষ্ণ, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, দরজার গোড়ায় এসে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত ঝি তাকে মোটেই কোলে নেয় না, তার কারণ অবশ্য এই যে, ঝি-রা যদি মানুষ হয়, তা হলে কোনো ঝিয়ের পক্ষেই গাগিকে একসঙ্গে দশ গজ বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, পড়ে যেতে বাধ্য।

মিসেস কগ্‌স্‌বির পাল্লায়-পড়া সত্তর-পেরনো এই ভদ্রমহিলাটি তাঁর অতি-ক্ষুদ্র মুখগহ্বর থেকে কণ্টে-সৃণ্টে বাঁকাচোরা উচ্চারণে বললেন, "বিশ্বিস করুন, আপনি নিরিলায় আছেন, আমি বিরিক্ত করতে চাই না।" কিন্তু মিসেস কগ্‌স্‌বির কাছে কোনো ওজর খাটে না, কাজেই মিস প্রিমিন্সকে তাঁর বৈঠকখানায় বসতেই হল, এবং তার আধ ঘণ্টার মধ্যে মিসেস কগ্‌স্‌বির আরো আট-দশ জন শিকার এসে জমায়েত হল সেই ঘরে এবং যথারীতি গাগির সঙ্গে পরিচয় করতে হল তাঁদের।

গাগির প্রথম আবির্ভাবে সকলে সমস্বরে যখন বলে উঠলেন, "কী চমৎকার ছেলেটি!" গাগি ততক্ষণে তার মার হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল পুরে চুষতে শুরু করেছে এবং ঘরের কারও সঙ্গেই একটিও বাক্যব্যয় করবার কোনোরকম উৎসাহ প্রকাশ করে নি। মিসেস কগ্‌স্‌বি এই বলে শুরু করলেন, "গাগির একটা চমৎকার শিল্পকর্ম আপনাদের না-দেখালে অন্যায় হবে। ওর বাবার ছবি, আসল চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল, (ঘরের সবাই ভুরু তুলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন) কেবল, ওর বাবা বেচারিকে যখন আজ দেখাতে গেলাম, ভালো করে না দেখেই খাপতে খাপতে বেরিয়ে গেলেন।" (কথাটা বোধ হয় 'খেপে' আর 'কাঁপতে কাঁপতে,' জোড়া-কথা বলা মিসেস কগ্‌স্‌বির বৈশিষ্ট্য।) এই সময়ে দরজায় টোকা পড়ল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দরজা খুলে দিতেই মিস্টার কগ্‌স্‌বি সন্ত্রস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন; উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে দেখতে পেলেন, মিস প্রিমিন্স

তাঁর ছবিটি নিরীক্ষণ করছেন, এবং দেখবামাত্র আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ারের ওপর ঢলে পড়লেন। মিসেস কগ্‌স্‌বি ঝড়ের বেগে তাঁর কাছে গিয়ে অত্যন্ত নিখুঁত তাগ করে মিস্টার কগ্‌স্‌বির পিঠে অবিরাম প্রচণ্ড চড়ের ঝড় বইয়ে দিতে, শেষপর্যন্ত তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তার পর মিস্টার কগ্‌স্‌বির সম্বিত ফিরে আসার প্রথম লক্ষণটি দেখা যেতে না যেতেই তাঁর কানে মুখ লাগিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "ওগো, তুমি কিনা এই দুর্বলতার শিকার হলে! এ যে আমি ভাবতেই পারি না! সেই তুমি, যাকে আমি মায়ের চেয়েও বেশি সেবা-যত্ন করে এলুম চিরটা কাল।" ফ্যাকাসে চামড়ার লম্বা এক তরুণ ভদ্রলোক অনবরত একটা ছোট্টো লিকলিকে ছড়ির মাথার গোল মুণ্ডিটা মুখের মধ্যে পুরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার বলে উঠলেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনি কি তা হলে, ঐ ছেলেটির—ঠাকুমা?" তার দিকে রক্ত-শোকানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিসেস কগ্‌স্‌বি, "দেখুন, মশাই" বলতেই সে চুপ করে গেল। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও ঘণ্টা বাজিয়ে ঝিকে ডাকার উপস্থিতবুদ্ধি তিনি হারান নি। ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছে তা পরিষ্কার না বুঝলেও, ঝি টের পেয়েছে যে, তার মনিবনীকে কেউ অপমান করে থাকবে, আর সেই তরুণ ভদ্রলোকটিও তাঁর নিরীহ প্রশ্নের এই অদ্ভুত পরিণাম দেখে অবাক হয়ে গেছেন, তাই মিসেস কগ্‌স্‌বি মৃদুস্বরে, "এঁকে দরজা দেখিয়ে দাও" বলে হুকুম দিতেই তিনি নিঃশব্দে রোষাবিষ্ট ঝির অনুগমন করলেন। ঝঞ্ঝাট মিটে যেতেই মিসেস কগ্‌স্‌বির মনে হল, এবার তাঁর নিজের নাটকীয় কিছু করা দরকার, তাই শুরু করলেন, "বর্বর! জানোয়ার! একজন তরুণী—এখনো তিরিশ পার হয় নি—তাকে—তাকে কিনা—ঠাকু—ঠা—কু—মা বলা—ওহ্!" বলেই যখন দেখলেন ব্যাপারটা বেশ চরমে পৌঁছে গেছে, তখনি তাঁর সেই পছন্দসই কায়দার দৌলতে ছবির মতো ভঙ্গিতে একটা সোফার ঠিক মাঝখানটায় এলিয়ে পড়ে রইলেন।

আর, তার পরমুহূর্তেই গাগির যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শোনা গেল, এবং দেখা গেল, মায়ের পোশাকের তলা থেকে সেই অপরূপ শিশুটির পায়ের ডগা দুটি শুধু সামান্য একটু উঁকি মারছে।

মিসেস কগ্‌স্‌বির প্রাণের খোকাটি যখন পায়ের ডগা দিয়ে তাঁর গায়ে ছোটো-ছোটো লাথি কষিয়ে চলেছে, তাঁর বান্ধবীরা তখন তাঁকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য এমন সব হরেক রকমের শুশ্রূষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছে, যা আগে কখনো শোনা বা দেখা যায় নি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ছে মিস প্রিমিন্সকে, তাঁর এক হাতে পালক-পোড়ান ছাই একমুঠো, অন্য হাতে স্মেলিং সল্টের শিশি। মিস্টার কগ্‌স্‌বি বিপদের সূত্রপাতেই অন্তর্ধান করেছিলেন, এখন মুখে একটা তৃপ্তির হাসি নিয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকলেন, এবং কেউ তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করার আগেই বিরাট এক-বালতি জলের সমস্তটা তাঁর স্ত্রীর গায়ে ঢেলে তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে জব্‌জবে করে দিলেন। জ্ঞান হারানোর সমস্ত লক্ষণ এক নিমেষেই অন্তর্হিত হয়ে গেল, এবং জ্বালাময়ী চোখে প্রচণ্ড ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে মিসেস কগ্‌স্‌বি আধ-শোয়া অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে ভয়চকিত স্বামীর কান পাকড়ে ধরে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেলেন; বেচারি গাগির জন্য কারও মমতা হল না, সে সোফার ওপর বিস্রস্ত হয়ে পড়ে রইল; বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে বাড়ির ঝি যখন তাকে খুঁজে বার করলে, তখন সে চীৎকার করে পাড়া মাথায় করছে।

এদিকে পাশের ঘর থেকে তখন আর্তনাদ আর ঘুষির শব্দ শোনা যেতেই ভদ্রমহিলারা কানে হাত চাপা দিয়ে, মিস্টার কগ্‌স্‌বিকে তাঁর দুর্ভাগ্যের হাতে ফেলে রেখে, ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকেরাও অত্যন্ত সানন্দে তাঁদের অনুগমন করলেন, এবং মিসেস কগ্‌স্‌বির বৈঠকখানা ফাঁকা হয়ে গিয়েও হল না কেবল একজন ভদ্রলোকের জন্য, কারণ তিনি কানে একদম শুনতে পান না বলে কী ঘটছে না-ঘটছে কিছুই টের পান নি, তাই আপাতত পা দুটোকে গুণের চিহ্নের মতো আড়াআড়ি করে রেখে মুখে প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে ঘরের একটি কোণে বসে রইলেন।

মিস্টার কগ্‌স্‌বির বাড়িতে তার পর কী ঘটেছিল, সেটা আমাদের জানাবার কথা নয়; তবে বাড়ি ফেরার পর মিস প্রিমিন্স ঘোর উন্মাদের মতো ক্ষেপে ক্ষেপে উঠেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত গভীর বিরাগ আর অতি তীব্র বিতৃষ্ণাও সময়ের মন্থর স্রোতে ধুয়ে যায়, এবং যদিও এর পরের ছটি মাস ধরে মিস প্রিমিন্স তাঁর সরল মনে আঘাত পাওয়ার দরুন মুহ্যমান হয়ে থেকেছেন, এবং কগ্‌স্‌বিদের আচরণ সম্বন্ধে ঘোর বীতরাগ প্রকাশ করছেন, এবং কগ্‌স্‌বিদের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবেন না বলে কড়া প্রতিজ্ঞা করেছেন, তবু মিসেস কগ্‌স্‌বি নববর্ষের বাৎসরিক নাচের আসরে যখন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন, তখন মিস প্রিমিন্সই সবচেয়ে আগে সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, এবং সময় সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সজাগ হয়ে কাঁটায় কাঁটায় কগ্‌স্‌বিদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। লম্বা ঝুলওলা গাঢ় নীল রঙের সাটিনের পোশাক পরে, মাথায় পাথর-বসান টায়রা লাগিয়ে, ঝকমকে লালচে খয়েরি চুলের গোছা দু কাঁধে লুটিয়ে দিয়ে (সত্যি সত্যি তাঁর নিজস্ব, কারণ দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে) টকটকে ফর্সা রঙ (এটাও নিজস্ব) আর তারুণ্যের সবকিছু লালিমায় উদ্ভাসিত হয়ে তিনি যখন এলেন, তখন তাঁকে দেখে কেউ যদি কল্পনা করতে পারত যে, শহরের সবচেয়ে দুর্মুখ বিশ্বনিন্দুক বলে সবাই যাকে চেনে, এ হল সেই পাঁশুটে-মুখো চিরকেলে মিস প্রিমিন্স, তা হলে তার পক্ষে তাঁকে রাশিয়ার সম্রাট বলে কল্পনা করাও কিছু অসম্ভব নয়। আগের সমস্ত অন্যায় আচরণের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে এবং মিসেস কগ্‌স্‌বির কাছ থেকে মার্জনা পেয়ে মিস্টার অগাস্টাস বিম্-ও এসে উপস্থিত; আর জাদুমণি গাগিকেও বসবার ঘরে আনা হল তো বটেই, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটি ভদ্র-লোকের পা মাড়িয়ে দিয়ে, এক ভদ্রমহিলার কোলের ওপর কেকের ডিশটা উল্টে ফেলে দিয়ে এবং কফি ঢেলে সারা টেবিলটা ভাসিয়ে দেবার পর বাতিদানটা মিস প্রিমিন্স-এর গায়ের ওপর উল্টে ফেলে দিতেই, তৎক্ষণাৎ তাকে যখন শুতে পাঠানো হল, তখন সে বাঘের মতো হাঁক ডাক শুরু করেছে। মিস প্রিমিন্স-এর সারা দেহ ঘিরে পোশাকে আগুন ধরে যেতেই সকলেই তাঁকে নেবাতে লেগে গেল, এবং শেষকালে মিস্টার অগাস্টাস বিম্ আগুন পোহাবার চুল্লির সামনে পাতা কম্বলটা তুলে নিয়ে মিস প্রিমিন্সকে ঢেকে দিতেই তিনি নিবে গেলেন।

কিন্তু এ-সব সারা হতে না-হতেই আরো ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। গরাদহীন খোলা জানলার গোবরাটের ওপর চকিতের জন্যে দেখা গেল মিস্টার কগ্‌স্‌বির দুটো পা টলমল করছে, পরক্ষণেই আর দেখা গেল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকলে জানলার কাছে ছুটে গেলেন ; দেখা গেল হতভাগ্য মিস্টার কগ্‌স্‌বি নীচের দিকে মাথা করে একটা ফুলগাছের কেয়ারির মধ্যে আটকে আছেন, পপ্‌লার গাছের পাতার মতো থর্‌থর্‌ করে কাঁপছেন। বোঝা গেল, মিস প্রিমিন্স-এর সেই দুর্ঘটনার আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে মিস্টার কগ্‌স্‌বি অগ্নিকাণ্ডের জায়গা থেকে পিছু হেঁটে সরে যেতে যেতে জানলা দিয়ে একেবারে ঘরের বাইরে সরে গেছেন—কেমন করে গেছেন, সেটা আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। মুহূর্তেকের মধ্যে মিস্টার অগাস্টাস বিম্‌ অকুস্থলে হাজির হয়ে রুদ্ধশ্বাস মিস্টার কগ্‌স্‌বিকে ফুল-গাছের ঝোপ থেকে উৎপাটিত করে দুহাতে তুলে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তাঁর স্ত্রীর মাতৃসুলভ তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন, এবং তার পর বেশ একটা আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে তাপিত মিস প্রিমিন্স-এর কাছে ফিরে আসতেই, মিস প্রিমিন্স ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে তৎক্ষণাৎ গলা থেকে হীরের (নকল) নেকলেসটি খুলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে সেটি মিস্টার বিম্‌-কে অভিনন্দন জানিয়ে দান করে ফেললেন।

উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর সমাগত অতিথিরা আবার যখন সুস্থির হলেন, এবং মিসেস কগ্‌স্‌বি বৈঠকখানায় ফিরে এসে এই সুসংবাদ দিলেন যে, ঘাড়ে খট্‌কা লাগা আর সামান্য আচ্ছন্ন ভাব ছাড়া অধঃপতনের ফলে মিস্টার কগ্‌স্‌বির আর কোনো দুর্দশা ঘটে নি, তখন আবার যথারীতি কথাবার্তা শুরু হল, এবং মিসেস কগ্‌স্‌বির পাশে এসে বসে মিস প্রিমিন্স কোনো একটি গুরুতর ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলেন : তিনি বললেন, "কয়েক দিনের ভেতর

ছোটো বাচ্চাদের জন্যে একটা পার্টি দেব বলে মনে মনে এঁচে রেখেছি, কিন্তু কী করে সবকিছু সামলে উঠব, ঠিক বুঝতে পারছি না।" খুশিতে ডগমগ হয়ে মিসেস কগ্‌স্‌বি বলে উঠলেন, "তাই নাকি? সত্যি সত্যি পার্টি দেবার কথা ভেবেছেন? বাঃ, বড়ো আনন্দের কথা! আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব, নিশ্চয়ই সর্বরকমে সাহায্য করব আপনাকে, আপনার ছোটোদের আসরে আমার গাগি-সোনাকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব, গাগিকে নিশ্চয়ই পাবেন আপনি, আর গাগি যে আপনার এই উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, সবাইকে মাতিয়ে রাখবে, তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই।" মিস প্রিম্মিন্স-এর আসল উদ্দেশ্যটা ছিল ঐ আপদ-মার্কা ছেলেটি যাতে পার্টিতে না যায়, তারই ব্যবস্থা করা, মিসেস কগ্‌স্‌বির কাছ থেকে তার বদলে যে এইরকম কোনো প্রস্তাব আসতে পারে, তা তিনি ভাবতেই পারেন নি, তাই ফ্যাঁসাদে পড়ে গিয়ে হতভম্ব ভাবটা ঢাকবার জন্যে কাশতে কাশতে তিনি বললেন, "না, না, তা ঠিক নয়, মিসেস কগ্‌স্‌বি, আমি ঠিক গাগিকে চাই নি, বুঝলেন কি-না।" আপনজনের মতো মিস প্রিমিন্স-এর হাতের ওপর হাত রেখে মিসেস কগ্‌স্‌বি বললেন, "আমি জানি, আপনি সে কথা বলেন নি, আমি জানি, মনে মনে আপনি যতই চান-না কেন, মায়ের কাছ থেকে তার আদরের শিশুসন্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা আপনার মতো মার্জিত স্বভাবের মহিলার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কিন্তু, আপনার ঔচিত্যবোধ আর অভিজ্ঞতার ওপর যে আমার পূর্ণ আস্থা আছে, এ কথা না বললেও চলবে, এবং তাই আপনার সযত্ন তত্ত্বাবধানে আমার অমূল্য সন্তানটিকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে আমার মনে লেশমাত্র দ্বিধা নেই—না, ও যদি একাই একশোটা গাগি হত, তা হলেও নয়!"

ব্যাপারটা কল্পনা করে শিউরে উঠে খানিকটা হতাশা নিয়েই মিস প্রিমিন্স আবার একবার চেষ্টা করলেন, "কিন্তু, ব্যাপার কী জানেন, মিসেস কগ্‌স্‌বি—মানে, আমি একটু ঘাবড়ে গেছি! আসলে জানেন তো, অনেক ছেলেমেয়ে—তারা আসবে—মানে—আমি ঠিক এ কথা বলতে চাই না—কিন্তু—বুঝতেই পারছেন, কী বলতে চাইছি—মানে, আসলে—এই-সব নানান কারণে আর কি—না-বলে পারছি না—আমি—মানে—আপনার অমূল্য গাগি-রত্নটি আমার পার্টিতে আসুক, এটা আমি চাই না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিসেস কগ্‌স্‌বি বললেন, "প্রিয় মিস প্রিমিন্স, আপনার মনের কথা বুঝতে আমার আর বাকি নেই; নিশ্চিন্ত থাকুন, সেইরকমই ব্যবস্থা হবে।" তার উত্তরে মিস প্রিমিন্স বললেন, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—আমি চাই যে—বুঝতেই পারছেন—আমি ঠিক মুখ ফুটে কথাটা বলতে চাই নি—তবে, আমি না বলতেই আপনি ঠিকই বুঝে নিয়েছেন।" মিসেস কগ্‌স্‌বি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি" এবং তার পরই দুই মহিলা ছাড়াছাড়ি হয়ে দুদিকে সরে গেলেন; একজন গেলেন মিস্টার বিম্‌কে খুঁজে বের করে তাঁকে আবার একবার এই কথা জানিয়ে আশ্বস্ত করতে যে, আগুনে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় নি, শুধু একটু ভয় পেয়েছিলেন, এবং মিস্টার বিম্-এর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত অটুট থাকবে; আর-একজন গেলেন বাকি সন্ধ্যাটা অভ্যাগত ভদ্রমহিলাদের কাছে তাঁর গাগির বাহাদুরির বড়াই করবার মওকা খুঁজতে।

কিছুকাল পর সেই শুভদিনটি উপস্থিত হল: নিমন্ত্রিত শিশু-অতিথিদের জন্য মিস প্রিমিন্স কাঁপা কাঁপা হাতে নিজেই খাবারের ডিশ সাজাচ্ছেন, আর তাঁর লাটসাহেবি মেজাজের বক্কেশ্বরী ঝিটি সাহায্য করবার নামে অনবরত তাঁর অজ্ঞতা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে যাচ্ছে, এই ধরনের কাজের যে কত ঝামেলা, তাই নিয়ে খিট্‌খিট্ করে যাচ্ছে, আর শেষ অবধি মিস প্রিমিন্স-এর হাত থেকে ডিশ-ফিশ কেড়ে নিয়ে কেবলই বলছে, "হল তো! তখনি বলেছিলুম, ওটা আমায় করতে দাও!" লজ্জা এবং ভয়ে সঙ্কুচিত ক্ষুদে-ক্ষুদে অতিথিরা একে একে এসে হাজির হতে লাগল। মিস প্রিমিন্স তাঁদের বলতে গেছেন, "এই যে, সোনারচাঁদরা, কেমন আছ সব? এস, তোমাদের টুপিগুলো খুলে রাখি," সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঝিটি চাপা গলায় খিঁচিয়ে উঠল, "থাক, থাক ও কাজটা বরং আমার হাতেই ছেড়ে দাও!" সকলেই যখন এসে গেছে, মিস প্রিমিন্স হৃষ্টচিত্তে গুনে দেখছেন মোট কজন হল, ঠিক সেই সময়ে দরজটা খুলে গেল, আর, বীরদর্পে পা ফেলে ফেলে ঘরে প্রবেশ করল শ্রীমান জর্জ কগ্‌স্‌বি, অর্থাৎ গাগি।

গাগি ঘরে প্রবেশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে মিস প্রিমিন্স-এর মুখে গভীর বিরক্তির ছাপ প্রকট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তিনি তাকে আপ্যায়ন করবার জন্য এগিয়ে এলেন। বললেন, "এস, সোনারচাঁদ, তোমায় দেখে ভারি আনন্দ হল, তোমার মা কেমন আছেন?" সোনারচাঁদ উত্তরে কেবল বললে, "জানি না", এবং সঙ্গে সঙ্গে মিস প্রিমিন্স অন্য-সব ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, "তা হলে তোমরা সবাই আনন্দ কর", তবে, তাঁর মুখের ভাবে যে কথা ফুটে উঠল, তা হল, 'সে আশায় ছাই পড়ল এবার!' তার পর তিনি ছেলেমেয়েদের খেলবার বন্দোবস্ত করে দিলেন, কিন্তু শ্রীমান গাগি কিছুই করল না, কোনো খেলাতেই যোগ দিল না, ঘরময় একে ওকে চিমটি কেটে কেটে বেড়াতে লাগল, তাদের আর্তনাদ শুনে বেশ মজা পেতে লাগল, আর চিমটি কাটার পালা সাঙ্গ হবার পর মিস প্রিমিন্স-এর পাশে এসে বসল; মিস প্রিমিন্স তখন অতিথিদের আনন্দ দেবার জন্য পিয়ানোতে একটা হাল্কা সুর বাজাতে শুরু করেছেন।

কিছুক্ষণ অত্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে বাজনা শুনেছে গাগি, এবং তার মধ্যে পিয়ানোর তিনটে তার আলগা করে দিয়েছে, তার পর হঠাৎ জিগেস করেছে, "আচ্ছা, ওটাও কি বাজনার অঙ্গ?"

"কোনটা বাজনার অঙ্গ, মানিক আমার?"

"ঐ যে, আপনার জিভের ডগাটা দিয়ে গালের ভেতর ঠ্যালা মারছেন?"

"না, বাপধন", বলেই চট্‌পট্‌ পিয়ানো ছেড়ে উঠে মিস প্রিমিন্স ঘরের অন্য দিকে চলে গেলেন। আমাদের খোকাটি তখন মহা আনন্দে পিয়ানোর ভেত্‌রকার কলকব্জা পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলে এবং শেষপর্যন্ত প্যাডেলটাকে ভেঙে সম্পূর্ণ খুলে ফেলে তবে ক্লান্ত হল।

আরো পরে, ছেলেমেয়েদের সবাইকে যখন অতিষ্ঠ করে তুলেছে গাগি, তিনটি মেয়েকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে, তখন মিস প্রিমিন্স ঠিক করলেন যে, এবার পাশের ঘরে ওদের চা খেতে নিয়ে যাওয়া যাক। টেবিলের ওপর জমকাল একটা বিরাট কেক রয়েছে; মিস প্রিমিন্স

তার অর্ধেকটা থেকে বেশ বড়ো-বড়ো টুকরো কেটে সবাইকে দিলেন, তার পর ঘরের বাইরে গেলেন শরবৎ আনাবার জন্য। ফিরে এসে কেকের বাকি অর্ধেকটা আর দেখতে পেলেন না। খুব সন্তর্পণে ফিস্‌ফিস্‌ করে তিনি বললেন, "জেন, কেকের বাকি অর্ধেকটা কী করলে?" সেইরকম ফিস্‌ফিস্‌ করে ঝি উত্তর দিলে, "রাগ করবেন না কত্তামা, শ্রীমান কগ্‌স্‌বি খেয়ে ফেলেছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আঁতকে উঠে মিস প্রিমিন্স শ্রীমান কগ্‌স্‌বির দিকে ফিরে তাকালেন; বিরাট একটা কেকের ভগ্নাংশ ধরে রয়েছে দুহাতে, গাল দুটো ফুলে ফেটে পড়বার উপক্রম, চোয়ালে অতি ক্ষীণ নড়াচড়ার লক্ষণ। উত্তেজনায় চীৎকার করে মিস প্রিমিন্স এক ঝটকায় তার হাত থেকে কেকের টুকরোটা ফেলে দিলেন, তার পর এক হাতে তার চুলের ঝুঁটি বাগিয়ে ধরে দুমদুম করে তার পিঠে অবিরাম এমন জোরে জোরে কিলোতে লাগলেন যে, অমূল্য জীবন সোনারচাঁদটিকে অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করে মুখের কেকটি অচিরাৎ গলায় নেমে গেল, আর তৎক্ষণাৎ গাগির মনোহর ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে এমন বিটকেল একটা বেসুরো চীৎকার বেরল যে, কানের পর্দা বাঁচাবার জন্য ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে না-গিয়ে কারও আর গত্যন্তর রইল না।

গাগির চুলের ঝুঁটি বাগিয়ে ধরে মিস প্রিমিন্স পুরো কুড়িটি সেকেণ্ড সেই চীৎকার সহ্য করলেন, তার পর যখন দেখলেন যে কমবার বদলে আওয়াজটা ক্রমশই বেড়ে বেড়ে চরমের দিকে যাচ্ছে এবং শিগ্‌গিরই তিনটে ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাড়িয়ে যাবার তাল করছে, তখন স্থান ত্যাগ করে দোতলার বসবার ঘরে চলে গিয়ে দেখলেন অতিথিরা আর সবাই ইতিমধ্যে সেখানেই গিয়ে জড়ো হয়েছে।

সারা বাড়িটাকে কাঁপিয়ে, দেওয়ালে দেওয়ালে ঝঙ্কার তুলে গাগির চীৎকার সেখানেও এসে পৌঁছচ্ছিল। উপায়ান্তর না দেখে মিস

প্রিমিন্স শেষপর্যন্ত ঘণ্টা বাজিয়ে একটি ঝিকে ডেকে, তার হাতে জল-ভরা একটা কলসি দিয়ে, তার কানে মুখ ঠেকিয়ে সেই বিকট আওয়াজের মধ্যেও যাতে শোনা যায় এমন তারস্বরে বললেন, "লক্ষ্মী মা আমার, নীচের খাবার ঘরে গিয়ে শ্রীমান কগ্‌স্‌বির সর্বাঙ্গে সবটা জল ঢেলে দিয়ে এস।" ঝি চলে যেতে মিসেস প্রিমিন্স চেয়ারে বসে পড়ে মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন, কতক্ষণে ঝি নীচে গিয়ে পৌঁছয়। ভাবতে লাগলেন, 'এইবার ঝি সিঁড়ির দ্বিতীয় বাঁকটায় পৌঁছল, সিঁড়ির ধারের জানলাটা পার হল এবার। এতক্ষণে হলঘরে গিয়ে পৌঁছেছে, এবার নিশ্চয়ই খাবার ঘরে গেছে, এবার—।" যতক্ষণ তিনি ভাবছিলেন, ততক্ষণে আওয়াজটা ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছিল, কিন্তু মিস প্রিমিন্স-এর হিসাবটা ঠিক ঐ জায়গায় পৌঁছতেই হঠাৎ সারা বাড়িটার ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠল, আর, একটা বড়ো-সড়ো বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণের চোটে একপাল বুনো জানোয়ার উড়ে গেলে যেরকম শব্দ হতে পারে, সেইরকম বিকট একটা গর্জনের শব্দ শোনা গেল। পাঁচটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল, বাকি সবাই মেঝের উপর ছিটকে পড়ে এ ওকে আঁকড়ে ধরে আতঙ্কে নির্বাক হয়ে পড়ে রইল; তার পর সেই বিকট শব্দের অন্তিম রেশটুকুও যখন মিলিয়ে গেল, তখন সারা বাড়িতে আতঙ্কিত মিস প্রিমিন্স-এর হাঁপানির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। সম্বিত ফিরে আসতেই কম্পিত চরণে মিস প্রিমিন্স নীচে নেমে দেখলেন, বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত হলেও, গাগি অত্যন্ত শান্তভাবে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট হাঁ করে, সারা গা থেকে টপ্‌টপ্ করে জল ঝরছে। খালি কলসিটা মেঝের ওপর গড়াচ্ছে, আর তার পাশে হতভাগ্য ঝি লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে—তার জ্ঞান নেই।

নবম পরিচ্ছেদ

পরের দিনই মিস প্রিমিন্স সে পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন: কয়েক মাস পর মিসেস কগ্‌স্‌বির কাছে শুভবিবাহের দুটি পত্র এল—মিস্টার বিম্ আর মিস প্রিমিন্স-এর বিয়ে!

কবিতা ঃ স্নার্কশিকার-কাব্য

লুইস ক্যারল বহু মজার কবিতা এবং ছড়া লিখেছিলেন, যার অনেকগুলিই অ্যালিস-এর কাহিনীদুটিতে এবং সিল্‌ভি আর ব্রুনোর কাহিনীদুটিতে ব্যবহার করেছেন—কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু অদল-বদল করে। আলাদা কবিতাও ছিল, তার বেশির ভাগই কথা এবং অক্ষরের খেলা বা ধাঁধা জাতীয়।

'স্নার্কশিকার-কাব্য' ('দি হান্টিং অব দি স্নার্ক') একমাত্র বড়ো কবিতা। অভিনবত্বে অনন্য, আপাত-গাম্ভীর্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রসিকতায় ভরা। অনেক সমালোচকের মতে, রসের বিচারে অ্যালিস-এর কাহিনীদুটির পরেই এর স্থান।

প্রথম সর্গ

অবতরণ

"নির্ঘাৎ এটা স্নার্কের ঘাঁটি!" কাপ্তেন ফুকারিল,
যাত্রীদলকে নামাল কূলেতে নিয়ে;
জলের ওপর সাবধানে সবে ধরে পার করি দিল
চুলেতে তাদের আঙুল জড়িয়ে দিয়ে।

"নির্ঘাৎ এটা স্নার্কের ঘাঁটি! বললাম দুই বার;
এতেই সবার মনেতে জাগবে আশা।
নির্ঘাৎ এটা স্নার্কের ঘাঁটি! বললাম তিন বার;
তার মানে সেটা খাঁটি কথা দিয়ে ঠাসা।"

যাত্রীদলেতে রয়েছে অনেকে: জুতো-পালিশের চাকর;
কারিগর এক, টুপি গড়ে বসে বসে;
ঝগড়া মেটাতে রয়েছে উকিল, আইনে বিদ্যেসাগর;
একটি দালাল, জিনিসের দাম কষে।

এক খেলোয়াড়, মনটি উদার, বহুবিধ গুণ ধরেন,
পাওনার চেয়ে অনেক বেশিই পান
এক মহাজন, সবার অর্থ বাক্সতে জমা করেন,
বহু টাকা পেয়ে জাহাজে অধিষ্ঠান।

আর আছে এক দাঁতাল নেউল, পায়চারি করে ডেকে,
গলুয়েতে বসে কখনো-বা জাল বোনে।
(কাপ্তেন বলে) বহুবার নাকি রক্ষা করেছে জাহাজডুবির থেকে ঃ
মাঝিরা জানে না, তবু চুপচাপ শোনে।

আর একজন, সুবিচক্ষণ, ভুলেতে দারুণ খ্যাতি,
আসার সময়ে অতি তাড়াহুড়ো করে
ফেলে এসেছেন ঘড়ি, মফ্‌চেন, আঙটি এবং ছাতি,
নতুন পোশাক, কেনা সফরের তরে।

হয়েছে লিস্টি, বিয়াল্লিশটি বাক্স হয়েছে বোঝাই
প্রতিটিতে তার নাম লেখা ভালো করে ;
তবে কাউকে তা জানাবার কথা ভুল হয়ে গেল সোজাই,
সব কিছু তার পাড়েতে রইল পড়ে।

পোশাক হারায়ে মাখলে না গায়ে হারানোর কোনো দুঃখ,
সাতখানি কোট পরেই তো এসেছেন,
তিন জোড়া জুতো পায়ে, তবু এক বিপদ ঘটেছে সূক্ষ্ম—
নিজের নামটা ভুলে মেরে বসেছেন।

অতি কদাকার মুখশ্রী তার, বুদ্ধিটা বেশ ভোঁতা,
(এটা কাপ্তেন বলতেন বার বার)
তবু আছে তার সাহস দেদার !—সেটাই আসল কথা,
স্নার্ক শিকারে তো সেইটাই দরকার।

হায়নার সাথে ঠাট্টায় মাতে, কণামাত্র না-ডরি
চোখে চোখে চেয়ে নির্ভয়ে মাথা নাড়ে,
গিয়েছে বেড়াতে ভালুকের সাথে থাবা ধরাধরি করি,
বলে, তাতে ওর মনে উৎসাহ বাড়ে।

রাঁধুনি হিসাবে পাকাপাকিভাবে জাহাজে পেয়েছে ঠাঁই
কিন্তু শুধুই পিঠে গড়া আছে জানা।
সে কথা জানাতে বীর কাপ্তেন রেগে হয়ে গেল কাঁই,
কেননা, পিঠের মশলা হয় নি আনা।

সব শেষে যিনি এসেছেন, তিনি বিশেষভাবেই গণ্য,
দেখতে যদিও হাঁদার মতোই ডাহা যে,
এক বৈ দুই চিন্তাই নেই, সেটা স্নার্কেরই জন্য,
বীর কাপ্তেন তাই তাকে নিল জাহাজে।

কসাই হিসাবে এসেছে, কিন্তু হপ্তাখানেক গেলে
করলে ঘোষণা খুবই গম্ভীরস্বরে
নেউল ছাড়া সে জবাই করে না। সকলে আঘাত পেলে ;
বীর কাপ্তেন মুখ খুললে না ডরে।

অবশ্য, পরে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলেছিল ভয়ে ভয়ে,
জাহাজে কেবল নেউল একটিমাত্র ;
সেটা নিজস্ব, সখের পোষ্য ; গেলে সেটা যমালয়ে
শোকের সাগরে ভাসবে সে অহোরাত্র !

নেউলের কানে কেমনে কে জানে পঁহুছিল সেই কথা,
প্রতিবাদে তার আঁখিলোর যায় বয়ে।
স্নার্কনিধনের সে-আয়োজনের সকল প্রফুল্লতা
ঘুচে গেল তার সকরুণ বিস্ময়ে।

অতি দৃঢ়স্বরে জোর দাবি করে, কসাইকে অবিলম্বে
আলাদা জাহাজে তুলে দেওয়া হোক ঠেলে।
বীর কাপ্তেন বললে, তা হলে বহু ঝঞ্ঝাট জমবে,
ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে গোলমেলে।

জাহাজ যদিও একটি, তবুও সাগরেতে পাড়ি দেওয়া—
অতি সুকঠিন জানে সে তা অবধার্য ;
তাই রাজি নয়, ভয় হয়, দুটি জাহাজের ভার নেওয়া
নিশ্চয়ই হবে অবিবেচনার কার্য।

তখন নেউল হইয়া ব্যাকুল অন্য উপায় ভাবে,
রাঁধুনি তাহারে দেখাল আশার আলো,
বললে, "একটা পুরনো বর্ম দেখে কিনে নেওয়া যাবে
আর, জীবনটা বীমা করে নেওয়া ভালো।"

নিজেই রাঁধুনি দিল তারে আনি দুইটি বীমার নথি —
—ভাড়া নেওয়া যায়, কিম্বা কেনাও যাবে।
তারই দৌলতে পূরিবে তাহার আগুনে পোড়ার ক্ষতি,
শিলাবৃষ্টিতে মারা গেলে টাকা পাবে।

তবু সেই থেকে কসাইকে দেখে ভয় তার নাহি যায় ;
কসাই কখনো যদি কাছাকাছি আসে,
নেউল বেচারি সাত-তাড়াতাড়ি অন্য দিকেতে চায়,
কাঁচুমাচু হয়ে থরথর কাঁপে ত্রাসে।

দ্বিতীয় সর্গ

কাপ্তেনের ভাষণ

কাপ্তেন নিজে অতি সাহসী যে, সে কথা সবাই মানে
এবং ভাগ্যে সাধুবাদ দেয় তারা।
যেমন সে বীর, তেমনিই ধীর, সকল কর্ম জানে,
মুখেচোখে তার বইছে জ্ঞানের ধারা।

এনেছেন সাথে বৃহৎ পাতাতে একখানি ম্যাপ আঁকা,
সাগর এলাকা দেখানো হয়েছে স্পষ্ট।
ডাঙার চিহ্ন নেই কোথাও, সবটা বেবাক ফাঁকা,
যাত্রীরা খুশি—বুঝতে হয় না কষ্ট।

"কী হবে মেরুতে? বিষুব রেখাতে কার কী-বা আসে যায়?
ম্যাপ কি হয় না অক্ষ, দ্রাঘিমা ভিন্ন?"
কাপ্তেন বলে; যাত্রীরা সবে একযোগে দেয় সায়,
বলে, "ও-সব তো নেহাত মামুলি চিহ্ন!

"আর সব ম্যাপে থাকে কত দেশ, কত দ্বীপ বাঁকাচোরা।
কিন্তু মোদের বীর কাপ্তেন ধন্য!
এ মানচিত্র অতি বিচিত্র, ফাঁকা শুধু পাতা-জোড়া
এনেছেন তিনি কিনে আমাদের জন্য!"

যাত্রীরা সবে খুশি হল। তবে, অচিরে করলে লক্ষ্য,
যার পরে অত বিশ্বাস রাখে তারা,
সেই কাপ্তেন জাহাজের কোনো কাজে মোটে নয় দক্ষ—
—মাঝে মাঝে শুধু ঘণ্টা বাজানো ছাড়া!

চিন্তাশীল সে, গম্ভীরও বটে, কিন্তু তাহার আদেশে
মাঝি-মাল্লারা ভ্যাবাচাকা খায় ভারি।
যখন সে হাঁকে—'ডাইনে ঘোরাও, মুখটা বাঁদিক ঘেঁষে'!
ভেবেই পায় না কী করবে হাল-ধারী।

তরীর আগার ছুঁচলো ডগার সুবিশাল খুঁটিটাকে
হালের হাতল ভেবে প্রায় ফেলে গুলিয়ে।
উষ্ণ হাওয়ায় এরকম নাকি প্রায়শই ঘটে থাকে,
—বীর কাপ্তেন জানিয়েছে বুক ফুলিয়ে।

জাহাজের গতি শীঘ্রই অতি হয়ে যায় গোলমেলে;
কাপ্তেন তাই মুখ তুলে আর চায় না।
বলে, আশা ছিল পূর্বের দিকে বাতাস বহিয়া গেলে,
জাহাজ কিছুতে পশ্চিম দিকে যায় না।

তবু, অবশেষে কূলে লাগে এসে বিপদের অবসানে;
বোঁচকা সমেত তীরে নামে সবে শেষটা।
তবে, যাত্রীরা খুশি হল নাকো চেয়ে চারিদিক পানে,
—পাহাড়ের গায়ে ফাটলেতে ভরা দেশটা!

বীর কাপ্তেন বুঝে নিয়েছেন, বড়ো দমে গেছে তারা
তাই আওড়ালে মজাদার সব কাহিনী।
ভেবেছিল, বুঝি তাতে যাত্রীরা হেসে হেসে হবে সারা;
—শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে যাত্রীবাহিনী!

দরাজ দুহাতে লাগিলা বিলাতে শরবৎ অতি মিষ্ট ;
আদেশ দানিলা সবারে আসন নিতে
তারা একযোগে মেনে নিলে, তাকে দেখাচ্ছে উৎকৃষ্ট
—কাপ্তেন যবে দাঁড়াল ভাষণ দিতে।

"বহু মাস ধরে সাগরে ভেসেছি বহু সপ্তাহ গেছে,
(চার সপ্তাহে মাস হয় জেন ঠিক-ই),
কিন্তু এখনো (তোমাদের বীর কাপ্তেন কহিতেছে)
দেখা গেল নাকো কোনো স্নার্কেরই টিকি !

"বহু সপ্তাহ সাগরে ভেসেছি, বহু দিন হল ভাসা,
(সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়ে যায়),
দুচোখ ভরিয়া স্নার্ক নেহারিয়া সাধ মিটাবার আশা
এখনো তো তবু পূরণ হল না, হায় !

"আবার জানাই, শোন সবে ভাই, কথা কটি নাও কানে,
—স্নার্ক চেনবার লক্ষণ পাঁচখানি ;
যেখানেই যাও, যদি দেখা পাও স্নার্কের কোনোখানে,
খাঁটি বা ভেজাল তাই দিয়ে নেবে জানি।

"এক-একটি করে বলি পরে পরে : প্রথমত, খেতে কী রকম
—স্বাদ প্রায় নেই, ফাঁপা, তবে মচ্‌মচে,
অনেকটা ঠিক পেটে-টান-ধরা কামিজের মতো দম্‌সম,
আলেয়ার মতো গন্ধটা পচ্‌পচে।

"বদ্ অভ্যাসের মাত্রা নেইকো, নিয়মের বড়ো অভাব—
দুই নম্বর লক্ষণ সেটা তাহার ;
বিকেলবেলার চায়ের সময়ে প্রাতরাশ করা স্বভাব,
সকালেতে সারে আগের রাতের আহার।

"তৃতীয়ত হল : ইয়াকি, ঠাট্টা, তামাশা বা মস্করা
এ-সব কিছুই ঢোকে না মগজে তার।
ফল হবে তাতে দুঃখীর মতো খালি ফোঁস্ ফোঁস্ করা,
রসিকতা শুনে মুখ হয়ে যাবে ভার।

"চার নম্বর : ছোটো চান-ঘর ভারি পছন্দ তার,
যেখানেই যায় সেটা রাখে কাছে কাছে ;
মনে ভাবে, তাতে হবে চারিভিতে শোভা সে চমৎকার-
যদিও আমার তাতে সন্দেহ আছে।

"পাঁচনম্বর : সে অতি সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ধরে।
খুলেই বলছি, কিছু রাখব না ঢেকে—
থাবাওলা আর গুঁফো জীবকে সে আলাদা গণ্য করে,
পালকেতে-ঢাকা ঠোঁটওলা প্রাণী থেকে।

"যদিও মামুলি স্নার্করা নিরীহ, কাহারো ক্ষতি না-চায়,
তবু মনে করি জানানোটা সমীচীন—
কিছু স্নার্ক আছে 'বুজাম'—" সহসা কাপ্তেন থেমে যায়,
দেখে রাঁধুনি সে পড়ে আছে জ্ঞানহীন!

তৃতীয় সর্গ

রাঁধুনির কাহিনী

রাঁধুনির জ্ঞান ফিরাইতে তারা প্যাঁড়া ও বরফ আনে,
শর্ষেবাটা ও শাক আনে সত্বর,
জ্ঞান ফিরাইল মোরব্বা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে কানে,
ধাঁধা দিল তারে চিন্তিতে উত্তর।

কিছু কাল গেল, রাঁধুনি উঠিল ; ধীরে ধীরে কথা কয়,
জানাল ইচ্ছা, কাহিনী শোনাবে তার ;
কাপ্তেন হাঁকে, "চুপ কর সবে ! চেঁচানিটুকুও নয় !"
ঘণ্টাটা জোরে বাজাল কয়েকবার।

নাহি গর্জন, নাহি তর্জন, এমন-কি, চীৎকার,
বিরাজিল সেথা অখণ্ড নীরবতা।
তখন রাঁধুনি বলিল বাখানি করুণ কাহিনী তার,
—যেন মান্ধাতা স্বয়ং কহিছে কথা !

"পিতা-মাতা মোর দরিদ্র ঘোর, তবু সাধু ছিল তারা—"
কাপ্তেন বলে, "ছাঁটো, ছাঁটো, ছোটো কর ;
ঘনালে আঁধার স্নার্ক দেখিবার দফাটি হইবে সারা,
তাড়াতাড়ি বলে ফেল, সময়ের অভাব রয়েছে বড়ো !"

ভাসি আঁখিজলে রাঁধুনি সে বলে, "আদেশ মান্য করিতে
দু-কুড়ি বছর বাদ দিয়ে বলি তবে—
সেইদিন থেকে, যেদিন আমায় ওঠালে তোমার তরীতে,
স্নার্ক শিকারের সঙ্গী করিলে যবে।

"মোর এক খুড়ো (তার-ই নামে মোর নাম রেখে সবে ডাকতেন)
বিদায়ের কালে উপদেশ দিলে মোরে—"
"থামাও তোমার খুড়ো-প্রসঙ্গ", তেড়ে রুখে ওঠে কাপ্তেন,
রাগের মাথায় ঘণ্টা বাজালে জোরে।

অতি সজ্জন রাঁধুনি তখন কহে, "খুড়ো বলে ডেকে,
স্নার্ক যদি শুধু স্নার্ক হয়, তবে ভালো,
যে-করেই হোক সাথে নিয়ে এস, খাওয়া যাবে শাক মেখে,
বড়ো কাজে লাগে জ্বালিয়ে তুলতে আলো।

" 'আঙুলের টুপি দিয়ে চুপিচুপি খুঁজো তারে সযতনে ;
বধ কোর কাঁটা-চামচে ও আশা নিয়ে ;
রেলের শেয়ারে প্রাণসংশয় জাগায়ো তাহার মনে ;
জাদু কোর মৃদু হাসি ও সাবান দিয়ে—' "

(কাপ্তেন বীর হয়ে অস্থির তারে বাধা দিয়ে বলে,
"একেবারে খাঁটি নির্ভুল কথা অতি,
আমিও শুনেছি, ঠিকমতো কোনো স্নার্ক পাকড়াতে হলে
এইটাই হল যথাযথ পদ্ধতি।")

" 'তবে এও শোনো, ভাইপো-রত্ন, থেকো তুমি হুঁশিয়ার,
স্নার্ক যদি কভু বুজাম জাতের হয়!
কেননা, তা হলে তোমাকে দেখতে পাওয়া যাবে নাকো আর,
—অচিরেই তুমি শূন্যেতে পাবে লয়!'

"এই কথাটাই! এই কথাটাই প্রাণকে করছে তোলপাড়,
যখন-ই খুড়োর শেষ কথা মনে পড়ছে;
হৃদয় আমার ঠিক যেন এক দই-দিয়ে-ভরা ছোটো ভাঁড়,
কানায় কানায় টইটুম্বুর করছে!

"এই কথাটাই! এই কথাটাই—" কাপ্তেন রেগে কয়,
"ও কথা মোদের শোনা তো হয়েছে আগে!"
সে কহিল, "আরো একবার শুধু বলিতে আদেশ হয়—
এই কথাতেই মনে মোর ভয় জাগে!

"সন্ধ্যার পরে স্নার্কের সাথে রোজ আঁধিয়ার রাতে
পাগলের মতো তুমুল লড়াই করি;
ছায়ার আঁধারে শাক দিয়ে তারে যতনে সাজাই পাতে,
তারে দিয়ে আমি দীপশিখা জ্বেলে ধরি।

"কিন্তু, কখনো বুজামের দেখা পাই যদি কোনোদিন,
তা হলে তখন-ই (নিশ্চিত পারি কহিতে)
মোলায়েমভাবে অচিরকালেই শূন্যেতে হব লীন—
এ-দুর্ভাবনা পারি নাকো আর সহিতে!"

চতুর্থ সগ

শিকার-যাত্রা

শুনে কাপ্তেন ক্ষুব্ধ হলেন, ভুরু কোঁচকালো তাঁর—
"আগে বলবার অবসর নাহি পেলে !
এখন জানিয়ে ব্যাপারটা শুধু ঘোরাল করাই সার,
স্নার্ক তো দোরের গোড়ায় বলতে গেলে !

"মোদের সবার শোক করিবার কারণ ঘটিবে শেষটা,
সত্যিই যদি তুমি হয়ে যাও হাওয়া ;
তবে, হে রাঁধুনি, কেন যে কর নি এ কথা বলার চেষ্টা,
যখনও হয় নি শুরু এই তরী বাওয়া !

"এখন জানিয়ে ব্যাপারটা শুধু ঘোরাল করাই সার—
এ-মন্তব্য একটু আগেই করেছি ।"
রাঁধুনি বেচারি নিশ্বাস ছাড়ি কহিল বারম্বার,
"জানিয়েছিলাম জাহাজে যেদিন চড়েছি !

"অভিযোগ আন হত্যার দায়ে—বোকামির দোষ দাও
(কখনো কখনো সবার-ই তো ত্রুটি ঘটে)
মোর অপরাধ-তালিকায় তবু কক্ষনো কোত্থাও
মিথ্যা ছলনা, ভণ্ডামি নেই মোটে !

"হিব্রু ও ডাচ্ ভাষাতে সে কথা বলেছিনু অবিরত
গ্রীক বলেছিনু, বলেছিনু জার্মানও,
ভুলে গিয়েছিনু (তার তরে আমি হয়ে আছি বিব্রত)
তোমরা কেবল ইংরেজি ভাষা জানো।"

কাপ্তেন বলে, "তুমি যা শোনালে, সেটা দুঃখের কথা—"
বলিতে বলিতে চোয়াল পড়িল ঝুলে,
"—তর্কে এখন কী-বা লাভ, তার হবে নাকো অন্যথা
আগাগোড়া যাহা মোদের জানালে খুলে!

"ভাষণের শেষ অংশবিশেষ (সবার দিকে সে তাকালে)
শুনাইব পরে যবে অবসর হবে।
তবে ফের বলি, এটা মনে রেখ, স্নার্ক এসে গেছে নাগালে
তারই সন্ধানে এবে লেগে যাও সবে।

"আঙুলের টুপি দিয়ে চুপিচুপি খোঁজো তারে সযতনে :
পিছু ধাও কাঁটা-চামচে ও আশা নিয়ে ;
রেলের শেয়ারে প্রাণসংশয় জাগাও তাহার মনে ;
জাদু কোর মৃদু হাসি ও সাবান দিয়ে!

"স্নার্ক কভু নয় সাধারণ প্রাণী, তাই সবে জেনে নাও—
মামুলি প্রথায় ধরা তো যাবে না তায়।
যা-কিছু শিখেছ, সব কিছু কর, শেখ নিকো যাহা, তাও ;
একটি সুযোগও যেন না ফস্কে যায়!

"ইংলণ্ড বড়ো আশা করে আছে—আর বলিব না, থাক ;
এটা বলা রীতি, তবে বড়ো পচে গেছে।
তার চেয়ে এস, তল্পি-তল্পা খুলে বার করা যাক
রণসজ্জায় যাহা প্রয়োজন আছে।"

সেই মহাজন ঝটিতি তখন চেকে সই করে দিল,
খুচরা বদ্‌লে করে নিল সব নোট।
এবং রাঁধুনি বুলায়ে চিরুনি চুল, গোঁফ আঁচড়িল,
ধুলো-বালি ঝেড়ে সাফ করে নিল কোট।

জুতো-পালিশের চাকর এবং দালাল দুজনে মিলে
ভাগাভাগি করে শান দিল বেল্‌চাতে।
নেউল কিন্তু জাল বোনাতেই ফের মনোযোগ দিলে,
এত যে কাণ্ড, উৎসাহ নেই তাতে।

প্রবীণ উকিল করলে আপীল, দেখালে নজির নানা—
আদালতে নাকি হয়েছিল মেনে নেওয়া,
কেহ যদি শুধু বসে বসে জাল বুনে যায় একটানা
সেটা অন্যের অধিকারে হাত দেওয়া।

টুপিওলা অতি নিষ্ঠুরমতি, মাথাটি তাহার ঘামিয়ে
অভিনব ঢঙে টুপি বানাইল, খাসা।
খেলোয়াড় তার কম্পিত হাত কভু-বা থামিয়ে থামিয়ে
চুলকাল তার দীর্ঘ খড়্গ-নাসা।

কসাইয়ের হিয়া উঠিল কাঁপিয়া, পরিল বিশেষ সাজ—
কোঁচানো কলার, বাসন্তী দস্তানা ;
বলে, মনে হয় যেন সে নেমন্তন্নে যাচ্ছে আজ।
কাপ্তেন বলে, "বাজে কথা ষোলোআনা।"

কসাই জানায়, "যদি দুজনায় সাক্ষাৎ পাই তার,
তার সাথে মোর দিয়ো পরিচয় করে।"
কাপ্তেন বলে, বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বার্‌বার,
"সেটা নির্ভর করে আবহাওয়ার পরে।"

কসাইয়ের থোঁতা মুখ হল ভোঁতা, নেউলের মজা ভারি,
লম্ফে-ঝম্পে নেচে ফেরে চারিধার ;
অতি বোকা তবু ভারি নির্ভীক রাঁধুনিও তাড়াতাড়ি
চোখ মট্‌কাতে প্রয়াসিল বার বার।

ফুঁপিয়ে কসাই কেঁদে ওঠে, তাই শুনে কাপ্তেন ক্ষিপ্ত,
বলে, "হও বীরপুরুষের মতো স্থির !
বেপরোয়া পাখি জুব্‌জুব্‌ সনে সাক্ষাতে হলে লিপ্ত
প্রয়োজন হবে সবটুকু শক্তির !"

পঞ্চম সর্গ

নেউলের শিক্ষা

আঙুলের টুপি দিয়ে চুপিচুপি খোঁজে তারা সযতনে ;
পিছু ধায় কাঁটা-চামচে ও আশা নিয়ে ;
রেলের শেয়ারে প্রাণসংশয় জাগায় তাহার মনে ;
জাদু করে মৃদু হাসি ও সাবান দিয়ে।

কসাই এদিকে তার বুদ্ধিকে শানিয়ে ফন্দি করে,
দলছাড়া হয়ে অভিযানে যাবে একা ;
বেছে নিয়েছে সে দুর্গম স্থান স্নার্ক-সন্ধান তরে--
বিজন, ভীষণ গিরিপথ অ্যাঁকাব্যাঁকা।

নেউলেরও মনে এসেছে গোপনে মতলব অনুরূপ,
একই জায়গায় সেও তো চলেছে ছুটে ;
তবে, কেহ'কারে বুঝিতে দিল না, উভয়ে রহিল চুপ,
মুখেতে যদিও বিরক্তি ওঠে ফুটে।

দুজনেই ভাবে, ও তো মশগুল স্নার্কের কথা নিয়ে,
কাজের কথাই ভাবছে অনুক্ষণ ;
ভান করে, যেন লক্ষ্য করে নি, একটু তফাত দিয়ে
একই রাস্তায় চলেছে আর-এক জন।

কিন্তু যখন সেই গিরিপথ হল ক্রমে সংকীর্ণ,
শীতল আঁধার ঘন হল অবশেষে,
দুজনেই তারা (ভালোবেসে নয়, ভয়েতে হয়ে বিশীর্ণ)
হাঁটতে লাগল পাশাপাশি গায়ে ঘেঁষে।

হইল তীক্ষ্ণ শব্দে দীর্ণ আকাশের আদ্যন্ত,
দুজনেই বোঝে, বিপদ হল আসন্ন ;
নেউল হইল ফ্যাকাসে ল্যাজের সরু ডগা পর্যন্ত,
কসাইয়ের দেহ হয়ে এল অবসন্ন।

মনে পড়ে তার সেই কবেকার বালককালের কথা
সেই শৈশব, কত মধুময় লাগত ;
তীক্ষ্ণ শব্দে মনে পড়ে গেল, পেন্সিল দিয়ে যথা
শ্লেটের ওপর ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ ধ্বনি জাগত।

হঠাৎ সবলে চেঁচিয়ে সে বলে, "এটা জুব্‌জুব্‌ ডাকছে !"
(তবু ওরা 'হাঁদা' নাম রেখেছিল তার !)
বললে, "আমার বচনেতে কাপ্তেনের নকল থাকছে—
ধারণা আমার জানালাম একবার।"

"এটা হল জুব্‌জুবের আওয়াজ ! শুরু করে দাও গোনা,
দেখ, বললাম দুই বার এই কথা।
গান এটা জুব্‌জুবের গলার ! তিন বার হল শোনা,
প্রমাণ পূর্ণ, হবে নাকো অন্যথা।"

নেউল শুনেছে, আঙুলে গুনেছে, অবধানে ত্রুটি নেই ;
প্রতিটি কথাই মন দিয়ে শুনে নিয়েছে ;
তবে ভাঙা মনে মুষড়িয়ে পড়ে হঠাৎ হারিয়ে খেই—
তৃতীয় বারের হিসাবটি ভুলে গিয়েছে।

বুঝিল শেষটা এত প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে তার,
বাধে নিকো পুরো যোগ দিতে ভুলে যেতে ;
এখন কেবল অসার মগজে তোলপাড় করা সার
ভুলে-যাওয়া সূত্রের সন্ধান পেতে।

বলিল, "দুয়ের সঙ্গে একের যোগ যদি দেওয়া যেত
হাতের পাঁচটা আঙুলের ডগা ছুঁয়ে!"
নয়নের জলে মনে পড়ে তার, শৈশবকালে সে তো
কখনো বিপদে পড়ে নি অঙ্ক নিয়ে!

কসাই সে কয়, "মোর মনে হয়, সেটা করা সম্ভব,
করতেই হবে, তাতে আমি খুবই নিশ্চিৎ,
এটা করা হবে! নিয়ে এস তবে কাগজ, কলম সব ;
সেরা মাল আনো, সময় রয়েছে কিঞ্চিৎ।"

নেউল তাহারে দিল ভারে ভারে কাগজ, কলম আনি
বাক্সে-সাজানো সব কিছু দিল তাকে ;
এদিকে তখন আজব প্রাণীরা বড়ো বিস্ময় মানি
গুটিগুটি গুহা ছেড়ে এসে চেয়ে থাকে।

এ-সব ঘটনা কিছু জানিল না, কসাই বড়োই ব্যস্ত,
দুহাতে কলম বাগিয়ে সে লিখে চলে ;
নেউল যাহাতে পারিবে বুঝিতে, এমন সরল, চোস্ত
ভাষায় সকলই ব্যাখ্যা করে সে বলে :

"শুরুতেই দেখ, তিন সংখ্যাটি বিবেচ্য ধরে নিলাম,
—কাজ করা সোজা এই সংখ্যাটি নিয়ে ;
সাত যোগ দিনু, যোগ দিনু দশ, তার পর গুণ দিলাম
আট কম এক হাজার সংখ্যা দিয়ে।

"গুণফলটিকে, দেখে রাখ শিখে, করিলাম এবে ভাগ
নয় শত আর বিরানব্বই দ্বারা ;
তার পর দিনু সতেরো বিয়োগ—উত্তর ঠিকঠাক,
নির্ভুল ফল হয় নাকো এটা ছাড়া।

"যদি হত মোর অবসর, ঘিলু থাকত তোমার মগজে
—মোর কাছে এটা সোজা তো জলের মতো—
যে-পদ্ধতিতে পেরেছি কষিতে, বোঝাতাম নিজ গরজে ;
তবু, বলা বাকি রয়ে গেল আরো কত।

"অজানা, অদেখা, রহস্যে ঢাকা যাহা ছিল এতদিন,
মোর কাছে সব চকিতে হয়েছে ফাঁস ;
বাড়তি মজুরি না-নিয়েই আজি হব হেথা সমাসীন,
শেখাব তোমায় প্রাকৃতিক ইতিহাস।

"মেজাজের কথা তোল যদি, তবে জুব্‌জুব্ বড়ো মরিয়া,
সর্বদা তেলে-বেগুনেতে জ্বলে আছে।
পোশাক-আশাক বড়োই আজব, সাজে অদ্ভুত করিয়া,
চলতি ফ্যাশান প্রাচীন তাহার কাছে।

"তবে মনে রাখে বহুদিন-আগে-দেখা বন্ধুকে তার ;
ঘুষে বীতরাগ, উৎকোচ কভু নেয় না ;
চাঁদা আদায়ের সভায় দাঁড়ায় যেখানে প্রবেশদ্বার—
টাকা তোলে, তবে নিজে কানাকড়ি দেয় না ;

"হলে রন্ধিত হয় গন্ধিত, মধু-বাস আসে নাকে—
মাংস, শুগলি, ডিমের চেয়েও প্রেয় ;
(কারো কারো মতে গজদন্তের বয়ামেতে ভালো থাকে,
কেহ বলে মেহগনির পিপেই শ্রেয়।)

"কাঠের গুঁড়োতে সুসিদ্ধ কর ; গঁদ দিয়ে কর নোনা ;
পঙ্গপাল ও ফিতে দিয়ে ঘন কর ;
তবে সর্বদা রাখিয়ো খেয়াল—বিনষ্ট করিয়ো না
তার সে-গড়ন, সুমঞ্জস বড়ো।"

সারারাতটাই পারিত কসাই বকে যেতে একটানে,
কিন্তু ভাবিয়া পড়ানো সাঙ্গ করল ;
নেউলকে সে যে পরম বন্ধু বলে অন্তরে মানে
এ কথা কহিতে আনন্দাশ্রু ঝরল।

নেউল চাহিল প্রীতি-ভরা চোখে প্রেম-গদগদ ভাবে,
অশ্রুর চেয়ে অধিক প্রকাশ তার ;
জানাল, কেতাব পড়ে জেনে নিতে সত্তর সাল যাবে—
লভিল জ্ঞানের যে-বিরাট ভাণ্ডার।

দোঁহে হাত ধরে জাহাজেতে ফেরে, দেখে কাপ্তেন তৃপ্ত,
(ক্ষণেকের তরে) মহত্ত্ব আসে তার ;
বলে, "সাগরেতে যে-দুর্দশায় হতে হয়েছিল লিপ্ত,
সে-দুর্দিনের মিলিল পুরস্কার।"

সেইদিন থেকে নেউল কসাইয়ে হল গাঢ় সখ্যতা—
সেরকম প্রীতি সহজে যায় না দেখা।
শীতে বা গ্রীষ্মে সমভাব, থাকে একত্র সর্বথা,
কখনো কারেও দেখিতে পাবে না একা।

যদি-বা কখনো কলহ ঘনায়—সবাই এ কথা জানে,
ঝগড়া বাধেই, যতই কর-না চেষ্টা—
মনে হয় জুব্‌জুবের সে-গান এখনো বাজিছে কানে,
ফাটা বন্ধুতা অচ্ছেদ্য হয় শেষটা।

ষষ্ঠ সর্গ

উকিলের স্বপ্ন

আঙুলের টুপি দিয়ে চুপিচুপি খোঁজে তারা সযতনে ;
পিছু ধায় কাঁটা-চামচে ও আশা নিয়ে ;
রেলের শেয়ারে প্রাণসংশয় জাগায় তাহার মনে ;
জাদু করে মৃদু হাসি ও সাবান দিয়ে।

জাল বুনে ভুল করেছে নেউল, সেটা প্রমাণিতে গিয়ে
ব্যর্থ উকিল ক্লান্ত ও লাঞ্ছিত—
সুপ্তির কোলে পড়িলেন ঢলে। স্বপ্নে আকার নিয়ে
দেখা দিল তাঁর সেই বহুবাঞ্ছিত।

স্বপ্নে দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন ম্লান আদালত-কক্ষে
সেথা স্নার্ক আছে, মাথায় পরেছে শামলা ;
চশমা লাগায়ে, চাপকান-গায়ে, এক শুয়োরের পক্ষে
লড়ছে সেখানে খোঁয়াড় ত্যাগের মামলা।

সাক্ষী আসিল, প্রমাণ করিল—সে যখন দেখেছিল,
খোঁয়াড় তখন ছিল যে বেবাক ফাঁকা।
জজ্ আইনের গূঢ় অর্থের সরল ব্যাখ্যা দিল,
—কণ্ঠ তাহার চাপা রহস্যে ঢাকা।

অভিযোগ যাহা, প্রকাশিয়া তাহা বলা তো হল না কদাপি
তবুও সওয়াল দিলে স্নার্ক শুরু করে ;
কেহ বোঝে না যে, শুয়োর করেছে কী-বা অপরাধ, তথাপি
স্নার্ক বলে চলে ঘণ্টা তিনেক ধরে।

জুরি ছিল যত, মত হল তত, কারো সাথে কারো মিল নেই,
(তখনো হয় নি অভিযোগ পাঠ করা)
একসাথে সবে কথা বলে যবে, কারুরই মুখেতে খিল্ নেই ;
কে যে কী বলছে শক্ত হল তা ধরা।

বিচারক কহে, "জানা দরকারি—" স্নার্ক বলে, "দুত্তোর !"
ঐ বিধি নয় চলিত অথবা বিহিত ;
শোন ভাই সব, গোটা মামলার প্রশ্নের উত্তর
প্রাচীন মৌজা-স্বত্ব আইনে নিহিত।

রাজদ্রোহের গুরু অপরাধে শুয়োর সহায় বড়ো জোর,
তবে উৎসাহ দেয় নাই এক তিল ;
'কভু কারো ধার ধারি নিকো' বলে যদি মেনে নাও তার ওজর,
'দেউলিয়া' অভিযোগটি হবে বাতিল।

পরিত্যাগের ব্যাপারটা নিয়ে যাব না বিসম্বাদে ;
তবে দোষ তার হয়েছে অপসৃত
(অপরাধ যাহা ঘটেছে খরচে মামলার এ-বিবাদে)
সাক্ষী-সাবুদে হয়েছে তা প্রমাণিত।

"তোমাদেরই ভোটে এ-মক্কেলের পরিণাম হবে স্থির।"
বলা শেষ করে গ্রহণ করল আসন ;
জজেরে হুকুম দিল, নোট দেখে দেখে এ-মামলাটির
অতি সংক্ষেপে দিতে চূড়ান্ত ভাষণ।

জজ্ বলে, আগে কোনো মামলায় ভাষণ দেয় নি নিজে,
কাজেই স্নার্ক-ই নিল সেই কর্তব্যে ;
তার সেই সার-ভাষণে রহিল এমন কতই কি-যে
ছিল না যা কোনো সাক্ষীর বক্তব্যে।

জুরিদের রায় চাহিলে, তাহারা জানাল, এ-কাজে রাজি নয়,
কারণ, কথার বানানটা জানা নেই ;
তবে এই আশা করিল প্রকাশ—স্নার্কের যদি মতি হয়,
এ-কাজের ভারও নিতে পারে নিজে সে-ই।

অগত্যা স্নার্ক সারাদিন খেটে, দেহে নিয়ে অবসাদ
মামলার রায় করিল নির্ধারণ ;
ঘোষিল যখন—"দোষী" ! জুরিগণ তুলিল আর্তনাদ,
কেহ-বা গভীর শোকে জ্ঞানহারা হন।

স্নার্ককেই উঠে ঘোষণা করতে হল শাস্তির কথা,
কেননা ঘাবড়ে বসে আছে জজ্ স্তব্ধ ;
স্নার্ক উঠে দাঁড়াতেই নামে রাত্রির নীরবতা,
ছুঁচ পড়লেও শোনা যাবে তার শব্দ।

শাস্তি হইল ঘোষিত, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে,
দু-কুড়ি পাউণ্ড সব শেষে জরিমানা।"
জুরিরা প্রকাশে উল্লাস, তবু জজ্ আশঙ্কা করে—
আইনসিদ্ধ বলে এ যায় না মানা।

সব উল্লাস কল-কোলাহল চকিতে থামিয়া গেল,
জেলার যখন জানাল অশ্রুজলে—
শাস্তি এখন বিফল, কারণ কয়েক বছর হল
শুয়োর দিব্যি পরলোকে গেছে চলে।

জজ্‌ নিদারুণ বিরক্তিভরে আদালত ছেড়ে চলে যান ;
স্নার্ক তবু দমে গেলেন না একরত্তি,
আসামী-তারণ উকিলের মতো শেষাবধি গর্‌জিয়া যান,
যদিও অবাক হয়েছেন, সেটা সত্যি।

এই-সে স্বপ্ন দেখিছে উকিল ; স্নার্কের চীৎকার
ক্রমশই যেন আরো জোর হয়ে আসে ;
ঘুম ভেঙে যায় শুনে কান-ফাটা ঝন্‌ঝন্‌ ঝঙ্কার,
দেখে, কাপ্তেন ঘণ্টা বাজায় পাশে।

সপ্তম সর্গ

বিলুপ্তি

আঙুলের টুপি দিয়ে চুপিচুপি খোঁজে তারা সযতনে ;
পিছু ধায় কাঁটা-চামচে ও আশা নিয়ে ;
রেলের শেয়ারে প্রাণসংশয় জাগায় তাহার মনে ;
জাদু করে মৃদু হাসি ও সাবান দিয়ে।

বিফল হল-বা আয়োজন—ভেবে সবাই শিহরি উঠে।
নেউল তখন আচম্‌কা গেল ক্ষেপে ;
ল্যাজের ডগায় ভর করে লাফ দিয়ে দিয়ে গেল ছুটে,
তখন আঁধার নামছে আকাশ ব্যেপে।

কাপ্তেন বলে, "ঐ চীৎকার করিতেছে নাম-ভোলা,
পাগলের মতো ডাকিছে সে, ঐ শোন!
হাত নাড়িছে সে এবং দিতেছে ঘনঘন মাথা-দোলা—
স্নার্ক দেখেছে সে, সন্দেহ নেই কোনো!"

সকলে তাকাল, রাঁধুনি বলিল, "এটা জানি আমি নিজে,
বরাবরই ছোঁড়া বড়ো বেপরোয়া ধাঁচের!"
তখন তাহারে দেখা গেল—নামহীন সেই রাঁধুনি যে
দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়-চূড়ায় কাছের।

মহিমা-মূর্ত, খাড়া-শির তারে দেখা গেল ক্ষণতরে,
মুহূর্তেকের পরে এক লহমাতে
আবেগে শিহরি চোখের নিমেষে ঝাঁপ দিল গহ্বরে,
সবে উদ্‌গ্রীব হয়ে রাখে কান পেতে।

প্রথমেই কানে ভেসে এল স্বর, "দেখিতে পেয়েছি স্নার্ক!"
এ-সৌভাগ্য মানা যে যায় না কভু!
তার পর শুধু কলকল হাসি আর উলসিত হাঁক;
শেষে ভয়ানক সেই কথা, "এ যে বু—!"

তার পর সব নীরব। কেবল কারো কারো কানে যায়
হাওয়ায় কাহার হতাশ দীর্ঘশ্বাস
অস্ফুটে যেন কহিতেছে "—জাম!" অন্যে মানে না তায়,
বলিল, "ও-সব কিছু না, শুধু বাতাস।"

খোঁজ করা হল, রাত্রি ঘনাল, তবু পাওয়া নাহি যায়
বোতাম কিম্বা পালকের সাক্ষাৎ,
এমন চিহ্ন, যাতে বোঝা যায় সেদিন সেখানে, হায়,
স্নার্ক-রাঁধুনিতে হয়েছিল সাক্ষাৎ।

যে কথা বলিতে চেয়েছিল, তার আধেক বলার শেষে,
হাসি ও খুশির মাঝেতে অকস্মাৎ—
মোলায়েমভাবে এক লহমায় অদৃশ্য হয়েছে সে;
কারণ—সে-স্নার্ক বুজাম যে নির্ঘাৎ!

চিঠি-পত্র

ছোট্টো বন্ধুদের মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন ক্যারল। কখনো সাধারণভাবে শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে ছেপে বার করার জন্য—সেগুলো একটু গুরু গম্ভীর; আবার কখনো-বা অন্তরঙ্গ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে—সেগুলো নিছক হাসি-ঠাট্টার।

এখানে যে চারটি চিঠির অনুবাদ দেওয়া হল, পড়লেই বোঝা যাবে, কোনটি কোন জাতীয়। বলা বাহুল্য, সব কটিই জনপ্রিয় লেখক হিসাবে সুপরিচিত হবার পরের লেখা।

অ্যালিসকে যারা ভালোবেসেছে
তাদের সব্বাইকে ঈস্টারের প্রীতিসম্ভাষণ

প্রিয় খোকাখুকু,

মনে মনে ভেবে নেবার চেষ্টা কর, যেন তোমার চেনা-জানা সত্যিকারের কোনো-এক বন্ধুর লেখা সত্যিকারের চিঠি পড়ছ, আর, সেই সঙ্গে কল্পনা কর, যেন শুনতে পাচ্ছ যে, সে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তোমায়—আমি যেমন জানাচ্ছি, অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানাচ্ছি—ঈস্টার আনন্দময় হোক।

গ্রীষ্মের কোনো মিষ্টি সকালে প্রথম চোখ মেলবার সঙ্গে সঙ্গে যখন আকাশে পাখিদের কাকলি কানে আসে, খোলা জানলা দিয়ে আসে টাটকা বাতাসের স্পর্শ—অলস আমেজে আধ-খোলা চোখে স্বপ্নের মতো দেখা যায় সবুজ শাখার আন্দোলন, সোনা-ঝরা আলোয় জলের ঢেউয়ের ঝিকিমিকি—সেই সময়কার স্বপ্নময় মনোরম স্বাদ কি তোমার জানা আছে? সে-আনন্দ বেদনার বড়ো কাছাকাছি, সুন্দর কবিতা বা ছবির মতো চোখে জল এনে দেয়। আর, তোমার মা-ই তো মিষ্টি গলায় ডাকেন তোমায় জেগে উঠতে। জেগে উঠতে, আর সেই সঙ্গে, সূর্যের আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে দেখা বিচ্ছিরি স্বপ্নের কথা সব মন থেকে মুছে ফেলতে—জেগে উঠে আবার একটি নতুন আনন্দময় দিনের সুখের ভাগ নিতে, আর যে অদেখা বন্ধু সুন্দর এই সূর্যকে পাঠালেন তোমার

কাছে, সবচেয়ে আগে নতজানু হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে—তাই-না ?

যে 'অ্যালিস'-এর গল্প লিখেছে, তার কাছ থেকে এই-সব কথা অদ্ভুত শোনাচ্ছে বুঝি ? আবোল-তাবোলের বইয়ে এই ধরনের চিঠি অদ্ভুত মনে হচ্ছে ? হতে পারে। চটুল আনন্দের সঙ্গে এইভাবে গুরুগম্ভীর ব্যাপার আমদানি করার জন্যে অনেকেই হয়তো দোষারোপ করবেন আমার ওপর ; আবার কেউ হয়তো মুচকি হেসে মনে মনে বলবেন, একমাত্র রবিবারে গীর্জায় ছাড়া এ-ধরনের আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলাই উচিত নয়। আমি কিন্তু মনে করি—তা কেন, আমি নিশ্চিত জানি, —ছেলেমেয়েদের অনেকেই শান্ত শ্রদ্ধায়, সাদর আগ্রহে এই লেখা পড়বে ; সেই মন নিয়ে পড়বে, যে-মন নিয়ে আমি এটা লিখেছি।

কারণ, আমি বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বর চান, আমরা জীবনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে রাখব—রবিবারে মুখখানাকে গম্ভীর করে রাখব, আর সপ্তাহের অন্যকটা দিন তাঁর নামটাও মুখে আনব না। তোমার কি ধারণা, তিনি শুধু এই দেখতেই চান যে, মানুষ প্রার্থনায় নতজানু হয়ে আছে, শুধু শুনতে চান স্তবের ধ্বনি—ঝলমলে রোদ্দুরে ভেড়াগুলো খুশিতে লাফালাফি করছে, এ-সব দেখতে, বা খড়ের গাদায় হুটোপাটি করতে করতে ছেলেমেয়েরা আনন্দে কলরোল তুলছে, এ-সব শুনতে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই ? অতি পবিত্র গীর্জার আধ্যাত্মিক আলো-আঁধারির মধ্যে থেকে আজও পর্যন্ত সবচেয়ে মহিমময় যে-স্তুতিগান তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছে, আমি নিশ্চয় জানি, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের অনাবিল হাসির কলতান তার চেয়ে কিছু কম মধুর শোনায় নি তাঁর কাছে।

যে ছেলেমেয়েদের আমি এত ভালোবাসি, তাদের জন্যে লেখা বইয়ের পাতায়-পাতায় যে নির্দোষ আর প্রফুল্ল আনন্দের পশরা সাজানো আছে, আমি যদি তাতে নতুন কিছু জোগাতে পেরে থাকি আমার লেখার দৌলতে, তা হলে তার জন্যে আমার কোনো সঙ্কোচ, কোনো দুঃখ নেই, বরং সেই ছায়া-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে শেষ-পাড়ি দেবার সময় যখন আমার আসবে, তখন গর্বের সঙ্গে সে কথা স্মরণ করতে পারব বলে আশা করে আছি।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তোমার জীবনের জোয়ার এখন, সকালের তাজা হাওয়ায় বেরিয়ে পড়বার জন্যে তুমি ব্যাকুল—সেই

তোমার গায়ে-মাথায় আজকের ঈস্টারের সূর্য ছড়িয়ে দেবে তার সোনার আলো—তার পর যখন অনেক ঈস্টারের দিন পার হয়ে যাবে, তখন কোনো-এক ঈস্টারের দিনে দেখা যাবে, তুমি দুর্বল, তোমার মাথা সাদা চুলে ঢেকে গেছে, ক্লান্ত পায়ে গুটি গুটি বাইরে বেরিয়ে আসছ আবার একবার রোদ পোহাতে—তার এখনো অনেক দেরি, তবু, আজকে এই মুহূর্তেও কখনো একবার সেই পরম প্রভাতটির কথা মনে করা ভালো, যেদিন 'ন্যায়ের সূর্য উদিত হবে তার আলোর পাখায় নিরাময়ের আশ্বাস নিয়ে!'

একদিন আজকের চেয়ে অনেক বেশি ঝলমলে সকাল আসবে তোমার জীবনে, তবে সে কথা ভেবে আজকের আনন্দকে ক্ষুণ্ণ কোর না—সেদিন সবুজ শাখার আন্দোলন আর ঢেউ-তোলা জলের চেয়ে আরো মনোরম ছবি তোমার চোখে পড়বে—দেবদূতের হাতের ছোঁয়ায় খুলবে তোমার জানলার পর্দা, যে-কোনো মমতাময়ী মায়ের মিষ্টি গলার চাইতে মধুর ডাকে ঘুম ভাঙবে তোমার মহিমময় এক নতুন দিনের সকালে—আর, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র পরিসরে যে-সব বেদনা, যে-সব পাপ জীবনটাকে আঁধার করে তুলেছিল, অনেকদিন আগেকার রাতের স্বপ্নের মতো সে সবকিছু মুছে যাবে মনের আয়না থেকে।

তোমাদের ভালোবাসার বন্ধু,
লুইস ক্যারল।

'আজব দেশে অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার'-এর ছোট্টো পাঠক-পাঠিকাদের সব্বাইকে

প্রিয় ছোট্টোরা,

খৃস্টমাসের সময়ে দু-একটা গুরুগম্ভীর কথা যদি শোনাই তোমাদের, আশা করি, সেটা খুব খাপছাড়া হবে না—বিশেষ করে এমন একটা মজার আবোল-তাবোল গল্পের ঠিক পরে হলেও—আর, এই সুযোগে, হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা, যারা 'আজব দেশে অ্যালিসের

'অ্যাডভেঞ্চার' পড়েছে, আমার কল্পনার ছোট্টো অ্যালিস মেয়েটিকে ভালোবেসে তার সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছে, তাদের সব্বাইকে ধন্যবাদ জানালাম।

আমি ভাবি, ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে আগুন পোহাতে পোহাতে কত ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে অ্যালিসকে আদর করে বরণ করে নিয়েছে, কত ছেলেমেয়ের জীবনে অ্যালিস বয়ে এনেছে (আমার তাই বিশ্বাস) ঘণ্টাখানেকের নির্দোষ খুশির খোরাক—এ-সব আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সুখের চিন্তা। আমার বাচ্চা বন্ধুর তো অভাব নেই, তাদের নাম জানি, তাদের মুখ চিনি—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে না করে পারি না যে, 'অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার'-এর দৌলতে আরো অসংখ্য মিষ্টি-মিষ্টি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাতান হয়ে গেল, যাদের মুখ দেখতে পাব না কোনোদিনই।

জানা অজানা, আমার ছোট্টো বন্ধুদের সব্বাইকার জন্যে আন্তরিক কামনা জানাই—খৃস্টমাস আনন্দের হোক, নতুন বছর সুখের হোক। প্রিয় বন্ধুরা আমার, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন, বছর-বছর যখন খৃস্টমাস ফিরে ফিরে আসবে, তাঁর করুণায় যেন প্রতিবার আগের বছরের চেয়ে তা আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর হয়ে ওঠে—উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই অদেখা বন্ধুর উপস্থিতিতে, যিনি এই পৃথিবীতে এসে একদিন ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করেছিলেন, আর সুন্দর হয়ে ওঠে সেই প্রেমময় জীবনের স্মৃতিতে, যে জীবন সন্ধান করে জানতে পেরেছিল সেই পরম সুখের ঠিকানা—যে সুখ চাওয়ার মতো, যে সুখ অপরকে সুখী করে পেতে হয়!

তোমাদের ভালোবাসার বন্ধু,
লুইস ক্যারল।
২৫ ডিসেম্বর, ১৮৭১

ক্রাইস্ট চার্চ
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৭৫।

প্রিয় ম্যাগ্‌ডালেন,

গতকাল কেন তোমার কাছে যেতে পারি নি, খুলে বলি। তোমার কাছে যাওয়া হল না বলে খুব দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু কী করব বল, রাস্তায় এত বকবক করতে হয়েছে কী বলব। সবাইকে বুঝিয়ে বললুম যে, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তবু তারা কথা কানেই নেয় না। বলে কিনা, ওদের বড্ডো তাড়া—কী অভব্য বল তো? শেষকালে একচাকার ছোট্টো একটা ঠেলাগাড়ি দেখে ভাবলুম, আমার কথায় ও অন্তত কান দেবে। তবে, গাড়ির মধ্যে কী আছে, তার হদিশ পাচ্ছিলুম না। প্রথমটায় কিছু একটা চোখে পড়ল, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে বুঝলুম একটা আকার বুঝতে পারা যাচ্ছে, তার পর মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে বুঝলুম, আরে! একটা মুখ! মনে হল যেন আমার মতোই দেখতে, তাই নিঃসন্দেহ হবার জন্যে একটা বড়ো আয়না নিয়ে এলুম, দেখলুম, সত্যি আমিই। কী মজা! আমরা করমর্দন করে কথাবার্তা শুরু করতে যাচ্ছি এমন সময়ে স্বয়ং এসে হাজির; তার পর তিনজনে বেশ গল্পগুজব হল। আমি বললুম, "স্যান্‌ডাউন-এ আমাদের দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে?" স্বয়ং বললে, "হ্যাঁ, বেশ মজা হয়েছিল; ম্যাগ্‌ডালেন বলে একটা বাচ্চা ছিল সেখানে।" গাড়ির আমিই বললে, "ওকে আমি কিছুটা পছন্দ করতুম; বেশি নয়, বুঝলে তো—সামান্য একটুখানি।" তার পর আমাদের ট্রেন ধরবার সময় হল। ট্রেনে তুলে দিতে কারা এসেছিল বল তো? আন্দাজ করতে পারবে না, বলেই দিচ্ছি। আমার খুব প্রাণের বন্ধু দুজন। তারা এখন আমার কাছেই রয়েছে, আর তোমার শুভার্থী বন্ধু হিসেবে এই চিঠির তলায় সই করতে চাইছে।

লুইস্ ক্যারল ও সি. এল. ডজ্‌সন।

ক্রাইস্ট চার্চ, অক্সফোর্ড
৮ মার্চ, ১৮৮০

প্রিয় অ্যাডা,

(তোমার ডাকনাম তো তাই ? 'অ্যাডেলেড' নামটা ভালোই, তবে, বোঝ তো, ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে অত বড়ো কথা লেখবার কি সময় থাকে—বিশেষ করে বানান ভাবতেই যেখানে আধ ঘণ্টা লেগে যায়—তার পর তো আবার অভিধান খুলে মিলিয়ে দেখতে হবে, বানানটা ঠিক হল কি না, আর অভিধানটা নির্ঘাৎ অন্য ঘরে আছে, বইয়ের আলমারির একেবারে উঁচু তাকে—মাসের পর মাস এক জায়গায় পড়ে থেকে থেকে ধুলোয় ঢেকে গেছে—কাজেই, প্রথমে একটা ঝাড়ন জোগাড় করতে হবে, তার পর ধুলো ঝাড়তে গিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হবার জো হবে—তার পর ধর, সে-সব চুকে যাবার পর শেষপর্যন্ত না-হয় বোঝাই গেল কোনটা অভিধান আর কতখানিটা শুধু ধুলো—তা হলেও, মনে মনে তখন ঠিক করতে হবে A অক্ষরটা অভিধানের কোন দিকে আছে, প্রথম দিকে না শেষের দিকে—কারণ, মাঝ-বরাবর যে হবে না, তাতে কারুরই সন্দেহ নেই—তার পর অভিধান খোলবার আগে হাত ধুয়ে আসার দরকার হবে—কারণ এমন পুরু হয়ে ধুলো লেগে আছে যে, হাত বলে চেনাই যাচ্ছে না—আর, কিছুই বিচিত্র নয় যে, সাবানটা খুঁজে পাওয়া যাবে না, জলের জাগটা খালি পড়ে থাকবে, তোয়ালের হদিশ পাওয়া যাবে না, তখন এই-সব খুঁজে বার করবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাবে—হয়তো, শেষপর্যন্ত নতুন সাবান কেনবার জন্যে দোকানে ছুটতে হবে—কাজেই, এই-সব হাঙ্গাম-হুজ্জুতের মধ্যে না গিয়ে

বাবা-কে

যাঁর প্রসাদ সকল রসবোধের স্পর্শমণি।

এবং

কয়েকজন ঘরোয়া শ্রোতা-কে

যাদের অভিমত আমার কষ্টিপাথর।

সূচীপত্র

আর্থার বললে, "শুভরাত্রি, বন্ধু!" তার স্বরে বলিষ্ঠ পৌরুষের আভাস পেয়ে বুঝলুম, যে গভীর বেদনায় তার জীবন আজ চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে, প্রাণপণে যুঝে তাকে সে জয় করে এনেছে; বুঝলুম, এই মৃতকল্প জীবনের সোপান বেয়ে অনেক উচ্চস্তরে গিয়ে পৌঁছবে সে।

বিয়ের কথা যেদিন ঘোষণা করা হয়, পরের দিনই এরিক লণ্ডনে ফিরে গেছে, কাজেই 'হল'-এ এরিকের সঙ্গে দেখা হবার কোনো আশঙ্কা নেই; রবিবার দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই কথা মনে করে আরাম পেলাম। মুরিয়েলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে আর্থার খুব শান্ত হয়ে রইল—প্রায় আস্বাভাবিক শান্ত— আর সময়োপযোগী দু-একটা কথা বললে; এরিক উপস্থিত থাকলে হয়তো সে এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারত না।

লেডি মুরিয়েলের মুখে-চোখে আনন্দের উদ্ভাস: অমন মিষ্টি হাসির আলোয় দুঃখের অন্ধকার কি থাকতে পারে! সে হাসির স্পর্শে আর্থারকে পর্যন্ত খানিকটা প্রফুল্ল মনে হল। মুরিয়েল যখন বললে, "আজ 'স্যাবাথ্ ডে', মানে রবিবার হওয়া সত্ত্বেও, দেখুন, আমি ফুলগাছে জল দেবার কাজ করছি," তখন আর্থার প্রায় তার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল ভঙ্গিতেই জবাব দিলে, "স্যাবাথ্ ডে-তেও করুণা বা দাক্ষিণ্যের কাজ করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু, এটা তো স্যাবাথ্ ডে নয়। স্যাবাথ্ ডে বলে এখন আর কিছু নেই।"

লেডি মুরিয়েল বললে, "আজ শনিবার নয়, এটা তো জানি। কিন্তু, রবিবারকে প্রায়ই 'ক্রিশ্চিয়ানদের স্যাবাথ্ ডে' বলে না?"

"ইহুদিদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে একটা দিন বিশ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে; আমার মনে হয়, এই রীতির মধ্যে যে মূল ভাবটুকু রয়েছে, তারই স্বীকৃতি হিসাবে রবিবারকে স্যাবাথ্ ডে বলা হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের দশটি বিধানের অন্তর্গত এই চার নম্বরের বিধানটি আক্ষরিক অর্থে মানবার কোনো দায় ক্রিশ্চিয়ানদের নেই।"

"আমরা যে রবিবার মানছি, এ-রীতির মূল নজির তা হলে কোথায়?"

"প্রথমত, আমরা জানি যে, সৃষ্টির কাজে হাত লাগিয়ে ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন; সেই হিসেবে সপ্তম দিনটি পূত-পবিত্র। ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসেবে এটা মানতে আমরা বাধ্য। দ্বিতীয়ত, আমরা

জানি যে, ক্রিশ্চিয়ান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে, প্রভু যীশু রবিবার দিনেই মৃত্যুলোক থেকে উঠে এসেছিলেন; তাই এটাকে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মীয় আচার বলে মনে করা যেতে পারে। ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে এটাও মানতে আমরা বাধ্য।

"সে-ক্ষেত্রে, কাজে-কর্মে আপনি যে-নিয়ম মানবেন, সেটা—"

"প্রথমত, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে, এই দিনটিকে বিশেষ কোনো উপায়ে পবিত্রতায় পুণ্যময় করে তুলব, আর, কাজ-কর্ম যথাসম্ভব পরিহার করে চলব। দ্বিতীয়ত, ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে, সমষ্টিগতভাবে উপাসনায় যোগ দেব।"

"আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপারে কী হবে?"

"আমোদ-আহ্লাদ বা কাজ-কর্ম—সব ব্যাপারে একই কথা বলব যে, সপ্তাহের অন্য কটা দিনে যাকে নির্দোষ বলে বিবেচনা করা হয়, রবিবার দিনের পক্ষেও তা নির্দোষ; কেবল দেখতে হবে যে, সে-দিনের বিশেষভাবে পালনীয় কর্তব্যের কোনো ব্যাঘাত না-ঘটে।"

"ছেলেমেয়েদের তা হলে রবিবারে খেলা করতে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই দেব। ওরা স্বভাব-চঞ্চল; ওদের ব্যাজার করে কী লাভ?"

লেডি মুরিয়েল বললে, "আমার এক পুরনো বন্ধু তার চিঠিতে আমায় লিখেছিল, ছেলেবেলায় কী ভাবে রবিবার দিনটি তাদের কাটত—চিঠিটা কোথাও একটা রেখেছি। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।"

মুরিয়েল চলে যেতে, আর্থার বললে, "আমিও ঐ ধরনের একটা মৌখিক বিবরণ শুনেছিলাম বাচ্ছা একটি মেয়ের কাছ থেকে। করুণ গলায় যখন সে বললে, 'রবিবার দিন পুতুল নিয়ে খেলতে নেই! রবিবারে বালির ওপর ছুটোছুটি করতে নেই! রবিবারে বাগানে মাটি খুঁড়তে নেই!'—শুনে বড়ো কষ্ট হয়েছিল। বেচারি! রবিবারকে সে ঘেন্না করে কি সাধে!"

মুরিয়েল ফিরে এসে বললে, "এই যে চিঠিটা। একটা জায়গা পড়ে শোনাই:—

"ছেলেবেলায়, রবিবারের ভোরে যখন প্রথম চোখ মেলতাম, শুক্কুরবার থেকে মনে মনে পুষে-রাখা একটা পীড়াদায়ক আশঙ্কা বাস্তব হয়ে দেখা দিত। সারাদিন-ভোর আমার কপালে কী কী আছে, সব

আমি যে তোমার নামটাকে কাটছাঁট করে 'প্রিয় অ্যাডা' লিখেছি, তার জন্যে আশা করি কিছু মনে কর নি)। তুমি শেষ যে-চিঠিটা লিখেছিলে তাতে জানিয়েছ, এমন কিছু তোমার পছন্দ, যার মধ্যে আমার আদল আছে ; এই তো পেলে, আশা করি পছন্দ হবে—এর পরের বারের আগের বার যখন ওয়ালিংটন-এ যাব, তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলব না।

তোমার শুভার্থী বন্ধু,

লুইস ক্যারল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ*

পূর্বাচলের পানে তাকাই

তিনদিন বাদে আর্থারকে বললাম, "এক সপ্তাহ হয়ে গেল লেডি মুরিয়েলের বাগ্‌দানের কথা আমরা জেনেছি। মনে হচ্ছে, আমার অন্তত একবার গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানানো নেহাত-ই উচিত। সঙ্গে যাবে না-কি?"

আর্থারের মুখের ওপর দিয়ে একটা বেদনার ছায়া ভেসে গেল। জিগেস করলে, "কবে তোমায় এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে?"

"সোমবারের প্রথম ট্রেনে।"

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে যাব ওদের বাড়ি। না-গেলে বড়ো অস্বাভাবিক দেখাবে, সৌজন্যের অভাব ঘটবে। কিন্তু আজ তো সবে শুক্রবার। রবিবার বিকেল পর্যন্ত আমায় সময় দাও। তার মধ্যে আমি অনেকখানি শক্ত হয়ে নিতে পারব।"

এক হাত দিয়ে চোখের জল আড়াল করে অন্য হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে। ধরতে গিয়ে দেখলুম, থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

সুহানুভূতি জানাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেলুম না। চুপ করেই রইলুম। শুধু বললুম, "শুভরাত্রি!"

*৩৪৭ পাতার পর 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'র শেষাংশ।

মুরিয়েল বললে, "না, না!"

আর্থার নিজের মনে বলে উঠল, 'ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।' এত অস্ফুটে বললে, যে আমিই কেবল শুনতে পেলাম। "তা হলে, আপনি মেনে নিচ্ছেন যে, আমি খুশিমতো এই কাপটাকে এদিকে বা ওদিকে সরিয়ে রাখতে পারি?"

"হ্যাঁ, মেনে নিচ্ছি।"

"বেশ, এখন দেখা যাক, নির্দিষ্ট নিয়মের পরিণামটা কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। কাপটা সরে যাচ্ছে, তার কারণ, আমার হাতের মাধ্যমে তার ওপর খানিকটা শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। আমার হাতটা কাজ করছে, তার কারণ, একটা শক্তি—বৈদ্যুতিক, চৌম্বক বা স্নায়ু-শক্তির স্বরূপ বলতে অন্য যা-কিছুই বোঝাক-না কেন—একটা শক্তি আমার মস্তিষ্ক থেকে এসে প্রযুক্ত হচ্ছে হাতের ওপর। বিজ্ঞানের যখন চরম উন্নতি ঘটবে, তখন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চিত এই স্নায়ু-শক্তির সূত্র হয়তো এমন কোনো রাসায়নিক শক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, যা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হচ্ছে রক্তের মাধ্যমে, এবং সেই রক্ত আবার সৃষ্টি হচ্ছে আমার খাদ্য থেকে, আমার প্রশ্বাসের বাতাস থেকে।"

"কিন্তু এটা কি অদৃষ্টবাদ হল না? স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ রইল কোথায়?"

আর্থার বললে, "কোন স্নায়ুকে বেছে নেব, সেই ইচ্ছার মধ্যে। মস্তিষ্কের স্নায়ু-শক্তি একটা স্নায়ু দিয়ে যত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে, অন্য যে-কোনো স্নায়ু দিয়েও তাই। কোন স্নায়ু দিয়ে আসবে, সেটা সাব্যস্ত করবার জন্যে শুধু বাঁধাধরা প্রাকৃতিক নিয়মে কুলোবে না, আর কিছু একটার দরকার। সেই 'আর কিছুটাই' হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা।"

মুরিয়েলের দুচোখ আলোয় ঝিক্‌মিক্ করে উঠল; বললে, "আপনি কী বলতে চাইছেন, বুঝেছি!" মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা হল প্রাকৃতিক বিধানের ব্যতিক্রম। এরিক ঐরকম কী একটা বলেছিল। মনে হচ্ছে, ও দেখিয়েছিল যে, মানুষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে ঈশ্বর কেবল প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারেন মাত্র। তার ফলে, আমরা যদি প্রার্থনা করি, 'ভগবান, আমার আজকের খাদ্য জুটিয়ে দাও,' তা হলে সেটা অযৌক্তিক হবে না; কারণ খাদ্য উৎপাদনের জন্যে যা যা প্রয়োজন,

তার অনেকগুলোই মানুষের হাতে। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করা, বা আবহাওয়া ভালো রাখার জন্যে প্রার্থনা করার মধ্যে কোনো যুক্তি—"

পাছে কোনো অশ্রদ্ধার কথা বলা হয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় মুরিয়েল কথাটা শেষ করলে না।

চাপা, অস্ফুট ভঙ্গিতে, আবেগ-কম্পিত স্বরে, মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্র স্নিগ্ধতায় আর্থার ধীরে ধীরে বললে, "আমরা এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়; সৃষ্টিলোকের কীটাণুকীট সেই আমরা, প্রকৃতিকে ইচ্ছামতো চালাবার মতো শক্তির অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাস করে অসীম স্পর্দ্ধা আর ঘৃণিত ঔদ্ধত্যের বিকারে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে কি এই কথা বলতে যাব, 'এইপর্যন্তই থাক, আর নয়। তুমি সৃষ্টি করেছ, কিন্তু তুমি পালন করতে জান না!' "

লেডি মুরিয়েল দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল, মুখ তুলে চাইতে পারলে না। বার বার শুধু বলতে লাগল, "ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ!"

আমরা যাবার জন্যে উঠলাম। আর্থার বললে, "আর একটা কথা। মানুষের পক্ষে যা-কিছু চাইবার থাকতে পারে, সেই সমস্তরকম কামনা পূরণের ক্ষেত্রে প্রার্থনার অসীম ক্ষমতার কথা যদি বুঝে থাকেন, একবার পরখ করে দেখবেন। চেয়ে দেখুন, পেয়ে যাবেন। আমি—চেয়ে দেখেছি। আমি জানি ঈশ্বর প্রার্থনা পূরণ করেন!"

বাড়ি ফেরার সারা পথটা আমরা কথা কই নি।

বাড়ি ফিরেও ও-প্রসঙ্গ আর তোলা হল না। বসে বসে কত গল্পই না করলাম দুজনে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল, আমাদের দুই বন্ধুতে ছাড়াছাড়ি হবার আগের এই শেষের রাতটা কখন যেন অলক্ষিতে ভোর হয়ে গেল। ভারতের কথা, সেখানে তার যে নতুন জীবন শুরু হবে, তার কথা, যে-কাজ করবার আশা নিয়ে সে-দেশে যাচ্ছে, তার কথা—অনেক কথাই বলবার ছিল আর্থারের। ওর উদার হৃদয়টি মহৎ উচ্চাশায় এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে মনে হল যে, সেখানে তখন ছোটোখাটো ক্ষোভ বা ব্যক্তিগত বিফলতার অনুযোগের স্থান নেই।

আর্থারই শেষে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "এস, ভোর হয়ে এল! একটু বাদেই সূর্য উঠবে। এল্‌ভেস্টনে শেষবারের মতো রাত্রের বিশ্রামের সুযোগ থেকে স্বার্থপরের মতো তোমায় বঞ্চিত করলুম হয়তো, তবু, আমি জানি, তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা

আমার জানা ; তাই, মনে মনে কামনা করতাম, মুখ ফুটে হয়তো বলতাম না, 'ভগবান করুন, ভোর নয়, এটা যেন সন্ধে হয় !' বিশ্রামের দিন মোটেই নয় ; পবিত্র ধর্মগ্রন্থের গুরু গম্ভীর বচন, প্রশ্নের জাল বুনে-বুনে তৈরি নীতিশিক্ষা, এবং সেই সঙ্গে পাপ-কথা বলতে অভ্যস্ত মন্দ লোকেদের সুমতি হবার কাহিনী, সামান্য ঝাড়ুদারনীর দেবসুলভ মহত্ত্বের কাহিনী আর মহাপাতক থেকে উদ্ধার-পাওয়া লোকেদের মরণোত্তর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কাহিনী নিয়ে রচিত পবিত্র গাথা—এই-সব দিয়েই সারা দিনটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

"ভোরের পাখি-জাগার সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্র আর বাইবেলের বিশেষ-বিশেষ অংশ মুখস্থ করার পালা চলে বেলা আটটা পর্যন্ত, তার পর পরিবারের সবাইকার সমবেত প্রার্থনা, তার পর প্রাতরাশ—এতক্ষণ খালি-পেটে থাকার জন্যে কিছুটা, আর কিছুটা বাকি সারা দিনের বেদনাদায়ক সম্ভাবনার আশঙ্কায়, সে-খাবার কোনো বারই তৃপ্তি করে খেতে পারি নি।

"নটার সময়ে সান্‌ডে-স্কুল বসত ; গেঁয়ো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক ক্লাশে বসতে হত বলে গা জ্বলে যেত—কোনো ভুল করে ফেলে পাছে তাদের পেছনের সারিতে গিয়ে বসতে হয়।

"গীর্জায় গিয়ে, আমাদের বাড়ির লোকজনদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘের-দেওয়া চৌকো জায়গায় বসে বসে আমার চিন্তাগুলো পাক খেয়ে বেড়াত ; কখনো আমাদের খুপ্‌রির রেলিংগুলোর কথা নিয়ে ভাবতাম. কখনো আমার ছোটো ভাইদের উস্‌খুসুনি দেখে সেই কথা চিন্তা করতাম ; আর, এই খাপছাড়া এবং বানিয়ে-বলা এলোমেলো ধর্মোপদেশের মূল বক্তব্যগুলো সোমবার দিন মনে করে করে লিখে দেখাতে হবে এবং সেই লেখার ভালোমন্দের ওপর আমারও ভালোমন্দ নির্ভর করবে—সেই ভয়ানক অবস্থার কথা চিন্তা করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম।

"এর পর ঠাণ্ডা কনকনে খাবার নিয়ে (চাকরদের আজ ছুটি) মধ্যাহ্নভোজনের পালা। বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত আবার সান্‌ডে-স্কুল, সন্ধে ছটায় গীর্জায় সান্ধ্যপ্রার্থনার আসর। এই-সবের মধ্যে যে ফাঁকগুলো থাকত, সবচেয়ে বড়ো শাস্তি তোলা থাকত তখনকার জন্যে ; কারণ, অন্য দিনের চেয়ে কম পাপ করবার চেষ্টায় এমন সব বই আর নীতি-কথা পড়তে বসে যেতাম, যা ডেডসী-র মতোই

উষর। সমস্ত দিন ধরে একটিমাত্র শুভ মুহূর্তের হাতছানি দেখতে পেতাম ; সেটা হল, রাত্তিরে শুতে যাবার সময়টা—সে-রাত কখনো তাড়াতাড়ি আসত না !"

আর্থার বললে, "এ-সব শিক্ষার উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরিণামে অনেকেই নিশ্চয় গীর্জার ধর্মানুষ্ঠানকে পুরোপুরি বর্জন করেছে।"

মুরিয়েল বললে, "আজ সকালে আমিও কিন্তু বর্জন করেছি। এরিককে চিঠি লেখবার ছিল। 'প্রার্থনা' সম্পর্কে এরিক আমাকে কয়েকটা কথা বলেছে ; আপনাকে যদি বলি, কিছু মনে করবেন না তো ? এর আগে ঠিক ঐ দৃষ্টিতে কখনো ভেবে দেখি নি।"

আর্থার বললে, "কোন দৃষ্টিতে ?"

"প্রকৃতি একটা নির্দিষ্ট এবং নিয়মিত বিধানে চলছে—বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে। কাজেই ঈশ্বরকে কিছু করতে বলা (আধ্যাত্মিক প্রসাদ লাভের জন্যে প্রার্থনার কথা অবশ্য আলাদা) মানে হচ্ছে, অলৌকিক ঘটনার প্রত্যাশা করা ; অথচ আমরা তা করতে পারি না, করবার অধিকার নেই। এরিক যেভাবে বলেছিল, আমি ততটা গুছিয়ে বলতে পারলাম না ; তবে এইটাই ছিল তার আসল বক্তব্য। আমার বড়ো ধাঁধা লাগছে। এর উত্তরে যদি কিছু বক্তব্য থাকে, দয়া করে বলুন-না আমায় !"

আর্থার গম্ভীরস্বরে বললে, "ক্যাপ্টেন লিণ্ডনের কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আমার ইচ্ছে নেই, বিশেষ করে তার অনুপস্থিতিতে। তবে সমস্যাটা যদি আপনার হয় (গলার স্বর তার অজ্ঞাতসারেই যেন অনেক নরম হয়ে এল), তা হলে বলতে পারি !"

মুরিয়েল সাগ্রহে বললে, "এটা আমারই সমস্যা।"

"তা হলে, প্রথমেই একটা প্রশ্ন করব, 'আধ্যাত্মিক প্রসাদ প্রত্যাশা করছেন কেন ?' আপনার মনটা কি প্রকৃতিরই একটা অংশ নয় ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে—আমি ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারি ; আর, ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারেন।"

"তা হলে, আপনি নিয়তি বা ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দেন না ? আপনি অদৃষ্টবাদী নন ?"

আজব দেশে অ্যালিস-এর অ্যাডভেঞ্চার

'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড'-কে এক কথায় বলতে হয়—বিস্ময়কর সাহিত্য-সৃষ্টি। একটিমাত্র বই প্রকাশ করে এমন অসাধারণ খ্যাতি আর কেউ পেয়েছেন বলে জানা নেই, অন্তত রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাও সাহিত্যিক হবার নেশা বা পেশার তাগিদে লেখা নয়, খেয়ালখুশির তাগিদে মুখে-মুখে বানিয়ে-বলা গল্প।

একশো বছরেরও আগে কোনো-এক অ্যালিস স্বপ্ন দেখেছিল। আর, সেই থেকে সারা দুনিয়ার ছেলে-বুড়ো সবাই তার সেই স্বপ্নে-দেখা আজব দেশের মজা লুটে চলেছে। আজব লেখা, আজব রস, আজব বিষয়, আজব চমক—সব দিক দিয়েই অসাধারণ, এবং সেই-জন্যই অদ্বিতীয়। পড়ার পর মনে হয়, আমরাও স্বপ্ন দেখলুম—এত ভালো লাগা কি স্বপ্নে ছাড়া সম্ভব?

করবে। এরচেয়ে আগে তোমায় 'শুভরাত্রি' জানাবার মতো মনের জোর পাই নি। ঈশ্বর জানেন, আবার কখনো আমায় দেখতে পাবে কি-না, আমার খবর পাবে কি-না!"

প্রীতিভরে বলে উঠলাম, "খবর তোমার আমি নিশ্চয়ই পাব!" তার পর আবৃত্তি করলাম:

"মহা-আকাশের তীরে
তারারা কখনো হারিয়ে যায় না, বার বার আসে ফিরে!
পুব-দিগন্তে দেখ, কোটি তারা আকাশ রেখেছে ঘিরে!"

সিঁড়ির গায়ে একটা জানলা, সেখান থেকে সমুদ্র আর পূর্ব দিগন্তের দিকে অবারিত দৃষ্টি মেলে দেওয়া যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আর্থার বললে, "হ্যাঁ, পূর্বাচলের পানে তাকাই! পশ্চিম হল সব বেদনা, সব দীর্ঘশ্বাস, অতীতের সব ত্রুটি, সব ভ্রান্তি, সব ঝরে-যাওয়া আশা আর সব মরে-যাওয়া ভালোবাসার সমাধিসৌধ! আর পূর্বাচল আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে, নবীন উদ্যম, নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নবীন আশা, নতুন জীবন, নতুন প্রেম! পূর্বাচলের পানে তাকাও! হ্যাঁ, পূর্বাচলের পানে তাকাও!"

আমার ঘরে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখলুম, সমুদ্রের অতল কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে আলোর ফুলের মতো পাপড়ি খুলে প্রভাত-সূর্য তাঁর দীপ্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে নতুন দিনের আলোর বন্যায় সারা পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিলে। আর্থারের শেষ কথাগুলো তখনো আমার কানে বাজছে।

মনে মনে এই চিন্তা জপ করলাম, 'আমাদের সবাইকার ভাগ্যেই তাই ঘটুক। যা-কিছু মন্দ, যা-কিছু বিগত, যা-কিছু নিরাশ্বাস--গতরাত্রির সঙ্গে সঙ্গে তা লুপ্ত হয়ে যাক! যা-কিছু ভালো, যা-কিছু প্রাণবন্ত, যা-কিছু সম্ভাবনাময়—প্রভাত-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আবির্ভাব হোক।

'রাতের আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাক তুহিন কুজ্ঝটিকার আবরণ, কলুষ বাষ্পের কুয়াশা, গুমরে-ওঠা দমকা বাতাস আর নিশাচর পাখির আর্তস্বর; দিনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকে নেমে আসুক

আলোকের ঝর্নাধারা, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীর, নবজীবনের উষ্ণতা আর ভোরের পাখির কাকলি!

'রাতের অন্ধকারের সঙ্গে ঘুচে যাক অজ্ঞানতার যত মেঘ, পাপের যত মর্মান্তিক পরিণাম, বেদনার যত নীরব অশ্রু ; দিনের সঙ্গে উদিত হোক জ্ঞানের সূর্য, চারিদিকে নিঃশ্বসিত হোক শুচিতার মাধুর্য, দিকে দিকে স্পন্দিত হোক পরম আনন্দের উচ্ছ্বাস! ঐ পূর্বাচলের দিকে মুখ ফেরাও!

'বিগত রাত্রির বুকে অন্তর্হিত হোক হারিয়ে-যাওয়া ভালোবাসার স্মৃতি, শুকিয়ে-যাওয়া আশার যত ঝরা-পাতা ; দুর্বলতার যে আক্ষেপ আর বিষণ্ণ অন্তরের যে-অনুশোচনা আত্মাকে অসাড় করে তুলে নিষ্ক্রিয় করে দেয়—রাতের অন্ধকারের সঙ্গে তাও অপসৃত হোক ; আর, জোয়ারের মতো সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে, সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠে ধেয়ে আসুক নির্ভীক সংকল্প তার দুর্বার বাসনার স্রোত, চোখে নেমে আসুক চিরানন্দময় স্বর্গলোকের দিকে অটল বিশ্বাস-ভরা দৃষ্টি, যে-বিশ্বাস আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সার, আমাদের সব অ-দেখার প্রমাণ!

'পূর্বাচলের দিকে তাকাও! হ্যাঁ, উদয়-দিগন্তের দিকে দেখ!'